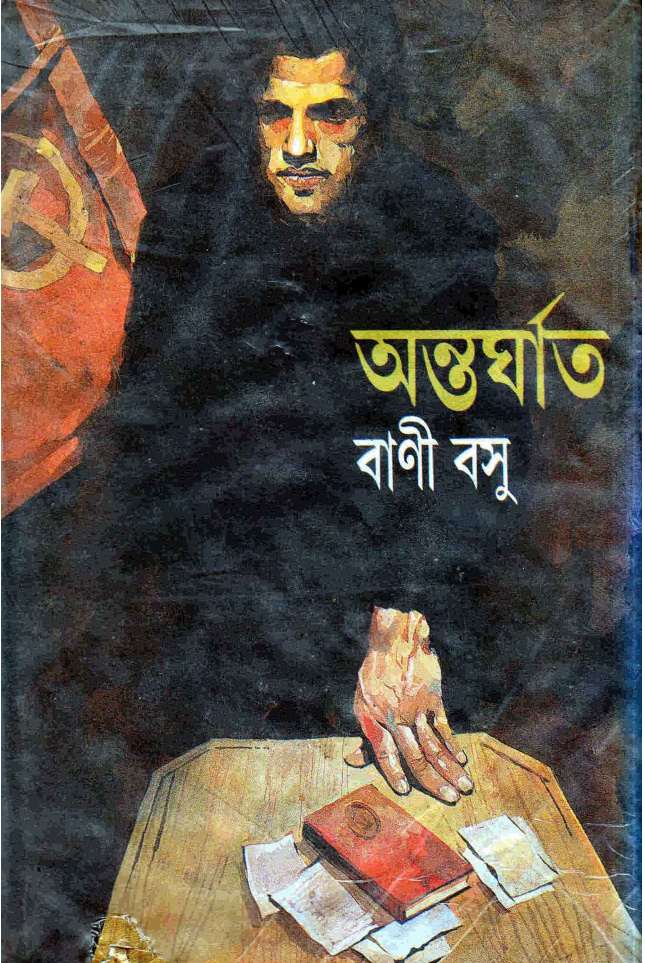

লাল মারুতি

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। দীর্ঘ দুপুর শেষ হতে চলেছে। আর তিনটে মাস পরেই যে কমলালেবু, ভুটিয়া এবং ধোঁয়াশা সঙ্গে করে শীত এসে পাকাপাকিভাবে বসে যাবে, গ্রাম-গঞ্জের কোথাও তার কোনও চিহ্ন নেই। প্রচণ্ড তাতে দিল্লি রোড এবং তার পরবর্তী গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পিচ নরম। দুপাশের দৃশ্যপটের দিকে তাকালে মনে হয় একটা আগুনের শিখার আড়ালে যেন সব। দিনের বেলা বলেই শিখাটার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। গাছপালা, দোকানপাট, মাঠ, জলা, খাল, বিল, বাড়ি—সবই ঈষৎ কাঁপছে এবং ঘামছে। এ পথ দিয়ে যানবাহন চলাচলের বিরতি নেই। যদিও খুব ঘন নয় ট্র্যাফিক। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই আপাদমস্তক মাল বোঝাই ট্রাক ভারি কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিচগলা রাস্তার বুকের নুনছাল তুলে চলে যাচ্ছে। দুপুরের আগুনে তাত যেন চতুর্গুণ বেড়ে যাচ্ছে তাতে। কত শ' বছর ধরে এই রাস্তা সারা দেশের ভারি মাল আর পথচারীর দুর্ভাবনা বয়ে বয়ে আজ যেন একেবারে ক্লান্ত। বটগাছের ঝুরির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঘুঘুর ডাক পথের সেই গভীর, অনপনেয় ক্লান্তি আর অবসাদের শরিকানা ছড়িয়ে দিচ্ছে বয়স্ক দুপুরের বুকে। ট্রাক থামিয়ে হঠাৎ মোটা থাবায় মোবিল-লাগা ময়লা তোয়ালে তুলে নিচ্ছে ড্রাইভার। পার্শ্ববর্তী ধাবায় আধঘুমন্ত মালিককে টেনে তুলে বলছে—'আরে ইয়ার, জরা পানি তো দো পহলে।' বাতাসে আর্দ্রতা আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ হলে এইরকম ঘর্মাক্ত দুপুর হয়।

সড়কের দুপাশ থেকে মেঠো পথের ডালপালা হুগলি, বর্ধমান, বীরভূমের গভীর থেকে গভীরে ছড়িয়ে গেছে। চিরুনির দাড়ার মতো এইসব পথের পাশে পাশে কাদা-থিকথিক ডোবায় পাঁক মেখে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে মহিষ, পাড়ের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে শুয়োরের পাল। লম্বাটে খালের ধাঁচের পুকুর চলেছে পথের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে বহুত দূর। কচুরি পানায় আপাদমস্তক ঠাসা। পানা-সবুজ পুকুরের জল ডোঙায় করে পাশের তৃষ্ণার্ত মাঠে ঢালছে মাথায় টোকা, কাঁধে গামছা, ক্ষয়াটে চেহারার বৃদ্ধ চাষী। খুব

জনবিরল দুপুর।

বাঁ দিকে বেঁকে গেছে পথটা। একটু একটু করে ঢালু হয়েছে, আবার উঠেছে, তারপর উঁচু পাড়ের মতো সোজা, নাক বরাবর। ক্ষয়া ক্ষয়া পথ, লাল। বাঁক নিলেই হঠাৎ একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়। আর কোথাও নেই, শুধু এই পথটারই দুপাশে কাশ ফুটে ঘন হয়ে আছে। নিভৃত, নির্জন আড়াল দেখে একমাত্র এখানেই বুঝি প্রকৃতি তার মরশুমী সৃষ্টিকর্মে নিবিষ্ট ছিল। হঠাৎ এই খাঁ খাঁ দুপুরে দূর থেকে এদিকে তাকালে মনে হবে পৃথিবীর এই অংশ যেন এক বিষণ্ণ অগ্নিকন্যা। রুক্ষ, লাল জমিতে সাদা পাড়ের শাড়ি পরে কি এক ব্যর্থতার বিষাদে মগ্ন হয়ে পাশ ফিরে আছে। যুগধর্মের কোন রহস্যময় প্রয়োজন মেটাতে হঠাৎ-হঠাৎ জন্ম হয় এইসব আগুনের তৈরি মানুষীর, মানুষের। ইতিহাস এদের একবার মাত্র ব্যবহার করে ফেলে দেয়। উচ্ছিষ্ট যা পড়ে থাকে, বোমার বিস্ফোরণের পর নিবে-যাওয়া বারুদের কুচির মতো তা নেহাতই ভস্ম। আগুন থেকে ছাইয়ে পরিণত হবার প্রতিটি পর্যায় অমানুষিক যাতনা দিয়ে তৈরি। কিন্তু তার খবর রাখে না কেউ। যা ক্ষয়ে যায় তার তুলনায় যা পাওয়া যায় তা এতই অল্প যে এইসব বিস্ফোরণের শেষ অবধি না থাকে কোনও কৈফিয়ত, না থাকে কোনও সান্ত্বনা।

মাথা দোলাবার মতো বড় হয়নি কাশবন। শুধু সাদা এবং শিহরিত হয়ে আছে। ক্যালেন্ডার মিলিয়ে শরৎ এসে গেছে, কিন্তু বাস্তবে আসতে এখনও একটু দেরিই। তাই মনে হয় বর্ধমান-বীরভূমের মধ্যবর্তী এলাকার এই মেঠো পথে প্রান্তরে ওদের বোধহয় কেউ অকালবোধনে ডেকেছে। কোনও সর্বক্ষয়ী যুদ্ধের আগে শারদস্তুতির অকালবোধন। লালচে-মাটির কাঁচা রাস্তা সোজা চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। অনেক দূর এগিয়ে একটা বাঁক আছে। কিন্তু বেশ খানিকটা না এগোলে সে বাঁকেরও খোঁজ পাওয়া যাবে না। এদিকের শিল্পাঞ্চলে যাবার এটাই সংক্ষিপ্ত পথ। নিয়মিত যাত্রীরা জানে। জানলেও সবাই, বিশেষ করে মোটর-যাত্রীরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাবার ঝুঁকি নেয় না। ফ্যাকটরিগুলোর জিপ, ট্রাক, ভ্যান—সবই ঘুরে হাইওয়ে দিয়ে চলাচল করে। নিকটবর্তী গ্রামের মানুষ—মাথায় বোঝা, কাঁধে গামছা, বেসুরো চড়া গলায় গান গাইতে গাইতে এ পথ দিয়ে চলে যায়। গ্রাম কাছে হবে, হাটও। গরুর গাড়ি তো যায়ই। কাঁচা রাস্তায় আকণ্ঠ মাল বোঝাই গরুর গাড়ির চাকার গভীর দাগ পড়ে। আসার দাগ, যাওয়ার দাগ। কখনও মিলে যায়, কখনও পরস্পর কাটাকুটি করে মাটির রাস্তার ওপর বিচিত্র নকশা ফেলে। ঈষৎ কাঁকুরে মাটি বলে পরবর্তী বৃষ্টির দিন পর্যন্ত

অনেক সময়ে টিঁকে থাকে এই বিচিত্র জ্যামিতি। মানুষের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে গড়া ইতিহাসের জমিতেও যেমন কিছু কিছু নকশা টিঁকে থাকে কিছু কিছু দিন।

টকটকে লাল রঙের নতুন মারুতি গাড়িটা কিন্তু এদিকেই বাঁক নিল। ঝুঁকি নেবার মতো মজবুত করে এদের গড়া হয়নি। সুন্দর কিন্তু ভঙ্গুর। আকারে-প্রকারে ঘাতসহতার কোনও চিহ্ন নেই। উঁচু-নিচু পথে টাল সামলাতে না পেরে যদি একবার উঁচু পাড় থেকে মাঠের গর্তে পড়ে যায় দেশলাইয়ের বাক্সর মতো চৌচির হয়ে যাবে। যতদূর সম্ভব বাধা বিপত্তিহীন মসৃণ পথ, আশপাশের জোরালো গাড়িরা যেখানে একে পলকা এবং সুকুমার জেনে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যাবে, খুব নিখুঁতভাবে এমন একটা পথ পার হয়ে চমৎকার সাজানো গোলাপ আর মরশুমী ফুলের বেড-ছাওয়া, কাচ-মোড়া কোনও বাংলো-টাংলোর হাতায় গিয়ে রাজামশাইয়ের আদরের ছোটকুমারের মত দাঁড়ানোর গাড়ি এসব। গাড়ি ঢোকার মৃদু শ্বাস নেওয়ার মতো শব্দে বেয়ারা এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেবে। ভেতর থেকে বাছুর উঁচু ডবারম্যানের ভয়াবহ গলার ডাক নির্জন হলঘরে বন্দুকের গুলির মতো ঘা দিতে থাকবে। তারপর ? ধবধবে তেয়ালে, মসৃণ মোজেইক, চুপচাপ চা।

চালকের আসনে অত্যন্ত সুপুরুষ ভদ্রলোকটি অনন্যমনে স্টিয়ারিংএ পাক দিচ্ছিলেন। সাদা-কালো ছিট-ছিট ট্রাউজার্স। সাদা ফুলহাতা শার্ট। নেভি-ব্লু-এর ওপর খড়-রং-এর তেরছা ডোরা-কাটা টাইয়ের নটটা আলগা। ডান হাতের আস্তিন একটু গুটোনো। ধবধবে ফর্সা। গোলাপির ছোঁয়াচ-লাগা কবজি দেখা যাচ্ছে। যথেষ্ট চওড়া বলেই মেয়েলি বলা গেল না। কবজি দেখে যদি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান বলা যেত তাহলে মানুষটিকে অসামান্য মনোহর, শৌখীন, চরিত্রবান এবং আমরণ সুখ-শান্তি-সাফল্যের মালিক বলে অনায়াসেই রায় দেওয়া চলত। কিন্তু কবজি, কপাল, আঙুলের কর ইত্যাদি দেখে মানুষের চরিত্র এবং ভাগ্য নিরূপণ করবার লোক বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে ক্রমেই কমে আসছে। ভালোই হয়েছে তাতে। ভাতের হাঁড়ির একটা চাল টিপে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা বলা যায়, কিন্তু মানুষের মতো জটিল জীবের একটা প্রত্যঙ্গ দেখে তাকে বোঝা কোনও কাক-চরিত্র, কোনও মহাজ্যোতিষার্ণবেরই কর্ম হওয়ার কথা না। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর ও প্রাণীর চরিত্র লক্ষণে যে অন্তঃসামঞ্জস্য দেখা যায়, মানুষের চরিত্র এবং ভাগ্যই বোধহয় তার একমাত্র ব্যতিক্রম।

সীটের পেছনে একটা মোটা হলুদ তোয়ালে ভাঁজ করা। মাঝে মাঝেই ভদ্রলোকের আয়তাকার পিঠের মৃদু ছাপ পড়ছিল তোয়ালেটায়। পরক্ষণেই

আবার ঈষৎ সামনে ঝুঁকে পড়ছিলেন তিনি। রাস্তাটা ভালো না। কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার। হাইওয়ের একটা গারাজ থেকে জানা গেছে এটাই সংক্ষিপ্ত পথ। শর্ট কাট। এই শর্ট-কাটগুলোর ওপর কোনও কোনও মানুষের কেমন একটা অহৈতুকী ভক্তি থাকে। কেরিয়ারের শর্ট কার্ট, মানুষ গড়ার শর্ট-কাট, সমাজ-গড়ার শর্ট কাট।

স্টিয়ারিং-এর ওপর দুহাতের আঙুল ছড়িয়ে আছে এখন। তার মধ্যে বোধহয় সাড়ে দশ রতি ওজনের কি আরো বড় একটা গাঢ় মেরুন রঙের উৎকৃষ্ট আস্ত গোমেদ রুপোলি বলয়ের মধ্যে সহজেই চোখে পড়ে। এতো বড় গোমেদ সাধারণত দেখা যায় না। লোকে দুভাগ করে পরে। পাশেই হাল্কা সবুজ ক্যাট্‌স্-আই থেকে এক ধরনের গা ছমছমে আলো বেরোচ্ছে। সেটার আয়তনও নেহাত অবহেলার নয়।

পেছন থেকে একটা সাইকেল-রিকশা অধৈর্য হয়ে ঘন্টি বাজাল। রাস্তা বেশ সরু। উপরন্তু দুদিকেই খাড়াই ঢাল। মাঠের মধ্যে নেমে গেছে। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। এ রাস্তায় নামলে আশা করা যায় পথ-চলতি গ্রামের মানুষ ছাড়া আর কাউকে হর্ন শোনাতে হবে না। চালকের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। ট্রেনে এলেই বোধহয় ঠিক হত। কিন্তু ট্রেন যাত্রা বড় বিরক্তিকর! আজ এই গাড়ি নিয়ে হয়েছে মহা মুশকিল। রাস্তা-ঘাট যেন নতুন মনে হচ্ছে। আবার হর্ন বাজাল রিকশা-অলা। খুবই তাড়া আছে বুঝতে হবে। এইভাবে হর্ন বাজাচ্ছে যখন। স্বাধীন দেশের নাগরিক এরা। চেহারায় না বোঝা গেলেও। মেজাজে বোঝা যায়। মোটর-টোটরকে খাতির-রেয়াত করে না। তা-ও মার্সিডিজ নয়, অ্যামবাসাডর নয়, ক্যাডিল্যাক নয়, নেহাতই ফণ্ডবেনে মারুতি সুজুকি।

স্কুল-ফাইন্যাল পাশ-টাশ করেও রিকশা চালিয়ে অন্ন সংস্থান করতে হচ্ছে বলে কেমন একটা ক্ষিপ্ত অভিমান এদের। সুযোগ পেলেই চলতি মোটরের গায়ে খিস্তি ছুঁড়ে দেয়। বি এ পার্ট ওয়ান পাস রিকশাঅলাও আছে এখানে।

—'পার্ট টু-টা দিয়ে নিলে না কেন?'

—'রেজাল্ট বেরোতে বেরোতে চাকরির বয়স যে পার হয়ে যাবে স্যার। সার্টিফিকেট পেতে পেতে আরেক জন্ম ঘুরে আসতে হবে।'

—অবস্থা কি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে?'

—'হবে না তো কি! কাজ না করেই সব শালা মাইনে পেয়ে যাচ্ছে। হাত বাড়ালেই বাঁ-হাতি মাল। কাজ করবে কেন?'

খুব জ্ঞানীগুণী হয় এইসব রিকশাঅলারা। কথা বাড়াতে ভয় করে। আসলে

উপার্জনের ব্যাপারে এইসব ডিগ্রি-টিগ্রিগুলো বিশেষ কাজে আসে না।

আসবে না এমন অনেক আগেই আঁচ করা গিয়েছিল। যখন প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল ব্যাপারটা তখন চলতি শিক্ষায়তনের ওপর হামলা চলেছিল কয়েক বছর। সেই থেকে পুরনো ঐতিহ্যবাহী সব শিক্ষালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। যেটুকুও বা দেবার ক্ষমতা ছিল সেটুকুও আর নেই। সেই সুযোগে চতুর্দিক থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ব্যবসায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বিশাল টাকা ডোনেশন বা ঘুষ, প্রস্তুতিপর্বের অমানুষিক মহড়া। তারপরেও টিকে থাকার সংগ্রামে কোচিং ক্লাস-এই বাবদ এ বঙ্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহল একটা সাঙ্ঘাতিক জালে জড়িয়েছেন। যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবাদে একটা ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর পর্যন্ত নিহত হন ছাত্রদের হাতে, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাই তার সবঙ্গীন ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বুক ফুলিয়ে এখনও বহাল। সমান্তরাল দুটো ছাত্র-সম্প্রদায়। ব্যবসায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহু টাকা ব্যয় করে ডিগ্রি পাওয়া ছাত্র আর সরকারি সাহায্যে শিক্ষার খয়রাতি থেকে উৎপন্ন ছাত্র। দু জনের দৃষ্টিভঙ্গি, নাগরিকত্ববোধ কি এক হতে পারে?'

এক নজর দেখলে এ অঞ্চলের গ্রাম-ট্রাম বেশ বর্ধিষ্ণু মনে হয়। তেকসলী হয়েছে নাকি জমি। ব্যাঙ্ক থেকে দেদার টাকা ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। সার এবং উন্নত ধরনের বীজের বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছে সরকার থেকে। এ সমৃদ্ধি কি এক সময়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর কি ভাগচাষীর দখলে সত্যিই এসেছে? দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে নাকি তিন লাখ একর জমি বন্টন হয়েছিল। সেই বন্টনের সুবিধেটা ভোল পালটিয়ে এবং বেনামে জোতমালিকরাই ভোগ দখল করছে না তো? যে কোনও জনকল্যাণমূলক সরকারি নীতিরই গোড়ালি অপবিত্র থাকে, যার মধ্যে দিয়ে মূর্তিমান দুর্নীতি বিনা বাধায় ঢুকে পড়ে। নতুন একটা জিনিসই যোগ হয়েছে এই অর্থনীতিতে। প্রচুর ভোগ্যপণ্য এবং ভোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। রিকশা চালিয়ে এই সব ছেলেরা যদি ক্রমে রিকশার ব্যবসা এবং সেই সূত্রে টেপ-রেকর্ডার, স্টিরিও-সিসটেম, টিভি, ভিসিআর প্রমুখ বেশ কিছু মন-ভোলানো স্টেটাস-সিম্বল যোগাড় করে ফেলতে পারে তো হিন্দি সিরিয়াল আর ব্লু ফিল্‌ম্ দেখতে দেখতে, গজল ও ইংরেজি পপ্ সংশুনতে শুনতে শুদ্ধ বাংলায় চিঠি লিখতে না পারার লজ্জাটা ওদের পুষিয়ে যাবে। একটা সময় ছিল যখন গরিব ঘরে বা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও লেখাপড়া শিখে যোগ্য হয়ে ওঠার একটা তাগিদ দেখা গিয়েছিল। এখন কাছা-কোঁচা খুলে সব কালো টাকার পেছনে ছুটছে। এ-ও এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। একমাত্র অর্থনীতির হাত

দিয়েই এসব বিপ্লব সম্ভব হয়।

একটু বাঁ দিকে কাত হয়ে গাড়ি দাঁড় করালেন ভদ্রলোক। তাড়া খুব নেই। রিকশাকে পথ ছেড়ে না দেবার মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিও না। বিশেষত যদি আধা-খ্যাঁচড়া বি এ পাশ কোনও রিকশা-অলা হয় তাহলে তাকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতে তিনি প্রস্তুত। সূর্যাস্ত একটু পরেই হবে। ফিকে কমলা ওড়নায় আপাদমস্তক ঢাকা পড়েও পড়বে না দূরবিসর্পী মেঠো পথ, এবড়ো-খেবড়ো দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, চষাখেত, ছোট ছোট গ্রাম্য বাগান তাল, তেঁতুল, শিরীষ, নারকেল, বড় শিশু, ত্রিভঙ্গ খেজুর। সবই অনেক দূরে দূরে, যেন যে যার নিজের রাজ্যে স্বরাট। উদার, বিস্তৃত, গ্রাম্য প্রকৃতি একেবারে আদিম বলে মন হয় এ সব সময়। আদিম এবং স্পর্শকলুষহীন। কত কাল, কত কল্প, কল্পান্ত ধরে যেন ঠায় একা। মানুষের সঙ্গে খুব বেশি মাখামাখি করলে, মানুষের খণ্ড সমস্যার মধ্যে নিজেকে বহু দিন অন্তরীণ রাখলে প্রকৃতির এই বিশাল একাকিত্বময় আনন্দের রূপ দেখার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অনেক পণ্ডিত দাবি করেন ভারতীয়দের প্রকৃতি-প্রেম নাকি পশ্চিমীদের থেকে ধার করা। এঁর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোধহয় সত্যিই তাই। কোন এক দূর অতীতে ইনিও গ্রামের ছেলেই ছিলেন, যেসব গ্রামের ছেলে উচ্চতার আশায় ক্রমেই শহর থেকে অতি শহরে ধাবিত হতে থাকে। গ্রামে থাকতে মানুষ যত দেখেছেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে যতটা আলোড়িত হয়েছেন তার অর্ধেকও হননি গাছপালা নদী-জঙ্গল, আকাশ নিয়ে। যে নদীপারের গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে কোনও কোনও লেখক স্বয়ং স্রষ্টার নিদ্রিত রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, সেখানে ইনি শুধুই এলেবেলে, অসুবিধেজনক বুনো ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি কখনও। সত্যি বলতে কি ইংলন্ডের কেন্ট প্রদেশে গিয়ে সর্বত্র সুরক্ষিত সবুজ দেখে দেখে শান্ত হতে হতে প্রকৃতি-প্রণয়ের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং বোধোদয় পড়া হল। তারপর থেকে এরকম অরক্ষিত দেশি গাছপালা, ঝোপজঙ্গল, আকাশ মেঘ, রোদ-বৃষ্টি দেখলে মধ্যে মধ্যে আত্মবিস্মৃতি আসে, দাঁড়িয়ে যেতে হয়। ওরা যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে দেয় ওরা যে আমাদের কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভুলে যাওয়া প্রথম-প্রণয়িনীর মতো, এমন আত্মীয়স্বজনের তুল্য, যাদের নইলে চলে না, মানুষ প্রকৃতির যৌথ উদ্যোগ ভেঙে গেলে যে সমূহ বিপদ, এসব কথা এখন অনেকেই বুঝেছে। তাই-ই হয়ত অপার সৌন্দর্য, এক রকম নীরব বাস্তুয়তা দিয়ে বরাবর ওরা মানুষকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে এসেছে।

রিকশাটা শন শন করে এগিয়ে আসছে। কেমন একটা ক্ষিপ্ত আক্রোশে

প্যাড্‌ল্ মারছে রিকশা-অলা। লালচে-হয়ে-আসা আলোয় হুড-খোলা রিকশার ওপর হেলান-দিয়ে বসা আরোহিণীর কপাল থেকে শুকিয়ে-ওঠা কুচো চুল হাওয়ায় উড়ছিল। উড়ছিল হালকা বেগনি রঙের আঁচলও। মহিলাও নয়, আবার মেয়েও বলা যাবে না এমনই একটা বয়স এবং ব্যক্তিত্ব। পিঠের মাঝখান পর্যন্ত বেণী, চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক। রিকশা-অলা চালাচ্ছে খুব জোরে, খানিকটা রোখের সঙ্গে, বুঝি দেখিয়ে দিতে চায়, পায়ের জোরে ও কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে অনায়াসেই। মুহূর্তে পার হয়ে গেল। কিন্তু চকিত দেখা এবং পরিমিত আলো সত্ত্বেও মারুতির অন্দরে বসা ভদ্রলোক ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলেন। সীটে ঈষৎ গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। এখন দণ্ডের মতো উদ্যত হয়ে বসলেন। ফাঁকা রাস্তায় উল্কাগতিতে দিগন্ত পার হয়ে গেল রিকশা। মাঠ পার হয়ে একটা জেট প্লেনের মতো এখন আকাশে ডানা ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন আকাশ ন যত্র সূর্যো ভাতি ন চ চন্দ্রতারকম্। অতীতের তিমির কিম্বা ভবিষ্যতের। ইতিহাস যেসব তিমির সাবধানে তার মহাফেজখানায় জমিয়ে রেখে দেয় সময়মতো ব্যবহার করবে বলে। সম্পূর্ণ জানা আর বিড়ম্বনাময় আধো-জানার অতি ভয়ানক তমস্।

মারুতির আরোহী দরজা খুলে আস্তে আস্তে নেমে দাঁড়ালেন। দরজাটা ভালো করে বন্ধ না করেই হাঁটতে হাঁটতে পেছন দিকে চলে গেলেন। ধুলোর পাতলা সর পড়েছে গাড়ির অঙ্গে। অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে রুমাল বার করে মুছতে লাগলেন গাড়ির ধুলো। এটা একটা ব্যক্তিত্বনিরূপক অভ্যাস। অনেক মিলিটারি গোঁফওয়ালা মানুষ যেমন কথা বলতে বলতে থেকে থেকেই গোঁফ চুমরোন। গাড়িকে মালিন্যহীন রাখার এই স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যাস কি প্রতীকী? নিজেকেও অমলিন রাখার? যে কোনও মূল্যে?

গাড়ির পিঠে পিঠ রেখে তিনি সূর্যকে খোবলানো মাঠের ওধারে অস্ত যেতে দিলেন। দিগ্‌বিসারী সবুজ সাদার সমুদ্রে লাল ডানা মেলে সূর্য ক্রমে নেমে এলো একটা অতিকায় অনৈসর্গিক অ্যালব্যাট্রসের মতো। ভেতরের আকাশেও একটা আগুনের পিণ্ড মানসদিগন্তে একবার লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হল। রেখে গেল দীর্ঘ বিষের পুচ্ছ। ভেতরের এবং বাইরের সেই অদ্ভুত জ্বালাময় আলোয় মানুষটি নিজের ফর্সা, পুষ্ট আঙুলে বিশাল গোমেদ আর তার পাশের ভুতুড়ে আলোআলা বৈদূর্যমণির আংটিদুটোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ। যেন এই প্রথম দেখছেন ওদের। আগে কখনও নিজের আঙুলের ওপর ওদের অস্তিত্ব এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে যেন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। কি বিচিত্র

দেশ ! মধ্যযুগ ও ভাবী কাল, আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান এবং অন্ধ কুসংস্কার এখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিভাবে থাকে একই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে ? এমন কি একই চরিত্রে ? এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল তাঁর হাতের এই পাথরগুলোর মতো অদ্ভুত বিসদৃশ ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। রাহু এবং কেতু, যে নামে আদৌ কোনও গ্রহ, তারা এমন কি অ্যাস্টারয়েড পর্যন্ত মহাকাশের কোথাও নেই সেই গ্রহদ্বয়ের শান্তির জন্য সংস্কৃতের ট্রিপল এম এ বেনারসী জ্যোতিষী বিধান দিলেন, পুলিসের প্রাক্তন ডিভিশন্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অখণ্ড মনোযোগের চিহ্নস্বরূপ কপালে ভাঁজ ফেলে সে বিধান শুনলেন এবং বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক প্রযুক্তিবিদ নামকরা দোকান থেকে ওজন লক্ষণ মিলিয়ে সে রত্ন 'ধারণ' করলেন। যখনই স্টিয়ারিং-এর ওপর হাত পড়ে আঙুলগুলো বিছিয়ে গিয়ে ওরা প্রকট হয়, রত্নগুলো নিচু ভারি গলায় বক্তৃতা দিতে থাকে—'তুমি নয় হে, তোমার অদৃষ্ট তোমায় চালাচ্ছে। তুমি নিমিত্তমাত্র। মৃণ্ময় পুতুলের বেশি না। যে কোনও মুহূর্তে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামতে পারে, তখন নিঃশেষে গলে যেতে পারো। ধূলির ধন আবার ধূলিতে। তবে হ্যাঁ। আমরা জাগ্রত রইলাম। একেবারে প্রলয়মেঘকে আড়াল করা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে ছোটখাটো ব্যাপার হলে উপেক্ষা করতে পারো।'

ছোট ছোট ঘরে গোপন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যাঁরা সরীসৃপের মতো ভূগর্ভবাসী তাঁদের নিচু গলার ভীষণ আকর্ষণীয় স্বপ্নব্যাখ্যানের মতো উত্তেজক এই শব্দহীন ভাষণ।

বর্ধমান বীরভূম বর্ডারের সূর্যাস্ত আজ মোটেই ক্ষণগোধূলি রেখে যাচ্ছে না। বহুক্ষণ ধরে সূর্যের স্তিমিত চোখ আজ পৃথিবীকে দেখতেই থাকে, দেখতেই থাকে। যেন দীর্ঘ প্রবাসে যাবার আগে প্রিয়জনকে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে। দেখে দেখে আশ মিটছে না।

অন্ধকারের জিভ নিঃশেষে সব কিছু চেটে নেবার ঠিক আগে মারুতি আবার চালু হল। এদিকে বিজলি নেই। সন্ধ্যা মানেই নিশুতি। থই থই অন্ধকারে মাঠ, পথ সব একাকার। গাড়ি ফিরে চলে গেল সেই অবসাদগ্রস্ত পুরনো পন্থায়। যেখানে আলো, যেখানে মানুষ, যেখানে গাড়ি আরো গাড়ি। সব যাত্রা শেষ গণনায় একেবারে ব্যর্থ জেনেও প্রাত্যহিকতার ব্রত পালনে নিযুক্ত ট্রাক ভ্যান মোটরের শবযাত্রার মধ্যে বিন্দুর মতো প্রসরমাণ, খুব নিখুঁত সুন্দর, চিকণ, কিন্তু ছোট্ট, ভঙ্গুর লাল মারুতি। মর্মবিদ্ধ, অন্যমনস্ক, নিশুতির যাত্রী।

রাঢ়বাংলার বিরাট আকাশ নিঃশব্দে চিত হয়ে থাকে যেন নির্বাপিত এক

কুশপুত্তলিকা। আঁচলের গিঁট খুলে ভলকে ভলকে ভস্ম ঝরে। মারুতির কপালে, সামনে বাড়ানো মসৃণ নাকের ওপর। ঊর্ধ্ব থেকে ভস্মের এই অবিরাম ক্ষরণ এড়াতে স্পীডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু আরোহীর মনে হয় গতি যতই বাড়ান তিনি একই জায়গায় থেমে আছেন। স্বপ্নের দৌড়ের মতো। এবং ঘড়ির কাঁটা চললেও স্থির। এবং ক্যালেন্ডারের পাতা চঞ্চল হলেও সময়ের ঠিকানা বদলাচ্ছে না।

নিশির ডাকে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে উনিশ শ' সাতষট্টি একটা বিস্ময়ের বছর। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাসের সাধারণ নির্বাচনে বিশ বছরের কংগ্রেস-শাসনের অবসান হল রাজ্যে। গঠিত হল অভূতপূর্ব চোদ্দ পার্টির কোয়ালিশন সরকার যার সদস্যদের মধ্যে ছিল মস্কোপন্থী সি পি আই এবং চীন-পন্থী সি পি এম দলও। এই অদ্ভুত অঘটনঘটনে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ আনন্দাশ্রু ফেলল। যৌথ পরিবার প্রথায় আস্থাশীল জনগণমানসে বোধহয় ব্যাপারটা দীর্ঘ বিবাদের পর ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয়ে যাবার মতো একটা আনন্দের ঘটনা বলে প্রতিভাত হয়েছিল। যদিও বাঙালিকে রাজনৈতিক নাবালকত্ব-দোষ শত্রুতেও দেবে না। আসলে রোম্যান্টিক আবেগ ও ভাবালুতার বাড়াবাড়ি এই নিয়েই বঙ্গবাসীর পাপ এবং পুণ্য৩

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের জোয়ারের জল সরে গেলে আদর্শগত পার্থক্যের ধুধু চড়া যখন দেখা দিল মনোমালিন্য আর গোপন করা সম্ভব হল না। পুলিসের ভূমিকা, শ্রমিক এবং ভূমিনীতি নিয়ে মার্কসীয় এবং অমার্কসীয় দলগুলির মধ্যে বচসা শুরু হল। বার বার ভাঙল, বার বার গড়ল সরকার।

উনসত্তর সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর রাজ্যে এখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। সেই সাতষট্টি থেকে রাজ্যের লোক আশানিরাশার নাগরদোলায় দুলছে, 'নুন-আনতে-পান্তা-ফুরনো' নিম্নমধ্যবিত্ত যেমন দোলে লটারির টিকিট কেটে। ট্রামে-বাসে এখনও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে লোকে। রাজা-উজির মারার অভ্যাসও যায়নি। বছর-ভর রাষ্ট্রপতির শাসনের নিয়ামক অভিজ্ঞতার পরও।

আলিপুরগামী বাসে মোটাসোটা থলথলে ভুঁড়িঅলা এক ভদ্রলোক গাল কাত করে পাশের যাত্রীকে বললেন—'কি দাদা, এবারে টিকবে তো ?'

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ভারি গলায় বললেন—'ভগাই জানে দাদা, তবে নাড়াচাড়া

খাচ্ছে খুব, এটাই ভরসার কথা।'

পেছনের সীট থেকে একজন উৎসাহী ব্যক্তি বেশ খবরাখবর রাখেন মনে হল। চেঁচিয়ে বললেন—'আর কি, পশ্চিমবঙ্গ আর ফ্রান্সে কোনও তফাত রইল না। কলকাতাও এবার প্যারিস হবে। কত মুলিন রুজ চান?'

রোগাটে খিটখিটে চেহারার একটি বুড়ো মানুষ বোধহয় মুল্যা রুজের উল্লেখে বিরক্ত হলেন, নাকের সামনে দিয়ে মাছি তাড়াবার মতো একটা ভঙ্গি করে নস্যি-নেওয়া খোনা গলায় বললেন—'অজয় মুখুজ্জে কি পারব্যা? প্রফুল্ল সেনের মতো দাপুটে তো আর নয়।'

'জ্যোতি বোসই কি পারবে?' অন্য দিক থেকে পাল্টা প্রশ্ন এলো, আরে বাবা যারা অ্যাদ্দিন পুলিসের প্যাঁদানি খেতে খেতে বড় হল, তাদেরই হাতে পুলিস মিনিস্ট্রি। লাও ঠ্যালা। সাপে-নেউলে কোনদিন একত্রে বাস করেছে?'

এই মার্কা-মারা বাস-সংলাপ শুনতে শুনতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল মুন্নি আর বিবি। অসমবয়সী দুই বন্ধু। মুন্নি বড়। চোখে পড়ার মতো জ্বলজ্বলে চেহারার মেয়ে, বাহারি ছাপা শাড়ি আর ম্যাচ-করা ভ্যানিটি ব্যাগে বেশ আধুনিকাও। বিবি হিলহিলে লম্বা, খুব ছেলেমানুষ অথচ গম্ভীর মুখ। মুন্নি নিচু গলায় বলল—'এদের কোনদিন বয়স বাড়বে না, বুঝলি? চিরদিন মায়ের রান্না মাছ-ভাত খাবে, বউয়ের সাজানো টিফিন কৌটো হাতে পাবে। পান চিবোতে চিবোতে লেটে অফিস যাবে আর ট্রামে বাসে রাজা-উজির মারবে।'

বিবি বলল—'কি করবে বলো, ওদের ক্ষমতা হয়ত ওইটুকুই।'

মুন্নি মৃদু তপ্ত গলায় বলে উঠল—'এই পাতি-বুর্জোয়ারাই আসল শ্রেণীশত্রু। স্রেফ এই প্যাসিভ, নেগেটিভ অ্যাটিচুডের জন্য। চতুর্দিকে স্ট্যাটাস কো টিকে রয়েছে স্রেফ এদেরই জন্যে।'

কলকাতার প্রান্তিক অঞ্চলে মেয়েদের হোস্টেলে যাবার পথ। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি, আলিপুর চিড়িয়াখানা সবই এদিকে পড়ে। এখন বরাবর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় বনস্পতি। ছায়ায় ছায়া মিশিয়ে। হঠাৎ এদিকটায় এলে ধুলোর শহর, ভিখিরির শহর কি মিছিলনগরী কলকাতার এসব নাম আদৌ মনে আসে না। মনে হয় কলকাতা এক ছায়াময়ী বীথিকানগরী। এখন বসন্ত সমাগমে শিমূলে মাদারে আগুন, কালচে সবুজ ঝিরিঝিরি পাতার কোল ঘেঁসে রাধাচূড়ার দীর্ঘ হলুদমঞ্জরী। কোনও কোনও বসতবাড়ির ফটকের পাশ থেকে মাথা তুলেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবী। যেদিকেই চাও খালি লাল আর হলুদ। রক্তের মতো লাল আর

আগুনের মতো হলুদ। এই হল বসন্তের রঙ। বসন্তের রঙ কাঁচা সবুজও। নানান বর্ণছায়ের সবুজের কোলে লাল হলুদের খুনখারাপি হোরিখেলা খোলে খুব। এই রকম রক্তসবুজের যৌবনকেই স্পর্ধা মানায়। অন্য বয়সে যাকে হঠকারিতা মনে হতে পারে, যৌবনের কাছে তাই-ই অমিতবীর্য, তাই-ই দুর্জয় সাহস।

এপ্রিল মাসের দুপুর। সূর্য এতোক্ষণ মাথার ওপর ছিল। এখন সামান্য পশ্চিমে হেলেছে। সকালবেলাকার শিরশিরে ভাবটা শিশির শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও। দুই মেয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়াল। দারোয়ান ফটকে নেই। নিজের আস্তানায় খানা পাকাতে পাকাতে বোধহয় তুলসীদাসী সুর চড়িয়েছে। সুরের সঙ্গে রুটি সেঁকার সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। দুপুরবেলাকার হোস্টেল মনে হচ্ছে একেবারে পরিত্যক্ত। সামনের কমপাউণ্ড পার হয়ে ভেতরে গিয়েও ওরা জনপ্রাণীর সাড়া পেল না। মেট্রন খুব সম্ভব নিজের ঘরে দুপুর-ঘুমে তলিয়ে আছেন। ছাত্রীরা ইউনিভার্সিটিতে, কিম্বা ইউনিভার্সিটির নাম করে অন্য কোথাও। হোস্টেলে কেউ থাকলেও সাড়া-শব্দ দিচ্ছে না।

নিজের ঘরের দরজা খুলে মুন্নি বলল—'তুই একটু বোস। আমি দেখে আসি আমার জন্যে কিছু রেখেছে কিনা। দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। সকালে ভাত খাইনি আজ।'

বিবি খাটের পাশে টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। এপ্রিল হলে কি হবে ভীষণ গরম লাগছে। পাখাটা ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে। হাওয়া বিশেষ দিচ্ছে না। হোস্টেলের পাখাগুলো বোধহয় এইরকমই হয়। শুকনো গরম। ঘরের কড়িকাঠের একপাশে লম্বা একটা ফাটল। অন্য দিকে একটু একটু ঝুল জমেছে। দুজনের ঘর। দুজনেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী। বিছানা দুটো পরিপাটি। তবে মুন্নির বিছানার কভারটা ভেলভেটের মতো মহার্ঘ কোনও বস্তুর। চকচক করছে। খুব নরম এবং আরামের মনে হয়। হোস্টেলের দেওয়া টিনের চেয়ারটার পিঠে একটা এমব্রয়ডারি করা ঢাকনা। সীটের ওপর ডানলোপিলোর কুশন। টেবিলেও কাট-ওয়ার্কের কাজ করা একটা সুন্দর ঢাকা। বই খাতাগুলো প্রত্যেকটা বাঁধানো একই রকম ব্রাউন পেপার দিয়ে। দুদিকে দুটো কাঠের হাতির মাঝখানে সেগুলো এক সারিতে সাজানো। মাঝখানে একটা চীনেমাটির পেটমোটা ফুলদানির মধ্যে কলম-পেন্সিল-ডটপেন-কাগজ কাটার ছুরি।

জানলাগুলো খুলে দিল বিবি। হুহু করে হাওয়া এসে মুন্নির রুমমেটের বিছানার চৌখুপ্পি-নকশার চাদর ওলট পালট করে দিয়ে গেল। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি অন্য টেবিলটার ওপর কাগজপত্রের স্তূপে একটা মোটা ডিকশনারি-জাতীয় বই চাপা দিল বিবি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল মুন্নি।

বিবি বলল—'এরই মধ্যে তোমার খাওয়া হয়ে গেল, মুন্নিদি ?'

'উঁহু' মুন্নি বলল, ' দ্যাখ না, মিটসেফের মধ্যে রেখেছে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত, আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। আজকে মাছের দিন ছিল। তা ছোট ছোট সেই কাঁটা অলা রুই না মৃগেলের বাচ্চাগুলোর ধড়টা খেয়ে মুণ্ডুটা আমার জন্যে রেখে দিয়েছে। কে খাবে ? আয় দুজনে মিলে অন্য কিছু খাই।'

ঘরের কোণে স্টোভ জ্বেলে নিমেষের মধ্যে কফি তৈরি করে ফেলল মুন্নি। কনডেন্সড মিল্ক ঢালল দরাজ হাতে। সুদৃশ্য সব কৌটো-টাটো খুলে বার করল ছোট ছোট বিস্কুট, কাজু, মেওয়া। বলল—'খেতে আরম্ভ কর বিবি। তোরও নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে।'

বিবি হেসে বলল—'আমি আসছি বাড়ি থেকে, মায়ের কাছে পেটপুজো করে। আমার কি এতো তাড়াতাড়ি খিদে পাওয়ার কথা ? আমার আসলে দরকার ছিল একটু চানের।'

মুন্নি চোখ পাকিয়ে বলল—'আবার ?'

বিবি হাসতে হাসতে বলল—'আবার।'

—'আচ্ছা স্নানপাগল তো তুই ? যতবার এখানে আসবি, স্নান করবি ? দাঁড়া, কফিটা করে ফেলেছি। খেয়ে ফ্যাল। তারপর দুজনে মিলে স্নান করতে যাবো। ফিরে এসে আর এক রাউণ্ড হবে। কি বল ?' একমুঠো মেওয়া মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে মুন্নি বলল—'এগুলোই আসল সৈনিকদের খাদ্য। আমাদের প্রত্যেকের অভ্যেস থাকা উচিত। যেমন পুষ্টিকর, তেমনি পেটভরা।'

খাটের তলা থেকে সুটকেস টেনে ভেতর থেকে দুটো পরিষ্কার তোয়ালে বার করল মুন্নি, ড্রয়ার থেকে সাবান, তারপর বলল—'চল, কত স্নান আজ করতে পারিস দেখব।'

দুটো বাথরুমের মাঝখানে একটা উঁচু দেয়াল। সীলিং থেকে হাত তিনেক ফাঁক। দুটো শাওয়ার থেকে জল পড়ার শব্দ প্রতিধ্বনিতে কোনও অশ্রুত-পূর্ব বাজনার মতো শোনাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সাবানমাখা একজোড়া হাত ঝিলিক দিচ্ছিল ওদিক থেকে।

—'সাবানটা লোফ।' মুন্নির কণ্ঠস্বর সরু, একটু তীক্ষ্ণ, কিন্তু খুব চনমনে।'

ছিটকে আসা সাবানটাকে নিপুণহাতে ধরে ফেলতে ফেলতে বিবি বলছিল—'তোমাদের হোস্টেলের সেরা ঘর এই স্নানঘর, যাই বলো মুন্নিদি। এমন একখানা ধারা-স্নানের জন্য অনেক কিছু দেওয়া যায়।'

—'যায় বলছিস ? তাহলে দে।'

—'দিচ্ছি দিচ্ছি বাব্বাঃ তর সয় না।'

—'কি দিবি ?'

—'দোব নয়, দিলুম—"সারা দিনের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা…"। অর্থাৎ ঘাম এবং শরীরে জমা সারা দিনের ময়লা…

—'উঁহু উঁহু। ও সব ঘুমপাড়ানি, ঘ্যানঘেনে পদ্য মাথা থেকে বার করে দে। বল্ "অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই ;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখিনি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই।"
প্রাণ খুলে বল—খুন ঔর পসিনা।'

—'খুন আউর কি বললে ?'

—'পসিনা। পসিনা। রক্ত এবং ঘাম, বুঝলি বুদ্ধু ?

—'রাষ্ট্রভাষায় আমার ভক্তি নেই, জানোই তো মুন্নিদি। আমি পুরোপুরি ২১শে ফেব্রুয়ারির দলে।'

—'আচ্ছা আচ্ছা ! সেন্টিমেন্টের বন্যাতেই এরা ভেসে যাবে দেখছি।'

—'তোমার, তোমাদের বুঝি সেন্টিমেন্ট নেই ?'

—'সেন্টিমেন্ট ? বানান জানি না, বুঝলি ? কঠিন বাস্তব নিয়ে কারবার। কত যুগের সঞ্চিত পাপ তোদের এই সো-কলড পুণ্যভূমিতে। এখনও মিথ্যে দলিলে টিপসই দিইয়ে নেয় এখানে মহাজন। হরিজন পোড়ে, এখনও এখানে বণ্ডেড লেবার। শহর থেকে বেশিদূরেও যেতে হবে না দেখতে হলে। এই ঈজিয়ান স্টেবল পরিষ্কার করার ভার পড়েছে যাদের ওপর তাদের ডিকশনারিতে সেন্টিমেন্ট থাকলে চলে ? যাক ও সব কথা। তুই কিন্তু কথা দিয়েছিস। আগামী দিনের মুক্তিস্নানের জন্য যার শরীরে যে ক'ছটাক রক্ত জমা আছে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

জলের আওয়াজ থেমে গেছে। বিবি হঠাৎ স্পষ্টগলায় বলে উঠল—'আচ্ছা মুন্নিদি যাদবপুরের গান্ধী সেন্টারে যে ওইভাবে ভাঙচুর হল, বুর্জোয়া নায়কদের

মুখে কালি লেপে দেওয়ার কথাও তোমরা বলছ। কিন্তু এতেই কি এতদিনকার সিসটেমটা পালটে যাবে ?'

—'যাবে, আমি বলেছি ?'

—'তবে ?'

—'চীনে কালচারাল রেভলিউশন পিকিং ইউনিভার্সিটি থেকেই শুরু হয়েছিল বিবি। সব ছাত্র-কিশোর তরুণ, যুবক কলেজ, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দলে দলে বেরিয়ে এসেছিল। আগে পুরনো সব কিছু ভেঙে ফেলতে হয়। ভেঙে চুরমার করে দেখিয়ে দিতে হয় সিসটেমের ঘৃণ্য অসারতা। "নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও ? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে, উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে।" বুঝলি কিছু ?'

—'নতুন সিসটেমের দরকার। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি—মুন্নিদি, কিন্তু কোথায় সেই সিসটেমের ব্লু-প্রিন্ট ? কি তার চরিত্র ? কোথায় এখনকার সিসটেমের সঙ্গে তফাত ?'

—'শ্রেণীহীন সমাজে পীপল ওরিয়েন্টেড এডুকেশন আমাদের লক্ষ্য। মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। চাষী, মজুর, মেহনতি মানুষকে ভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রের বলে গণ্য করতে শেখাবে না।'

—'খালি থিয়োরিটাই বলছ মুন্নিদি, কি ধরনের সিসটেম তা তো বলছ না।'

—আমাদের দেশে বিপ্লব নেহাত কম হয়নি বিবি। ১৮৫৭র বিপ্লব, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত টেম্পো ঠিক রাখতে পারেনি, কেন জানিস ? পেছনে একটা পরিষ্কার তত্ত্বের জোর ছিল না। তত্ত্বের দিকটা তাই প্রত্যেকটি ক্যাডারের কাছে জলবৎ হওয়া চাই। তাই-ই এতো বক বক করছি। আমাদের প্রাথমিক কাজ বিপ্লবকে সফল করে তোলা। তারপর শিক্ষানীতির নয়া ব্লু-প্রিন্ট হাতে পাবো। তোর জানার নেশা বেশি বলেই তো আজ তোকে একজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি। দেখবি সব সংশয় কিভাবে উড়ে যায়। আচ্ছা এবার বেরো তো।'

ছিটকিনি খোলার শব্দ নির্জন দুপুরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। যেন একই সঙ্গে অনেক মানুষের বুকের ঘরে অনেক অর্গল শব্দ করে খুলে গেল।

চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এলো দুজন। বিবি সাধারণ বাঙালি মেয়ের তুলনায় বেশ লম্বা। পরিষ্কার আয়নার মতো গায়ের চামড়া। এমনিতেই গালে, কপালে একটু লালচে ভাব আছে ; এখন কমলালেবুর রঙের ধনেখালি শাড়ির প্রতিফলনে অদ্ভুত সুন্দর একটা অরুণিমা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায়

সোজা ভুরুর তলায় দীর্ঘ চোখের দৃষ্টি স্তিমিত। চিন্তাশীল। যেন যা দেখছে তার ভেতরে আরও কিছু দেখছে। যা শুনছে তার ভেতরে আরও কিছু শুনতে চাইছে। মুন্নি লম্বায় ওর চেয়ে খাটো। টকটকে ফর্সা। চুল ভিজিয়ে স্নান করেছে এই দুপুরে। কিন্তু চুল এতো কোঁকড়া যে বোঝা যাচ্ছে না। চুলগুলো ছোট নিখুঁত মুখটাকে ঘিরে ফুলে ফেঁপে আছে। আলগা একটা ড্রেসিং গাউন পরেছিল সে।

—'কি ভাবছিস বিবি ? কিছু মনে করেছিস ?'

—'মনে করার প্রশ্ন উঠছে কেন ?'

—'অনেক কথা বলে ফেলেছি বোধহয়। তোর মুখটা কেমন বদলে গেছে। আমি তোর ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু তোকে আমাদের দরকার। তোদের মতো মেয়েরা যদি পিছিয়ে থাকে, নিশান ধরবে কে ?'

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব মুন্নিদি ?'

—'স্বচ্ছন্দে। একটা কেন ? হাজারটা কর না।'

সামনের কম্পাউণ্ডে এখন রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে। বারান্দার মাঝে মাঝে আগুনের জিভের মতো এক আধ চিলতে এসে পড়েছে কোথাও কোথাও। বিবি বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই বিনুনি দুটো বাইরে ঝুলে পড়ল। বিবি মাথায় মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে বলল—'খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে অসুবিধে আছে ?'

—'একেবারেই না। তবে ভেতর দিকে মুখ করে বল। নিচের বারান্দায় না চলে যায় কথাগুলো।'

—'আমার প্রশ্ন—তুমি কেন ?'

—'আমি কেন ? মানে ?' অবাক হয়ে বলল মুন্নি।

—'আর কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। মানেটা বুঝে নিতে তোমায় এক মিনিট সময় দিচ্ছি। ইশারায় কথা বলার অভ্যেস থাকা উচিত তোমাদের।'

—'বুঝেছি বোধহয়। তুই কি আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ডের কথা বলছিস ?'

—'হ্যাঁ।'

মুন্নির মুখ একটু একটু করে কঠিন হচ্ছিল। বলল—'আমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের বাবা-মাদের সত্যি কথা বলতে কি ক্রিমিন্যাল বলে মনে করি আমি। যে দেশে চার ভাগের তিন ভাগ লোক অর্ধাশনে অনশনে দিন কাটায়, সেখানে আমার মা দুধে গন্ধ লাগত বলে ভ্যানিলা ষ্টবেরি কি রোজের গন্ধ মিশিয়ে আমাকে দুধ খেতে দিতেন রুপোর গ্লাসে করে দুবেলা। হীট ওয়েভে যে

দেশে গরমকালে মানুষ মারা যায় সেখানে তাঁরা এয়ারকুলার লাগানো ঘরে মানুষ করেছেন আমায়। সর বাদাম-বাটা মাখাতেন রোজ যাতে আমার গায়ের রঙে আমার স্বদেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা ফুটে না বেরোয়। তা ছাড়াও, তুই যদি ভেবে থাকিস এ বিপ্লব শুধু হ্যাভ নটসদের, তাহলে ভুল করেছিস। নকশালবাড়িতে যেসব সাঁওতাল, ওঁরাও মুণ্ডা রাজবংশী জোতদারদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, চা-বাগানের সশস্ত্র রক্ষীদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছিল তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল, কারা ? কমরেড সান্যাল, কমরেড মজুমদার পূর্ণদা এঁরা কেউ সর্বহারা নন। কিন্তু সর্বহারার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবার মহান ব্রতে তাঁরা তাঁদের বুর্জোয়া অতীতকে মুছে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। শোষণ-পীড়ন আর বঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছু যারা কোনদিন দেখেনি তাদের ঠিক পথে চালিত করতে আমরা যদি এগিয়ে না যাই তো কে যাবে, বল ? এটা তো প্রথম স্টেজ। তারপর সত্যিকার প্রোলেতারিয়েত নেতা ওদের মধ্যে থেকে ঠিকই উঠে আসবে। ততদিন, শুধু ততদিন, আমাদের হাতে নিশান।

বিবি ছেলেমানুষি মুখে ভারিক্কি চিন্তার আদল এনে বলল—'তুমি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করো আমাদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা আছে ? আমাদের কথা ওরা শুনবে ? আমরা ওদের ভাষা জানি না, আচার জানি না। মুন্নিদি, তোমার এই সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরা দারুণ সাফস্টিকেটেড চেহারাটা কোনও সাঁওতাল গাঁওবুড়োর পাশে মনে মনে দাঁড় করিয়ে আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।'

মুন্নি বলল—'আমাদের ইউনিট তো আর কিষাণদের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে না। সেখানে উপযুক্ত লোকই যাবে। কিন্তু এখানে যাদের মধ্যে অপারেট করতে হবে তাদের ভাষাও আমাদের থেকে আলাদা, বিবি। বাংলা হলে কি হবে ? আমাদের দেশে জনগণকে মার্কসীয় তত্ত্ব বোঝানো খুব মুশকিল। ওদের যে ল্যাণ্ড-রিফর্মের দিকে না গিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল নিতে হবে, টোট্যাল রেভলিউশনই যে একমাত্র পথ, সেটা ওদের মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। তবে কি জানিস ? ভেতরের কনভিকশন আর আত্মপ্রত্যয় এ দুটোই আসল। তুই তো দারুণ ডিবেট করিস, তোর এক্সটেম্পোর বক্তৃতাও সেদিন শুনলুম। লীডারশিপ নেবার মতো ব্যক্তিত্ব তোর আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি কতদূর এগোবার অনুমতি পাবো জানি না। তুই কিন্তু কদম কদম এগিয়েই যাবি।'

রোদ-ঝলমল কমপাউণ্ডটায় যখন বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এলো, তখনও বিবির ক্লাস চলছিল। একজন অধ্যাপিকা একজনই ছাত্রী। বারান্দা থেকে সরে

এসে ঘরে। কফির পট আর কাজুবাদামের প্লেট মাঝখানে রেখে।

স্কুল থেকেই বিবি বরাবর তার ক্লাসের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। ডিবেট, আবৃত্তি, অভিনয়, হেড-মিসট্রেসের কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করা। সব ব্যাপারেই বন্ধুরা ওকে সামনে ঠেলে দিত। স্কুল থেকে যখন কলেজে উৎরোলো, নানান অঞ্চল, জেলা, প্রদেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েদের ভিড়ে ও ঘাবড়ায়ওনি, হারিয়েও যায়নি। খুব স্বাভাবিকভাবে প্রথম সারিতে থেকে গেছে। ফলে শুধু নিজের ক্লাস এবং কলেজের নয়, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের অনেক ছেলেমেয়ের কাছেও ও আগ্রহের বস্তু। ওরা অনেক সময়ে খুঁজে খুঁজে ওর সঙ্গে ভাব করে। মুন্নির সঙ্গেও আলাপ এইভাবেই। কলেজ স্ট্রীট কফি-হাউসে পাশের টেবিলে সদ্য কলেজে ঢোকা মেয়েটির মুখে নকশালবাড়ির উল্লেখ শুনে অবাক হয়ে মুন্নি উঠে এসেছিল : —'একটু বসতে পারি তোমাদের টেবিলে ?' চোখে বিস্ময়, কিছুটা সম্ভ্রম, বিবির সঙ্গী ফিসফিস করে বলেছিল—'ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের কালচার‍্যাল সেক্রেটারি।'

—'তুমি দেখছি বেশ খবরটবর রাখো, তোমার বয়স এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডে ব্যাপারটা খুব স্ট্রাইকিং, তাই আলাপ করতে এলুম।'

আজ কলেজে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। লাইব্রেরির পাশে ছোট ছোট কিউবিকলগুলোতে অনার্সের কিছু কিছু ক্লাস হয়। খুব গাম্ভীর্য এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে পড়া চলছিল। হঠাৎ একটি ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'একটা কথা বলব সার ?'

অনেকটা অবাক এবং খানিকটা বিরক্ত হয়ে অধ্যাপক বললেন—'বলো, কিন্তু লেকচারের মাঝখানে এই সব বলাবলি আমি পছন্দ করি না। পরে বলতে পারতে।

—'না। মানে কথাটা খুব জরুরি, প্রাসঙ্গিক···।'

—'ঠিক আছে বলো।'

—'আচ্ছা, এই রূপকথাটা কেন পড়ানো হচ্ছে সার ? কোন মান্ধাতার আমলে এক সায়েব কতকগুলো ছ্যাবলামি আর নাকে-কান্না পাঞ্চ করে যত্ত আজগুবি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে বোতলে ভরেছিল। সেইগুলো আমাদের ভক্তিভরে গিলতে হবে ? যাচ্ছলে।'

একটু একটু করে গরম হচ্ছিলেন অধ্যাপক। এবার বললেন—'গেট আউট ফ্রম মাই ক্লাস।'

—'অ্যায়। এইটেই আশা করছিলুম। উত্তর দিতে না পারলেই গেট আউট ফ্রম মাই ক্লাস।'

অধ্যাপক রাগটা গিলে নিয়ে বললেন—'তুমি সাহিত্য পড়তে এসেছ, এগুলো কেন পড়তে হয় সে উত্তরটা তোমারই জানা উচিত শিবনাথ। দ্বিতীয়ত, যে মেজাজ ও ভঙ্গি নিয়ে তুমি কথা বলছ সেটা—'

—'কেন সার। আমার মনের কথা আমি নিজের মতো করে বলতে পারব না? সাজিয়ে গুছিয়ে ধূপধুনো বেলপাতা দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে? ক্লাসরুমটা কি ঠাকুরঘর? ক্যাপিট্যালিস্ট মার্কিন দেশে পর্যন্ত ছাত্ররা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ক্লাস করে, দেদার প্রশ্ন করে, আপনাদের এই একতরফা বক্তিমে-সিসটেম হোল ওয়ার্ল্ডে কোথাও নেই।'

অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'ঠিক আছে। আই অ্যাম গেটিং আউট।'

বিবি এই সময়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল—'সার একটা কথা। 'টুয়েলফথ্ নাইট'টা কেন পড়ানো হবে, তার উত্তরটা সত্যিই আমাদের পাওয়া দরকার।'

শিবনাথ আস্কারা পেয়ে বলল—'বল্ বিবি বল্! একটা রদ্দি মাল। আমাদের বোকা পেয়ে ইউনিভার্সিটির সিলেবাস-কমিটি সেটা গছাচ্ছে। যেহেতু ইউসফুল কিছু পড়বার সুযোগ দিতে পারেনি। তারপর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বলবে—অ, অনার্স পাশ করে এয়েচো, তা তোমাদের শেক্সপীয়র, মোক্ষমূলর তো এখানে কোনও কাজে লাগবে না চাঁদ, বিড়লা কি টাটাকে অ্যাড্রেস করে বরং বেশ করে একখানা বিজনেস লেটার লিখে ফেলো।'

অধ্যাপক বললেন—'মাইন্ড ইয়োর ল্যাংগোয়েজ অ্যান্ড ম্যানার্স, শিবনাথ।'

শিবনাথ বলল—'আপনাদের শেক্স্পীয়রই তো এইরকম করে কথা বলতে আমাদের শিখিয়ে দিলেন। ওই যে আঙ্কল টোবি না কি! ওয়াক থুঃ। ওয়া ওয়া সার, শেক্স্পীয়রের বেলা আঁটিসুঁটি আর আমাদের পুওর ফেলোদের বেলাতেই খালি দাঁতকপাটি!'

শিবনাথের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে অধ্যাপক বেরিয়ে গেলেন। বাকি ছেলেরা হঠাৎ খুব খুশি হয়ে ডেস্কের ওপর প্রাণপণে তবলা বাজাতে লাগল। অপসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি বলে একটা রব উঠল। শিবনাথ গিয়ে অধ্যাপকের চেয়ার আর টেবিল দুটো উল্টে রেখে দিল। বলল—'এই দ্যাখ, গণেশ উল্টোচ্ছে।'

শিবনাথকে কাঁধে নিয়ে বন্ধুর দল ঘরে ঘরে ঘুরছিল এরপর। কাঁধে শিবনাথ, দরজায় টোকা, দরজা খুলতেই জোর গলায় হাঁক'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি—নিপাত যাক, নিপাত যাক।' ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে জনে জনে ধরে ওরা বলতে লাগল—'আর কেন, গণেশ তো উল্টেছে, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো।' প্রত্যেক ক্লাস থেকে কিছু কিছু ছাত্র

সংগ্রহ করে পুষ্ট হয়েছিল ছাত্রদল। তারপর প্রিন্সিপ্যালের ঘরে হানা। কাঁধে শিবনাথ, ওই অদ্ভুত শোভাযাত্রা ঘরে ঢুকতে যেতেই বাধা পেল। প্রিন্সিপ্যাল বোধহয় আগেই খবর পেয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন—'এসব রাউডিজ্ম্ এখানে চলবে না। বাইরে গিয়ে করো। এখানে নয়।'

—'অবশ্যই এখানে। কারণ অপসংস্কৃতিগুলো এখান থেকেই ফিট করা হচ্ছে।'

তর্কাতর্কি থেকে সামান্য উত্তেজনা ক্রমে চণ্ডাল রাগে পরিণত হল। বিবি এর অনেক আগেই ওখান থেকে সরে এসেছিল। আসলে ও কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে শিবনাথের কথায় সায় দেয়নি। সত্যি কথা বলবার সৎ-সাহস ওর চিরকালই আছে। শেক্স্পীয়রের 'টুয়েলফথ্ নাইট' সম্পর্কে ওর প্রশ্নটা একেবারে আন্তরিক। কী অর্থহীন ভাঁড়ামো, কী ই বা গল্প? কী তার প্রাসঙ্গিকতা! শিল্পের উদ্দেশ্য যদি এন্টারটেনমেন্ট হয় তাহলেই কি চারশ বছর আগেকার অশিক্ষিত জনতাকে যা খুশি করতে পারত, সেই মিউজিয়াম-পীস সাহিত্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক? পড়ে তো রিসার্চস্কলাররা পড়ুক গিয়ে! আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রদের সিলেবাসে জিনিসটা একেবারেই অচল। ক্লাসের ছেলেরা এই সুযোগে ওকে হিরোইন বানাতে চাইছিল। পারলে, শিবনাথের মতোই কাঁধে তুলে নেয়। বেগতিক দেখে ও বড় বড় পা ফেলে ইউনিভার্সিটির দিকে চলে গিয়েছিল। মুন্নিদির সঙ্গে পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এসপ্লানেড ট্রামগুমটির মাথায় মাথায় বিকেলের শেষ আলোটুকু সরে গেল। বিবি বলল—'এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি, মুন্নিদি?'

মুন্নি বলল—'অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে। বউবাজারের ট্রাম ধরব। তোর বাড়ির কাছে হবে, টুক করে চলে যাবি। তোর কি ভয় করছে?'

—'ভয়?' বিবি হাসল।

—'আমিও তাই ভেবেছিলুম। ভীতু হলে কি আর এতো কাণ্ড করতে পারতিস?'

—'আমি কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করিনি। কোনদিন রাজনীতি করার অভিজ্ঞতাও নেই, মুন্নিদি।'

—'শুনে রাখ বিবি। অভিজ্ঞতা আমারও ছিল না। আমি যে কলেজে পড়েছি সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর ন্যাকা ন্যাকা হিরোইন তৈরি হয়, কথায় কথায় যারা চোখ বড় বড় করে হাসতে শেখে, ছলে বলে কৌশলে শাঁসালো বর যোগাড় করাই যাদের শিক্ষা-দীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই আবহাওয়া থেকে

এসে আমি যদি পারি, তো তুই পারবি না কেন ?'

সরু গলির মধ্যে আবর্জনার দুর্গন্ধ। বাজারের ভিড়, নোংরা, স্টেশনের ভিড় ঘেয়ো কুকুর, কৈদো বেড়াল। গলির একটু ভেতরে ঢুকতেই কিন্তু শুনশান। বোধহয় গত শতাব্দীর বাড়ি। ভেঙে ভেঙে পড়ছে। মানুষ থাকে কি না বোঝা গেল না। বিজলি নেই। নিচের তলায় একটা খুপরি জানলা দিয়ে অল্প আলো আসছে। ভেজানো দরজা ঠেলে ওরা ঢুকল। গোটা তিন চার লণ্ঠন জ্বলছে। দু একজনের বেশি কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকাল না। ঘর-ভর্তি। কয়েকটা চেনা মুখ। মেয়ে অল্পই। ছেলে বেশির ভাগ। কাউকে কাউকে কফি হাউসে, ইউনিভার্সিটির লনে, কলেজের করিডরে দেখেছে। এক ইন্দ্রদা ছাড়া কারো সঙ্গে সোজাসুজি আলাপ নেই। সকলেই চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছে। মুন্নিদি বলল—'ওরা বোধহয় 'লিবারেশন'-এর যে সংখ্যাগুলো হাতে পেয়েছে, পড়ে নিচ্ছে।' কেউ একজন মুন্নিদিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিল।

আধো-অন্ধকারে একটা গম্ভীর গলা। ঘরের ও প্রান্তে একজন উঠে দাঁড়িয়েছে : 'কমরেড, আমরা আজ এক মহান যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। বহুশতাব্দীব্যাপী ক্যাপিটালিস্ট রাজ আজ শেষ হতে চলেছে। এ শুধু 'পীপলস ডেলি' বর্ণিত বসন্তকালীন বজ্রের গর্জন নয়। নকশালবাড়ির লাল সম্ভাবনাকে আজ আমরা এ শহরের বুকের ওপর রূপ দিতে চলেছি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ আমাদের হাতে যে ঝুটো আজাদি তুলে দিয়ে গেছে তার ফলস্বরূপ আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চক্রের দাসত্ব করতে করতে আমাদের শৃঙ্খলিত বাইশ বছর কেটে গেছে। এখন আমাদের শোষক তালিকায় আরও যুক্ত হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সোভিয়েত-সোশ্যালিস্ট-সাম্রাজ্যবাদ। ভারতবর্ষের পাঁচশ কোটি মানুষ এখন নিষ্ঠুরতম অত্যাচার ও শোষণের হাতে অসহায় বলির পশু। রুজিহীন, নিরাশ্রয়, নিঃস্ব, নিরন্ন।

'আমাদের সামনে এখন একটাই পথ—চীনের পথ। আমাদের হাতে এখন একটাই হাতিয়ার—চীনের হাতিয়ার। যে নেতারা শোধনবাদের পথে বুর্জোয়া-শক্তির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছেন, আমরা তাঁদের বর্জন করি। কমরেড লিন-পিয়াওয়ের মতে একমাত্র গেরিলা-যুদ্ধই ভারতের কোটি কোটি মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত করে তাদের দিয়ে অসাধ্যসাধন করাতে পারে। জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ক্ষিপ্র, ভয়াল। কোনও শক্তির সাধ্য থাকবে না তার অগ্রগতিকে রোধ করে। আমাদের লক্ষ্য হবে গ্রামে,

শহরে, মফঃস্বলে ছোট ছোট মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে পীপল্‌স্ লিবারেশন আর্মি তৈরি হতে পারে। শ্রেণিশত্রুদের ঘায়েল করে এই পীপল্‌স্ আর্মিই ছুঁড়ে ফেলে দেবে প্রতিক্রিয়াশীল এই শাসনব্যবস্থাকে। প্রতিষ্ঠিত করবে কিষাণ-মজদুরের স্বরাজ।

'মনে রাখতে হবে বিপ্লবের পথ রক্তে পিচ্ছিল। ভুলে গেলে চলবে না ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক রীতিতে শিক্ষিত পুলিশ সম্প্রদায় আজও আমাদের নিরাপত্তার দখলদার। ভুলে গেলে চলবে না, সামান্যতম অজুহাতে তারা কী অত্যাচার আমাদের ওপর চালাতে প্রস্তুত। ছেষট্টি সালের খাদ্য-আন্দোলনের কথা স্মরণ করুন। সাতষট্টি সালে ইডেন গার্ডেনে দর্শকদের ওপর পুলিসি হামলার কথা স্মরণ করুন। তার কিছুদিন আগে ঊনষাট সালে গ্রামাঞ্চলের লোক কতকগুলো দাবি-দাওয়া নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে এলে আশি জন নিরস্ত্র চাষীকে ওরা মেরে ফেলে। এই পুলিসবাহিনীর মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

'কমরেড, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন "বন্দুকের নলই—"।'

ঘরের মধ্যে যেন মেঘগর্জন হল—'শক্তির উৎস।' 'সংসদীয় গণতন্ত্র'—'নিপাত যাক।' 'চীনের চেয়ারম্যান'—'আমাদের চেয়ারম্যান।' 'নকশাল বাড়ি'—'লাল সেলাম।'

পাশাপাশি ফিরে যাচ্ছে দুজনে। মুন্নিদি একটাও কথা বলছে না। অন্ধকারে ওর মুখের আদল চিন্তামগ্ন, গম্ভীর। হঠাৎ একটা হাওয়ার মতো উঠল। আকাশের এ প্রান্ত নীল, ওদিকে বিশাল মেঘ। পেছন থেকে কে ডাকল—'মুন্নি!'

মুন্নিদি দমদেওয়া পুতুলের মতো থেমে গেল। পেছনের স্বর পাশে এসে দাঁড়ালে বিনা ভূমিকায় মুন্নিদি বলল—'বিবি, অন্তুদার সঙ্গে আলাপ কর।' তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বিবির কাছ থেকে অনেক দূর।

বিবি দেখল ক্ষুরধার একটা তরোয়াল। অন্ধকারে দুর্মূল্য ধাতু চমকাচ্ছে। স্থির একটা বিদ্যুতের রেখা নিমেষের মধ্যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

—'তোমার মনে অনেক প্রশ্ন, মুন্নি বলছিল।'

বিবি চুপ।

—'বুদ্ধিমানরাই প্রশ্ন করে। সংশয়ীরা সাধারণত বুদ্ধিমান হয়।'

বিবি সাগ্রহে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল—'আমার প্রশ্নগুলোর আপনি জবাব দেবেন ?'

জলদ গম্ভীর স্বরে জবাব এলো—'না।'

বিবি চমকে তাকাল। পাশের মুখ ভাবলেশহীন।

আলোকিত কলেজ স্ট্রীট। অনেক রাস্তা হাঁটা। ঝড় উঠছে, উঠল। চোখে-মুখে ধুলোর ঝাপটা। ট্রাম-বাসের চেহারা অস্পষ্ট।

—'তোমার ট্রাম আসছে বিবি, উঠে পড়ো। এক একটা সময় আসে যখন প্রশ্ন করার সময় থাকে না। জবাব দেবারও না।

আলো-অন্ধকারে

কান্তিভাই ভুলাভাই এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর কমার্শিয়াল ম্যানেজার পরমার্থ রায়ের বয়স পঞ্চাশের সামান্য ওপরে। কিন্তু প্রচুর চুল পেকেছে। ঘাড় অবধি ঝামর চুল। কাঁচা পাকা চুলের এই কেশর ভদ্রলোককে একটা খুব স্টাইলিশ চেহারা দিয়েছে। লম্বার চেয়ে ইনি চওড়ায় একটু বেশি। বেশ আঁট-সাঁট। র সিল্কের টি-শার্ট বা বুশ শার্ট পরা পছন্দ করেন। টাই পরেন না প্রায় কখনই। মোটাসোটা হওয়ার দরুন ক্ষিপ্রতা বা কর্মশক্তি কোনটাতেই কম পড়েনি। উৎসাহে সবসময় টগবগ করছেন। পরমার্থ রায় এই গুজরাতি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁর সব-কিছু প্রতিভা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। তাঁর কাজ-কর্ম, হাবভাব দেখলে মনে হয় কম্প্যানিটা কান্তিভাই ভুলাভাইদের নয়, তাঁরই। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কান্তিভাই ফ্যাক্টরি অঞ্চলে আসেনই না বলতে গেলে। কলকাতার অফিসে বসে কিছুক্ষণ কান চুলকে বাড়ি চলে যান। পরিচালনার দায়িত্ব কার্যত পরমার্থরই। এবং সে দায়িত্ব খুব নিপুণভাবে পালন করে ভদ্রলোক মালিকপক্ষকে খুব খুশি এবং নিশ্চিন্ত রাখতে পেরেছেন। ভদ্রলোকের ত্রুটি কিছু কিছু থাকতে পারে যেমন বিলেত গেছেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না। ঔরংজেবের মতো অপরের প্রতি কিছুটা ভরসাহীন। কিন্তু সকলের প্রতি আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছায় এগুলো তাঁর প্রাণশক্তিতে টইটম্বুর চরিত্রে মানিয়ে গেছে। এবং ভালো হোক মন্দ হোক, স্বজাতি-প্রীতিটি তাঁর নিখাদ। বাঙালির উদ্যমহীনতার বিরুদ্ধে তিনি সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দেন। স্বজাতির অন্যান্য দোষ এবং গুণ সম্পর্কেও তিনি বেশ সচেতন। আজ পরমার্থ রায়ের চলাফেরা ওঠাবসার একটা অতিরিক্ত উচ্ছলতা এসেছে। আশাতীত রকমের উজ্জ্বল কেরিয়ারের বাঙালি এঞ্জিনিয়ার পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগপত্র বার করে দিয়েছিলেন। খালি ভাবনা হচ্ছিল না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কিন্তু আজ সকালে পূর্ব-ব্যবস্থামতো কম্প্যানির ট্রাক গিয়ে ভদ্রলোকের আসবাবপত্র নিয়ে এসেছে।

ভদ্রলোক স্বয়ং এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন, সঙ্গে স্ত্রী। পরমার্থ রায়কে দেখলে মনে হচ্ছে তিনি হাতে সত্যি সত্যি চাঁদ পেয়েছেন। অর্থাৎ বড় বড় পোস্টে কাজ করেও পরমার্থ সেইসব পোস্ট-সুলভ নির্বেদ আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁকে দেখলে বেশির ভাগ সময়েই মনের ভাব বোঝা যায়। অর্থাৎ আদতে পরমার্থ রায় সরল স্বভাবের মানুষ। সজীবতা যাদের কোনও পোস্ট বা পোশাকের তলাতেই চাপা পড়ে যায় না তাদের সগোত্র।

প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সারা হয়ে গেলে পরমার্থ নবনিযুক্ত এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীর দিকে ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বললেন—'সরি, মিসেস্ সেনগুপ্ত, আমার উচিত ছিল গোড়াতেই আপনাকে আমার মিসেসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। এতোক্ষণে আলাপ-পরিচয়ও হয়ে যেত, আপনার সময়টাও এরকম বাজে কাটত না। কথাটা যে কেন মনে হয়নি!'

মিসেস সেনগুপ্তর বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে যে কোনও জায়গায়। চুল কাঁধ ছাড়িয়ে ধাপে ধাপে নেমেছে পিঠের মাঝখান পর্যন্ত। স্ল্যাক্স্ এবং চিত্র-বিচিত্র টপ পরনে। দামী হেয়ার-কনডিশনার এবং পারফিউমের গন্ধে বাতানুকূলিত ঘর অনেকক্ষণ থেকে দম বন্ধ করে আছে। মাথা ঈষৎ হেলিয়ে, প্রবাল রঙের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি বলল—'ইটস্ অল রাইট, মিঃ রয়। আমার অসুবিধে তো হচ্ছিলই না, বরং ইনটারেস্টিং লাগছিল খুব।'

—'ইনটারেস্টিং?' পরমার্থ ঝুঁকে বসলেন, 'আচ্ছা! কোনটা ইনটারেস্টিং লাগল?'

—'কাজের অ্যাটমসফিয়ার আমার দারুণ লাগে। নানান রকমের কাজ আমায় অ্যাট্রাক্ট করে মিঃ রয়। চ্যালেঞ্জিং জব্স্। আমি যদি এখুনি একটা বিজনেস এগজিকিউটিভ হয়ে যেতে পারতাম তো লাইফটা ঠিকঠাক এনজয় করতাম; বিশ্বাস করুন! এইরকম একটা দুর্দান্ত ঘরে বসে ইনটারেস্টিং সব ফাইল নাড়াচাড়া!'

মাথা ঝাঁকিয়ে, শরীরটাকে চেয়ারের পিঠে ফেলে হো-হো করে হেসে উঠলেন পরমার্থ।

—'ইনটারেস্টিং ফাইল? আপনি রিয়্যালি হাসালেন মিসেস সেনগুপ্ত। যেখানে যত প্রব্যাবল কাস্টমার্স আছে আপনার প্রোডাক্ট সব কমদামে কিনে ফেলতে চাইছে, বুঝলেন? সাঙ্ঘাতিক্ কমপিটিশন। এই ফাইলটার চিঠিপত্রের মধ্যে ওই একটা তথ্যই ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

একটা ফাইল দেখিয়ে বললেন পরমার্থ। মিসেস সেনগুপ্ত ঘাবড়াবার পাত্রী

নয়। চুলসুদ্ধু মাথা দুলিয়ে বলল—'আই উড টেক ইট অ্যাজ আ. চ্যালেঞ্জ !'

—'দাঁড়ান তাহলে। আমার নেক্সট্ ম্যান অরণ্য মুখার্জিকে বলছি আপনাকে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিতে। এগজিকিউটিভ পোস্ট-এ ভেক্যান্সি হলেই আপনাকে পাকড়াও করছি। কি মিঃ সেনগুপ্ত, আপত্তি আছে ?'

সেনগুপ্ত খুব চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ মনে হল। শুধু হাসলেন। মিসেস সেনগুপ্ত বলল—'সত্যি !'

—'না তো কি ?'

তিনজনে উঠে দাঁড়ালেন।

—'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?' মিসেস সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করল। পরমার্থ বললেন—'অবশ্যই আমার বাড়ি। একটু চা টা খাবেন। আমার গৃহিণীর সঙ্গে পরিচিত হবেন।' সেনগুপ্তর দিকে ফিরে বললেন—'মিসেসকে নিয়েই যখন এলেন তখন থেকে যেতে পারতেন। আপনাদের ফ্ল্যাট রেডি। ফার্নিচার-টার সব যথাস্থানে চলে গেছে ; যদিও একটারও প্রয়োজন ছিল না। কম্প্যানি তো আপনাকে ফার্নিশ্‌ড্ কোয়ার্টার্স-ই দিত। তাই-ই প্রাপ্য। ছাড়বেন কেন ?'

মিসেস সেনগুপ্ত সুবক্র ঠোঁটে হেসে বলল—'তাহলে আমার নিজস্ব শখের ফার্নিচারগুলো বরাবরের জন্য কোনও গো-ডাউনে রেখে দিতে হয়, মিঃ রয়। এতদিন মিডল ইস্টে ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি। এখনও না পেলে.....।

সেনগুপ্ত বললেন—'বারোয়ারি ফার্নিচার ব্যবহার করায় আমার স্ত্রীর আসলে একটু আপত্তি আছে মিঃ রায়। সেটা উনি সঙ্কোচে বলতে পারছেন না। যাই হোক,, একটা কুকিং রেঞ্জ আর ফ্রিজ পাবো তো ?'

—'নিশ্চয়ই।'

বেল টিপলেন পরমার্থ। ছোটখাটো চেহারার একটি পিওন এসে দাঁড়াল। রায় বললেন—'অনাদি, এই সাহেব আর মেমসাহেবকে আমার বাড়ি নিয়ে যাও।' সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে বললেন—'আপনারা এগোন, আমি এখুনি আসছি কয়েকটা কাজ সেরে। আমার স্ত্রী বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

দুজনে বেরিয়ে যেতে আপন মনেই হাসতে লাগলেন রায়। ফোনটা তুলে নিয়ে বাড়ির নম্বর ঘোরাতে লাগলেন—'হ্যালো জয়ন্তী। আমি তোমার পতিদেবতা বলছি ! তোমার গ্রেগরি পেককে পাঠিয়ে দিলুম। ভালো করে রিসিভ করো।'

—'কি বাজে বকছো কি ? কে আবার আমার গ্রেগরি পেক ?' ফোনের মধ্যে

বোঝা গেল গৃহিণী ভ্রূকুটি করেছেন।

—'বাঃ ! অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ফটো দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়লে, একেই নিতে হবে বলে বায়না ধরলে আর এখন বলছ, কার গ্রেগরি পেক ? শোনো, সঙ্গে মিসেসও আছেন। ইনি গ্রেগরি পেক তো উনি জিনা লোলো, তুমি আর পাত্তা পাচ্ছো না, ডিয়ার !'

—'কি অসভ্যের মতো করে যাচ্ছো তখন থেকে ? অচেনা গেস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছো, শীগগির বাড়ি এসো বলছি !'

—'আরে পঞ্চাশোর্ধেও যদি একটু অসভ্যতা না করব তো কবে করব গিন্নি ? চান্স দাও একটু জেলাস-টেলাস হবার ?'

ওদিক থেকে দুম করে ফোন রেখে দেবার শব্দ হল। মিটিমিটি হাসতে হাসতে পরমার্থ হাতে টুসকি দিয়ে কোনও অশ্রুত সুরের তালে তালে নাচতে লাগলেন। আড়াল থেকে কেউ দেখলে নির্ঘাত পাগল ভাবত।

জানলার ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডগুলো নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পরমার্থ। তালা লাগালেন নিজের হাতে। বাইরে গিয়ে দারোয়ানকে বাকি অফিস বন্ধ করতে বলে, পাশের ছাউনিতে গিয়ে স্কুটারে চড়ে বসলেন। ফ্যাক্টরি-এলাকার মধ্যে তিনি নিজের স্কুটারে ঘোরাফেরা করতেই ভালোবাসেন। সেনগুপ্ত-দম্পতি গেছে পদব্রজে। মেয়েরা হাঁটে আস্তে আস্তে। মিসেসের সঙ্গে তাল রাখতে সেনগুপ্তর শ্লথগতি হয়ে যাবে। তিনি ভটভটিয়ায় চড়ে নিমেষের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন খিড়কির দরজা দিয়ে। ওদের আগেই।

মিসেসকে বলা ছিল আজ একজন অতিথি আসার কথা। কে, কি বৃত্তান্ত কিছুতেই ভাঙেননি, এই মজাটুকু করবেন বলে। পেছনের প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই গৃহিণীর আয়োজনের গন্ধ পেলেন রায়। বাতাসে নাক তুলে শোঁ শোঁ করে শ্বাস নিতে নিতে ভেতরে ঢুকলেন—'হুঁ, হুঁ। হাঁউ মাউ খাঁউ।'

জয়ন্তী রায় একটা ঝলমলে সিনথেটিক শাড়ি পরে তদারক করছিলেন। টেবিলের ওপর ওঁদের রাঁধুনি রামশরণ সাজিয়ে রাখছে প্লেটগুলো। মাথার ওপর চাপ চাপ কোঁকড়া চুল, যথাসম্ভব ছোট করে ছাঁটা। সাদা ঘাড়ের ওপর সোনার চেন চিকচিক করছে। জয়ন্তী রায় ভটভটিয়ার আওয়াজ পেয়েই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। 'হাঁউ মাউ খাঁউ' শুনে ভুরুটা একটু কুঁচকোলো, মাথাটা এমনভাবে ঝাঁকালেন যে কানের হীরে থেকে রেখার মতো একটা দ্যুতি এসে বিঁধে গেল পরমার্থর কাঁধের ওপর। চোখ ছোটছোট করে পরমার্থ সব লক্ষ করছিলেন। মনে মনে হাসলেন—রাগ করা হয়েছে ! ব্যাটা রামশরণ ছায়ার মতো ঘুরঘুর না

করলে রাগ ভাঙানোর একটা বিলি-ব্যবস্থা এক্ষুনি হয়ে যেত। তা ইডিয়টটা যেন আঠা দিয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে সাঁটা। উনি রান্নাঘরে গেলেন তো ইনিও গেলেন। উনি এলেন তো ইনিও এলেন।

জয়ন্তী বললেন—'চায়ের জলটা মিনিট পনের পরে চাপিও রামশরণ। দেখো বেশি ফুটে না যায়।'

বাইরে বেল বাজল। পরমার্থ দরজা খুলে দিতে এগোলেন।

মিসেস সেনগুপ্ত অবাক হয়ে বলল—'বাঃ আপনি কি করে আমাদের আগে পৌঁছে গেলেন?'

—'হুঁ হুঁ বাবা। স্লো বাট স্টেডি উইন্‌স্ দা রেস। আপনারা নিশ্চয়ই রাস্তার মাঝখানে ছায়াভরা গাছটাছ দেখে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছেন সেই আলসে খরগোশটার মতো। এদিকে আমি ব্যাটা কচ্ছপ হলে হবে কি?' নিজের ছোটখাটো আঁটসাঁট ভুঁড়িটির দিকে আঙুল দেখিয়ে পরমার্থ হাসলেন—'ঠিক টুকটুক টুকটুক করে হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেছি। আসুন মিঃ সেনগুপ্ত।'

দু হাতে পর্দা সরিয়ে ঢুকলেন জয়ন্তী।

পরমার্থ নিচু হয়ে আদাব জানাবার ভঙ্গিতে বললেন—'আসুন আসুন, ইনি মিঃ সেনগুপ্ত, আমাদের চীফ এঞ্জিনিয়ার। আর ইনি জয়ন্তী রায়, আমার অশেষ গুণশালিনী বেটার হাফ। জয়ন্তী, মিট পারমিতা সেনগুপ্ত, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সবরকম গুণে ইনি তোমাকে টেক্কা দেবার জন্যেই জন্মেছেন, পারমিতা সেনগুপ্ত মৃদু হেসে বলল—'নো মিঃ রয়, আমার কোনও গুণ নেই। দেখে যদি গুণী-টুনী মনে হয় তো মনে রাখবেন অ্যাপিয়ারেন্সেজ আর ডিসেপটিভ।'

পরমার্থ বললেন—'ক্রমশ সবই প্রকাশ্য হবে। তাড়া কি? জয়ন্তী তোমার কফি ক্লাবের মেম্বার একজন বাড়ল।'

চীফ এঞ্জিনিয়ার দেয়ালের বাহারি র‍্যাকে রবীন্দ্ররচনাবলীর সেটটার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। হাসির বাষ্পও নেই সে মুখে। জয়ন্তী জনান্তিকে বললেন—'তোমার ভাঁড়ামিটা একটু থামাবে? সকলে কি সব পছন্দ করে?' তারপর সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে বললেন—'বসুন মিঃ সেনগুপ্ত, একেই ক্লান্ত তারপর আপনাদের ইনডিফ্যাটিগেবল্ ম্যানেজার সাহেবের বকবকানি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হয়েছে।'

পারমিতা বলল—'বারোটা নাগাদ বেরিয়েছি। নানারকম কাজ সারতে সারতে আসছি। মিঃ রয় কিন্তু খুব ইনটারেস্টিং লোক। আমার একটুও বোরিং লাগেনি।'

জয়ন্তী বললেন—'আপনাদের প্রোগ্রাম কি? মানে কবে আসছেন? শুধু দুজনই...?'

পারমিতা বলল—'আমাদের ছেলে পুরুলিয়া সৈনিকে পড়ে। ভেকেশনে আসবে। এমনিতে আমরা দুজনই।'

দরজার কাছে রামশরণ গলা খাঁকারি দিল। জয়ন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'এসো রামশরণ!' প্লেটগুলো অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—'একটু জলযোগ করুন মিঃ সেনগুপ্ত। খেতে খেতেই কথা হোক...ওকি! হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? মুখই তুলছেন না যে! মিসেস সেনগুপ্ত আপনার স্বামী যত বড় টেকনোক্র্যাটই হোন না কেন, এ যুগের পক্ষে ভয়ানক লাজুক।'

পরমার্থ দেখলেন সেনগুপ্তর মুখ প্রথমে সাদা, তারপরে টকটকে লাল হয়ে গেল। দেশ-বিদেশ ঘোরা এঞ্জিনিয়ারসাব মেয়ে দেখলে ঘাবড়ে যান—এটা একটা সংবাদ বটে!

অবশ্য জয়ন্তী কোন অর্থেই সাধারণ মেয়ে নয়। একে সাঙ্ঘাতিক সুন্দরী। তার ওপর প্রচণ্ড স্মার্ট। কথাবাতরি ধারে, সাজপোশাকের বাহারে যে কোনও পুরুষের কান কাটতে পারে। পরমার্থ যখন প্রথম দেখে ছিলেন চোখ ঝলসে গিয়েছিল। কথাবার্তা শুনে চমকে গিয়েছিলেন। যে কোনও বিষয়ে পরিষ্কার মতামত দেবার মতো পড়াশোনা ভাবনা-চিন্তা আছে জয়ন্তীর। পরমার্থ নিজেও অত জানেন না। সেনগুপ্ত একটু চুপচাপ ধরনের। এরকম মুখচোরা পুরুষ জয়ন্তীর সান্নিধ্যে এলে ঘাবড়ে যাবেই। সবাই তো আর পরমার্থ রায় নয়। বিদ্যা-বুদ্ধি-সপ্রতিভতা যাই থাক না কেন, মেয়েরা শেষ পর্যন্ত মেয়েই, স্ত্রীও শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-ই। এই তত্ত্বটা বোঝা হয়ে গেছে পরমার্থর। পিয়ানোর ঠিক কোন চাবিতে হাত পড়লে কি সুর বেরোবে পিয়ানোবাদক ঠিকই জানে। মাথার কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে দিয়ে খুশিতে ডগোমগো হয়ে হাত চালালেন পরমার্থ। জয়ন্তীর তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত। যে কোনও পরিস্থিতিতে ওকে ফেলে দাও, সে মাঝগঙ্গার মতো গভীর ব্যাপার হলেও ও ঠিক সাঁতরে পাড়ে উঠে আসবেই। সেনগুপ্তর স্ত্রী পারমিতা মেয়েটিও রূপসী। কিন্তু অপরিণত, এখনও। জয়ন্তীর মতো ক্ষুরধার হতে সময় লাগবে। আদৌ হবে কিনা বলা শক্ত; যতই স্ল্যাক্স পরে স্বামীর কর্মস্থলে প্রথম দিন আসুক।

পারমিতা বলল—'করেছেন কি? এতো কেউ খেতে পারে?'

—'ডায়েট যদি না করেন তাহলে তো ঘাবড়াবার কিছু নেই! অবশ্য করলেও

কিছু এসে যায় না, আমি নিজেও যথাসম্ভব ফ্যাট-ফ্রি-জিনিস খাই। চপটা ভাপা চপ। রাশিয়ান সালাডের দই আর শশা ফ্যাট গলিয়ে দেবে। চিকেনটা অবশ্য ভেজেছি। কিন্তু রেড মীট তো আর নয়!

পারমিতা একটা চপ চামচে দিয়ে ভেঙে মুখে পুরল লিপস্টিক বাঁচিয়ে, স্বামীর দিকে চেয়ে বলল—'তুমি কিছু নিচ্ছো না যে! কিছু হয়েছে?' সেনগুপ্ত তাড়াতাড়ি এক টুকরো ভাজা মাংস কাঁটায় গেঁথে বললেন 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি ঠিক আছি।'

পরমার্থ বেশ তৃপ্তি করে মাংসর টুকরো চিবোতে চিবোতে বললেন—'ছেলেকেও নিয়ে আসুন। আমাদের এখানে ফ্যাক্টরির বাস ছেলেদের স্কুল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে নিয়ে আসে। বর্ধমানে, চন্দননগরে ভালো স্কুল আছে। আমার দুই ছেলে-মেয়েও বর্ধমানে পড়ে।'

সেনগুপ্ত মৃদু গলায় বললেন—"সেটল করে গেছে। ওকে ডিসটার্ব করে কোন লাভ নেই।'

পারমিতা বলল—'পাবলিক স্কুল এডুকেশন যাতে পায় সে জন্যই আরও দেওয়া, খানিকটা স্যাক্রিফাইস তো করতেই হবে।'

জয়ন্তী তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন—'পাবলিক স্কুল এডুকেশন! মানে ব্রিটিশ টাইপ? এখন? এই ভারতবর্ষে? স্বাধীনতার ঊনচল্লিশ বছর পরেও? কি মিঃ সেনগুপ্ত, আপনারও কি তাই মত নাকি?'

সেনগুপ্তকে খুব বিব্রত দেখাল। দু তিনবার গলা পরিষ্কার করে অস্ফুটে কি যে বলতে চাইলেন, বোঝা গেল না। পারমিতাকে দেখে মনে হল সে ভেতরে ভেতরে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। ফলের চাটনিটা নিতে গিয়েও নিল না। ঘড়ি দেখল একবার। পরমার্থ এসব লক্ষণ নির্ভুল চেনেন, কথা ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন—'রামশরণকে চা-টা আনতে বলো জয়ন্তী', সেনগুপ্তকে লক্ষ করে বললেন, 'চাটা খেয়েই চলুন আপনাদের ফ্ল্যাটটা দেখে আসবেন।'

জয়ন্তীর কতকগুলো মেজাজ তিনি বোঝেন না। কোথায় কি বলতে হবে ওর চেয়ে ভালো কেউ জানে না। কিন্তু ইচ্ছে করে দুমদাম ইঁট ফেলে মাঝে মাঝে। পরমার্থ স্বভাবতই সমর্থন করেন না। পরে চোখে আঙুল দিয়ে সামাজিকতার এই সব ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে নির্বিকার মুখে জয়ন্তী বলবে—'এক একটা কথার ধাক্কায় মুখোশগুলো ভেঙেচুরে আসল চেহারাগুলো কেমন বেরিয়ে পড়ে, দেখতে ইচ্ছে করলে কি করবো? বেশ তো, তোমার অসুবিধে হলে আমায় নিয়ে যেও না।'—যেন ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব।

পরমার্থ আশা করেছিলেন তাঁর প্রথম দিনের এই অতিথি-সৎকার বেশ আদৃত হবে আগন্তুকদের কাছে। সেনগুপ্ত-দম্পতি জয়ন্তীর রন্ধন-কুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করবে, লোকে সাধারণত তাই করে থাকে। সঙ্গত কারণেই। কিন্তু ওরা আলতো করে কয়েকটা টুকরো-টাকরা খেয়ে হাত গুটিয়ে বসল এমনভাবে যে, তিনি একেবারেই হতাশ হয়ে পড়লেন। ওঁর মুখের দিকে চাইলে এখন মনে হবে একটা বড় হলঘরে যেন বেশির ভাগ বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেনগুপ্তরা উঠে দাঁড়াতে জয়ন্তী বললেন—'আপনাদের ফ্ল্যাটটা আমিই বেছেছি, মিঃ সেনগুপ্ত। পছন্দ না হলে বলবেন', এমনভাবে বললেন যেন অতিথিদের ভাবান্তর আদৌ তাঁর নজরে পড়েনি।

পরমার্থ বললেন—'এই সেদিনও বিল্ডিংটা একতলা ছিল। বাংলো। প্যাটার্নটা রেখেই দোতলা করিয়েছি। একেবারে নতুন ধরনের। হঠাৎ দেখলে লন্ডনের শহরতলির বাড়ি বলে মনে হবে, অথচ ভেতরটা একেবারে আধুনিক। বম্বে থেকে সেরামিক টাইলস আনিয়ে ফ্লোরটা করিয়েছি। আপনার পছন্দ না হলে আমিই নিয়ে নেব।—কি বলো?' জয়ন্তীর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন পরমার্থ।

জয়ন্তী সংক্ষেপে বললেন—'ইটস মেন্ট এক্সক্লুসিভলি ফর দেম।'

পরামর্থ বললেন—'আপনাদের ফার্নিচার কোথায় কি থাকবে সেসব প্রাথমিক ব্যবস্থা উনিই করেছেন। সারাটা সকাল কোমর বেঁধে ওখানেই কাটিয়েছেন। পরে অবশ্য আপনারা ইচ্ছেমতো উল্টে-পাল্টে নেবেন।

চারজনে যখন বেরোলেন, সন্ধ্যার ছায়া পড়ে গেছে চারদিকে। সোজা, সমান্তরাল রাস্তাগুলো। পিটে পিটে শক্ত, সমান করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে সুরকির বলে ভ্রম হয়। আসলে কিন্তু এ অঞ্চলের মাটিই এমনি লাল। দুধারে প্রচুর গাছপালা। দোতলার চেয়ে উঁচু কোনও বাড়ি নেই। আকাশরেখা তাই উদার। প্রত্যেকটা বাড়ির সঙ্গে বাগান। কেউ কেউ খুব সুন্দর বাগান করেছে। দোলনচাঁপার মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়।

পারমিতা বলল—'জায়গাটা খুব সুন্দর তো! অনেকটা শান্তিনিকেতনের মতো, তাই না?'

সেনগুপ্তকে লক্ষ্য করে কথাটা বলা হলেও জবাব এলো না। রায় খুব খুশি হয়ে বললেন—'কি যে কমপ্লিমেন্ট দিলেন আমায় নিজেই জানেন না মিসেস সেনগুপ্ত। এইভাবে বাগান-টাগান করা অ্যাকচুয়ালি আমার উৎসাহেই সম্ভব হয়েছে। আগে একেবারে ন্যাড়া-বোঁচা ছিল। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ বাগানের জন্য

একটা প্রাইজ ডিক্লেয়ার করি। গতবার পেয়েছিল একজন সাধারণ ওয়ার্কার। অপূর্ব চুবড়ির মতো চন্দ্রমল্লিকা করেছিল দশ রকম রঙের। নিজস্ব জমির বাগান ছাড়াও এখানে ফ্যাক্ট্রির বাগান আছে। নানারকম সবজি, ফল হয়। সবাই ভাগ পায়।

সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মৃদু। গাছের ফাঁকে ফাঁকে হ্যালোজেন জ্বলে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে চারজনে খুব বাহারি একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। টালি-ছাওয়া পর্চ। বেশ বড়, চৌকো।

পরমার্থ বললেন—'নিচে থাকেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অরণ্য মুখার্জি। চমৎকার লোক। আলাপ হলেই বুঝবেন। স্বামী আর স্ত্রী।'

জয়ন্তী যোগ করলেন—'ছেলেমেয়ে নেই। হয়নি। সেনগুপ্ত সাহেব আপনাদের অসুবিধে হবে না।'

পারমিতা আশ্চর্য হয়ে বলল—'অসুবিধে কি ? আমার ছেলেকে হস্টেলে রেখেছি বলে বলছেন ? আসলে আমরা এখন কোথায় থাকবো ঠিক নেই বলেই...'

বাড়ির সামনে একটা ঝুপড়ি শিউলি ফুলের গাছ। তলায় ফুল বিছিয়ে অন্ধকারে একটা গোল সাদা বেদীর মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা। একটু দূরে খুব সম্ভব বকুল। মুখার্জিদের ঢোকবার পথ সোজাসুজি। চওড়া পর্চ দিয়ে। দোতলায় যাবার ফটক ডান দিকে। খোলা দরজা দিয়ে নিচু ধাপের চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। মেজানিন ফ্লোরের ঘরের দরজা খুলে জয়ন্তী বললেন—'যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন এটাকে। স্টাডি হিসেবে, গেস্টরুম হিসেবে। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সের এখানে দরকার হয় না। ওয়ার্কারদের বউ ছেলে মেয়েরাই বেশির ভাগ কাজ করে দিয়ে যায়।'

সিঁড়িতে বাঁক নিয়ে মেহগনি রঙের দরজার সামনে বেশ নাটকীয়ভাবে দাঁড়ালেন রায়। পকেট থেকে চাবি বার করে মিসেস সেনগুপ্তর হাতে দিলেন—'আপনার বাড়ি আপনিই খুলুন। হাতে খড়ি হয়ে যাক।'

কপাট দুটো দু হাতে সরিয়ে ভেতরে গিয়ে আলোর সুইচ টিপে দিলেন রায়। তিরিশ বাই কুড়ি মতন একটা লম্বা হল। দেয়ালে স্নিগ্ধ সবুজ আর হাতির দাঁতের রঙ। আলো পিছলে পড়ছে সাদা বড়দিনের কার্ডের মতো ছোট ছোট ফুলের কুঁড়ি আঁকা মেঝেতে। উল্টো দিকে মোটা কাচের পাল্লার ওধারে ব্যালকনি। বাঁদিকে জানলা। ডানদিকে অন্যান্য ঘরে যাবার এবং প্যাসেজে যাবার তিনটে দরজা।

জয়ন্তী বললেন—'এ ঘরটাতে আপনাদের ডিনার-টেবল রাখবার দরকার হবে না। ওদিকে রান্নাঘরের লাগোয়া বেশ বড় ডাইনিং স্পেস আছে। আসুন।'

এক এক করে ঘরগুলো খুলে দেখাতে চলে গেলেন জয়ন্তী পারমিতাকে নিয়ে। হলের সোফায় গা ডুবিয়ে বসলেন পরমার্থ। সেনগুপ্তকে নিয়ে।

—'আপনি একটু দেখে-টেখে আসুন।'

সেনগুপ্ত বললেন—'অনেক আয়োজন করেছেন মিঃ রায়। একটু নিরিবিলি পরিবেশ ছাড়া আমার প্রয়োজন সামান্যই।'

—'সেদিক থেকে কান্তিভাই ভুলাভাই' আদর্শ জায়গা বলতে পারেন। ইচ্ছে হলে যে কোনও মানুষ এখানে নির্জনবাস করতে পারে।'

সামান্য একটু ভুরু তুললেন সেনগুপ্ত, কথা বললেন না।

প্যাসেজ দিয়ে স্টীল হীলের শব্দ তুলে পারমিতা এসে দাঁড়াল, পেছনে জয়ন্তী—'কি পছন্দ হয়েছে তো ?'

—'চলবে'— পারমিতা সেনগুপ্ত বসে পড়ে বলল, 'দু একটা ফার্নিচার একটু জাগা বদল করব, তাহলেই কোজি হয়ে যাবে। থ্যাংকউ মিসেস রয়।'

জয়ন্তী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

পরমার্থ বললেন—'আপনার জয়েন করতে তো আর মোটে তিন দিন। আজ থেকেই সেটল করতে পারতেন। সুবিধে হত।'

সেনগুপ্ত বললেন—'পরশুই একেবারে এসে যাবো। কয়েকটা জরুরি কাজ আছে, সারতে হবে।'

—'অ্যাজ ইউ প্লীজ'—রান্নাঘর-টরগুলো ভালো করে দেখে নিয়েছেন তো মিসেস সেনগুপ্ত ?'

—'দেখেছি। চমৎকার ! আয়্যাম গ্রেটফুল টু য়ু মিসেস রয়। রিয়্যালি !'

জয়ন্তী রায় আড়ষ্ট হেসে বললেন—'ওহ্, নীড্‌নট মেনশন।'

নিচে নামতে নামতে সিঁড়ির মুখে ওদিককার দরজার তালা খোলবার শব্দে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন পরমার্থ।

—'মুখার্জিরা এসে গেছে মনে হচ্ছে। ভালোই হল। দুদিনের ছুটি নিয়ে ওরা দীঘা ঘুরে এলো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপটা সেরেই যান।'

জয়ন্তী দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন—'থাক না। আলাপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। একদিনের পক্ষে টু মাচ্ হয়ে যাবে না ?'

—'বাঃ মুখার্জিরা কি মনে করবে বলো তো?'

খোলা দরজা দিয়ে হই হই করতে করতে ঢুকে পড়লেন পরমার্থ। পেছন

পেছন ঢুকতে ঢুকতে জয়ন্তী সেনগুপ্তকে লক্ষ করে বললেন—'আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না। আমার কিন্তু দোষ নেই।'

—'মুখার্জি কোথায় গেলে ?' গলা চড়ালেন পরমার্থ।

—'কি ব্যাপার ?' লম্বা, টৌকো চেহারার অরণ্য মুখার্জি এগিয়ে এলেন। চাপা রঙ। মাথার চুলে ঢেউ, ডানদিকে সিঁথি। এখন চুল খুব সম্ভব লম্বা ভ্রমণের জন্যই এলোমেলো হয়ে আছে।

—'এই যে মিঃ সেনগুপ্ত, আমার ডান হাত অরণ্য মুখার্জি। মুখার্জি, আমাদের নতুন চীফ এঞ্জিনিয়ার সাব আর তাঁর চীফ'—নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন পরমার্থ——চেঁচামেচি করে ডাকলেন 'কই হে মিসেস মুখার্জি ? মেড ফর ইচ্ আদার কমপিটিশনের একজোড়া ক্যানডিডেট দেখে যাও।'

অরণ্য মুখার্জির স্ত্রী জানলার দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। ওপরের মতোই বিশাল হলঘরের বাঁদিকে। অস্ফুট গলায় বলল—'ঘর ভর্তি গুমোট। জানলাগুলো অন্তত খুলতে দেবেন তো পরমার্থদা।' জয়ন্তী রায়—স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পটার আলো জ্বেলে দিলেন। মৃদু সাদাটে আলো হঠাৎ চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল সবার মুখে। অরণ্য মুখার্জির স্ত্রী একাই খালি অন্ধকারে অস্পষ্ট, জানলার কাছে। পরমার্থ স্নেহভরা গলায় বললেন—'চলো ব্রততী, মুখার্জি চলো, আমাদের বাড়ি চা যাবে। একগাদা খাবার-দাবার করেছে জয়ন্তী। কি বলেন সেনগুপ্ত ? আরেক রাউন্ড চায়ে তো আপত্তি নেই ?'

সেনগুপ্ত সম্মতি দিলেন কিনা বোঝা গেল না। অরণ্য মুখার্জির স্ত্রী হঠাৎ কোনও ভূমিকা না করেই ওদিকের শোবার ঘরে ঢুকে গেল, পেছন পেছন ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তী রায়।

—'কি হল কি ?' পরমার্থ হতভম্ব হয়ে বললেন।

জয়ন্তী ঘরের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বললেন——'তোমরা এগোও। ব্রততী বেচারার সেই বিশ্রী পেটের যন্ত্রণাটা আবার আরম্ভ হয়েছে। আমি ওকে একটু সুস্থ করে যাচ্ছি।'

অরণ্য মুখার্জি একটু অপ্রস্তুত, একটু চিন্তিত মুখে এগিয়ে এসে বলল—'আপনারা একটু বসে যান। এখুনি সুস্থ হয়ে যাবে। কি যে হয় থেকে থেকে !'

পারমিতা বলল—'মাঝে মাঝেই হয় নাকি ?'

—'বেশি পরিশ্রম হলেই হয়। অনেকটা বাস জার্নি তো ! গরমটাও কমেনি

তেমন।'

—'আমি যাবো একবার ?' পারমিতা বলল।

সেনগুপ্ত তার কাঁধে হাত রাখলেন। পরমার্থ বললেন—'ওসব জয়ন্তী জানে ঠিক। আপনি নতুন মানুষ—গিয়ে কি করবেন ?'

ভেতরের ঘর থেকে চাপা গোঙানি এবং উদ্‌গত কিছু চাপবার শব্দ শোনা যেতে লাগল। সেই শব্দ ও তার কারণ মানুষটির ভেতরকার অসহ্য যন্ত্রণার সংবাদ উপস্থিত সব কটি মানুষকে বিবর্ণ করে দিল। পরমার্থ পরিবেশ হালকা করার বৃথা চেষ্টায় বললেন—'চলুন, মিসেস সেনগুপ্ত, আমার বাড়ি গিয়ে একটু বসে যাবেন।'

অরণ্য মুখার্জির স্ত্রীর খুলে-যাওয়া জানলা পথে হাওয়া না হোক শেষ সন্ধ্যার ঠাণ্ডা ঢুকছিল ঘরে। স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পটার ভৌতিক আলোয় ধবধবে ফর্সা সুমন্ত সেনগুপ্তকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল, বললেন —'না···আমাদের অনেক দূর···পরে আবার···।'

পরমার্থ বললেন—'তাহলে আমরা গেলাম মুখার্জি। রামশরণকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাড়ি গিয়ে, যদি কিছু দরকার হয়।'

কাঁচা পাকা চুলের মধ্যে দিয়ে চিন্তিতভাবে হাতটা চালাতে লাগালেন পরমার্থ রায়। পেছনে তাড়া করে আসছে রুদ্ধ গলার হাহাকার। দুঃসহ যন্ত্রণার।

পদাতিক পদক্ষেপ

উত্তর কলকাতার যে ঘনবসতি অঞ্চলে বাপ্পাদের বাস একসময়ে সেটা কলকাতার খুবই বনেদি অংশ ছিল। এখন বেশির ভাগ বাড়িই নিয়মিত সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। বাপ্পাদের বাড়িটা শেষবার সারানো হয়েছিল বছর চল্লিশ আগে। বাড়ির গাঁথুনি খুব পোক্ত হওয়ায় এতদিনকার অবহেলার ছাপ কমই পড়েছে। লাল ইঁটের বাড়ি। যতবার বর্ষা যায়, রঙ ধুয়ে আরও উজলে ওঠে। অন্তত বাড়ির বাসিন্দাদের তাই মনে হয়। পাড়ার অন্যান্য বাড়ির তুলনায় তাদের পাঁচ নম্বরের অবস্থা ভালোই। এক ডানদিকের একেবারে কোণে অপূর্ব মিত্তিরের বাড়ি ছাড়া বাকি সবগুলোই ছ্যাতলা-পড়া। বহু বর্ষার জল পেয়ে ইঁদুরের গায়ের মতো কালচে রঙ্ ধরেছে, আসলে গোলাপি, হলুদ যাই থেকে থাক না কেন। বাপ্পাদের আর অপূর্ব মিত্তিরের—এই দুটো ছাড়া আর সবগুলোই ভাড়াবাড়ি। বাড়িওলাও সারিয়ে দেয় না, ভাড়াটেরও গরজ নেই নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে কিছু করার। বাপ্পাদের বাড়ির পেছন দিকটা ভাড়া দেওয়া। নইলে বাবা হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যাবার পর চার ভাইবোন এবং মা একেবারেই জলে পড়তেন।

সদর দরজা খুলেই লম্বাটে উঠোন। দরজার সোজাসুজি কয়েকটা চওড়া ধাপ উঠে ভেতরে যাবার দরজা। উঠোনের একদিকে ইঁট ঘিরে মাটি ফেলে একটা পেয়ারা গাছ করা হয়েছে। বাপ্পা উঠোনের ধাপের ওপর বসেছিল। ধাপটা ইঁট বার করা। ফাঁকে ফাঁকে আগাছা এবং শ্যাওলা জন্মেছে। বাপ্পার বয়স উনিশ টুনিশ হবে। সরু সরু পাকানো তারের মতো দাড়ি গোঁফে মুখটা ভরা। ওর দুপাশে দুটো পাতাবাহারের গাছ। এক সময়ে মাটির টবগুলো পেতলের আধারে বসানো ছিল। কোনও সময়ে অভাবের সংসারে কাজে লেগেছে সেগুলো। পেতলের এই বড় বড় টবগুলোর ওপর বাপ্পার ভীষণ একটা ঝোঁক ছিল। বাবা ছিলেন শৌখীন মানুষ। গাছপালার শখ ছিল। ঠাকুর্দাদার আমলের এই পেতলের টবগুলো বাপ্পার কাছে বড়মানুষির একটা প্রতীকের মতো ছিল বোধহয়। যেদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখল ওগুলো নেই, সেদিন খুব কান্নাকাটি করেছিল। মা, দাদা কেউই সদুত্তর দিতে পারেনি।

বাপ্পার সামনে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি সরু সরু হাত-পা নেড়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল তার নাম অষ্টা। অষ্টা বাপ্পার একসময়ের সহপাঠীও বটে, পাড়ার বন্ধুও বটে। এই সেদিন পর্যন্ত অষ্টার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল গ্র্যাজুয়েট হয়ে বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রেলওয়ের কেরানিগিরিতে ঢুকে পড়া। কিন্তু এখন নানা কারণে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা মার খেয়ে গেছে। অষ্টা বলল—'দুজনে মিলে ওয়ার্ক আউট করবি। বাচ্চুকেও ডেকে নে। নাহলে সময়মতো পৌঁছবে না। ছেলেগুলো কি ততক্ষণ কলম চিবোবে?'

কিছুক্ষণ আগে এ বছরের হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার ঘন্টা পড়েছে। আজ অঙ্ক। তারই প্রশ্নপত্র এখন অষ্টার হাতে। বাপ্পা একটা কাগজে অঙ্ক কষতে কষতে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল—'ঠিক পৌঁছে দিতে পারবি তো : ওপর থেকে নেমে আসা যত সহজ, নিচ থেকে ওপরে ওঠা তত সহজ নয় কিন্তু।'

অবহেলার স্বরে অষ্টা বলল—'ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। তুমি আগে দাও তো গুরু। বাচ্চুকে ডেকে নিচ্ছো না কেন?'

বাচ্চু নিজেই এই সময়ে বৈঠকখানার মুখে এসে দাঁড়াল। হাতে খবরের কাগজ। নিচের ধাপের ওপর দাদাকে খাতা কলম হাতে ব্যস্ত এবং সামনে অষ্টাকে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাচ্চু বলল—'কি ব্যাপার রে অষ্টাদা? কি করছিস?' অষ্টা গম্ভীর মুখে বলল—'সোশ্যাল ওয়ার্ক।'

—'মানে?'

—'মানে গুষ্টির পিণ্ডি। দাদার পাশে বসে পড়ে আঁকগুলো কষে দাও

দিকি!'

মুখ ভেঙচে বলল অষ্টা।

—'দেখি, দেখি,' বাচ্চু এবার এসে কাগজটা তুলে নিল—'এ যে দেখছি এইচ এস-এর পেপার! আজকের! কি করে পেলি অষ্টাদা?'

অষ্টা চোখ নাচিয়ে বলল—'বাহান্ন নং সেন্টারের পাশের গলি থেকে পাঞ্চজন্য বাজালুম'— মুখে দুই আঙুল পুরে তীব্র সিটি দিয়ে উঠল অষ্টা, বলল—'তারপর ঢিলের সঙ্গে বাঁধা পেপার সুড়সুড় করে হাতে নেমে এলো।'

বাচ্চু বলল —'এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

—'কি ঠিক হচ্ছে না?' অষ্টার মুখের চেহারা মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে গেল,—'জানিস এই পেপার সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, সাউথ ক্যালকাটা সব জায়গায় আউট হয়ে গেছে! মাস্টারস বোর্ডের লোকেরা সব টাকা খেয়েছে! আমরা নর্থের ছেলেরাই শুধু ফেরেব্বাজির ভিকটিম হবো ভালোমানুষ সেজে?'

বাচ্চু দুর্বল গলায় বলল—'তোরা পেপার ক্যানসেল করাবার জন্যে কিছু করতে পারতিস! 'কপি করতে প্রশ্রয় দিবি তাই বলে?'

বাপ্পা গরম গলায় বলল—'এই সব প্রশ্নপত্র উত্তর করা আর না করায় কোনও তফাত আছে বলে আমি মনে করি না বাচ্চু। পরীক্ষা ক্যান্সেল করানো অত সহজ! প্রমাণ, সাক্ষী, কোর্ট অনেক ব্যাপার আছে। অষ্টা ইজ রাইট। অনেক দিন ফেরেব্বাজি সয়েছি। আর না, পুরো এডুকেশন সিসটেমটাই ইংরেজ আমলের শিক্ষানীতির দুর্গন্ধ উদ্‌গার। মেকলে নামে লোকটা কেরানি আর দালাল বানাতে এ জিনিস চালু করেছিল। আজও টিচাররা সেই ব্যাকডেটেড সিলেবাস, সেই একই নোটস ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের হেড সারের ইংরিজি নোটস্ এর খাতাটাই মনে কর না! পচা কতকগুলো আদর্শবাদ শিক্ষার নামে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নিজেরা করছে ক্যাপিটালিস্টদের নির্লজ্জ দালালি, আর ছাত্রদের শেখাচ্ছে সদা সত্য কথা বলিবে, আর পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।'

বাচ্চু বলল—'ঠিকই বলছিস দাদা, কিন্তু এর সঙ্গে এইচ এস-এর প্রশ্ন টোকার কি সম্পর্ক!'

—'তুই জানিস বাচ্চু, কোন স্কুল কি পোজিশনে আসবে সব আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকে। কোনও কোনও বিশেষ স্কুল কলেজ বরাবর প্রশ্ন জেনে পরীক্ষা দেয়। এই পরিস্থিতিতে সুবোধ বালকের মতো পরীক্ষা দেবার কোনও মানে হয়? বোস, এরিথমেটিক পোর্শনটা কষে দে তো!'

—'বলছিস ? তুই সীরিয়াস ?'

দু ভাইয়ের বাদানুবাদের মাঝখানেই অষ্টা বেরিয়ে গিয়েছিল। এই সব যুক্তিতর্কর মধ্যে সে নেই। তার প্রতিভা হল অ্যাকশনে। অ্যালজেব্রা অংশটার উত্তর হয়ে গেছে—এখুনি সেটা মজুমদারদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে, সেখানে টাইপ করার লোক বসে আছে। অষ্টা মোট তিনবার এইচ এস ফেল করেছে এই অঙ্ক পেপারের জন্যেই। এবার নিজে না বসে অন্যদের পাশ করাতে সে বদ্ধপরিকর।

দুজনে মিলে অঙ্কের প্রশ্নটা পুরোপুরি সমাধান করে ফেলল ঘন্টা খানেকের মধ্যেই। অষ্টা সেটা নিয়ে দৌড়লো সেন্টারের দিকে। মজুমদারবাড়ির দরজা খুলে রেখেছে ওর বন্ধু গোপাল। গোপালই টাইপ করছিল। দোতলার জানলা থেকে ঢিল-নোঙ্গর করা হল কাগজটা। ঘরের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। ইনভিজিলেটর বৃদ্ধ শিক্ষক উঠে দাঁড়ালেন।

—'কি ব্যাপার ? কি ওটা ? ব্যাকবেঞ্চে তোমরা ছেলেরা কি করছো ?'

নড়বড় করতে করতে তিনি পৌঁছে গেলেন শেষ বেঞ্চে। সেখানে দুই ছাত্র তখন মোড়া কাগজটা ভালো করে ডেস্কের ওপর বিছিয়ে খাতায় কপি করছে। সামনের বেঞ্চের দুজনও ঘুরে বসেছে। অনেক ছেলেই উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন। পেছন থেকে ভারী ভাঙা গলার আশ্বাসবাণী শোনা গেল—'ব্যস্ত হবেন না বন্ধুগণ। সবাই পাবেন। আপনাদের সুবিধের জন্য টুকরো টুকরো কাগজে উত্তরগুলো করা হয়েছে। প্রয়োজনমতো নিয়ে যাবেন।'

ইনভিজিলেটরকে ছেলেরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। একে এক্স্টারন্যাল সেন্টার। তার ওপর এরা কোনদিন এ স্কুলের ছাত্র ছিল না। থাকলেও কি হত বলা যায় না।

ইনভিজিলেটর জীবনবাবু বলে উঠলেন—'টুকলি করছিস ? ধেড়ে গোবিন্দ ছেলে। লজ্জা-শরম নেই আবার পাত পেতে সবাইকে ডাকা হচ্ছে ? দে খাতা, দে বলছি ! জীবনবাবু খাতার কোণা ধরলেন। হাত ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে লিকলিকে ধারাল একটা ছুরি উঠে এলো তাঁর পেটের কাছে—'ভালো চান তো রঙ বাজি করতে আসবেন না দাদু, ভুঁড়ি ফড়কে কাঁটালের ভুতি বেরিয়ে যাবে।'

চমকে হঠে গেলেন বৃদ্ধ শিক্ষক। তারপর কাঁপতে কাঁপতে নিজের জায়গায়। সাদা মুখ নিচু করে নিজের জায়গায় বসে কাঁপা হাতে একটা বই তুলে নিলেন তিনি। চোখের সামনে সরষে ফুল। একষট্টি বছর বয়স হল। দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে অনেক বেত চালিয়েছেন, রক্তচোখ দেখিয়েছেন, ভুঁই-পটকার মতো

জোরালো গাঁট্টা বেরিয়ে এসেছে হাত থেকে। এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। পরের ঘন্টায় তাঁর জায়গায় আর একজন এলে, জীবনবাবু সোজা চলে গেলেন হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে।

—'সার !'

—'আসুন জীবনবাবু, কি হল ?

—'ব্যাপার ভয়ানক। ন' নম্বরে ছেলেরা টুকলি করছে। বাইরে থেকে আনসার আসছে। আমাকে ছুরি দেখাল।'

—'কি দেখাল ?'

—'ছুরি সার, ছুরি। অশ্লীল গালিগালাজ করল।'

—'বলেন কি ? চলুন তো দেখি !'

—'দাঁড়ান সার। ভেবে-চিন্তে কাজ করুন।'

—'পুলিস ডাকছি। একটা ব্যবস্থা তো করা দরকার ! আগে আমি দেখে আসি। আপনি আসুন। দেখিয়ে দেবেন কোন ছেলে আপনাকে ছুরি দেখিয়েছিল।'

—জীবনবাবু ঘামতে লাগলেন, বললেন—'ওরে বাবা, আমি পারব না সার, হার্টের অসুখ, বুক ধড়াস ধড়াস করছে।'

—'জীবনবাবু।' হেডমাস্টারমশাইয়ের গম্ভীর গলার ধিক্কার। জীবনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এগোলেন।

—সেকেণ্ডপেপারটা প্রাণপণে কষে যাচ্ছে বাপ্পা। শক্ত এসেছে। জিভটা ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে কলমের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। মাথার ওপর রোদ। বাচ্চু ভেতরে গেছে আপাতত। খোলা দরজা দিয়ে দুজন মানুষ ঢুকল। ছায়াহীন দুপুর। দুপাশ থেকে দুজনে ওর কীর্তি দেখছে বাপ্পার হুঁশ নেই।

—'কি ব্যাপার বাপ্পা ? তোমার কি আবার এইচ, এস, দেবার দরকার পড়ল নাকি ?' বাপ্পা চট্ করে কাগজটা চাপা দিল। রিফ্লেক্স্ অ্যাকশন। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি হেসে উঠল। ছেলেটি বলল—

—'হাসির কথা নয় বিবি। যে-ছেলেটি ন্যাশনাল স্কলারশিপ নিয়ে ফিজিক্সে অনার্স পড়ছে, সে হঠাৎ এপ্রিলের গরম দুপুরে নিজের বাড়ির উঠোনে বসে চলতি হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার অঙ্ক কষবে কেন ?'

বিবি চট করে প্রশ্নপত্রটা টেনে নিল। দরজা ঠেলে বাড়ি ঢুকলো অষ্টা।

—'হয়েছে ? আরে···' বলেই একটু বিদ্রোহী মুখে থেমে গেল সে। হতবুদ্ধির মতো সমস্ত দৃশ্যটা একবার দেখে নিয়ে বিবি বলল—'তোরা বুঝি এইচ, এস, এর

কোয়েশ্চন পেপার চুরি করে এনে উত্তর সাপ্লাই দিচ্ছিস, বাপ্পা ?'

ওদের গলা পেয়ে বাচ্চু এসে দাঁড়াল।

—'অন্তুদা, আপনি এ সময়ে ?' বাচ্চুর চোখ মুখ জ্বলজ্বল করছে।

—'তোমাদের খুব অসুবিধে করলুম এসে ?' ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে ছেলেটি বলল।'

—'না মানে তা নয়।'

বিবি তখনও জবাব পাবার আশায় তাকিয়ে আছে বাপ্পার দিকে। বাপ্পার শরীরে স্টীলের ফিতের মতো একটা নমনীয় শক্তি। হাতের মুঠি সামান্য তুলতেই বাইসেপস্ ফুলে উঠল। শূন্যে মুঠো ছুঁড়ে কঠিন মুখে বলল—'এটাই আমাদের প্রতিবাদের প্রথম স্টেপ।'

—'কিসের প্রতিবাদ ?' অন্তুদা বলল।

—'কিসের নয় ? রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজব্যবস্থা— যা কিছু আমাদের অনন্তকাল দুর্ভোগের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে।'

বিবি কিছু বলতে যাচ্ছিল, অন্তুদা ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—'অষ্টা, তোমার যেখানে যাবার ছিল, যাও, বাপ্পা তোমার কি দেরি আছে ? একটু কথা ছিল। ভেতরে চলো।'

বাচ্চু বলল, 'আমি নয় ?'

অন্তুদার সোনালি চশমায় ঝিলিক দিল। ঠোঁটে দুর্লভ হাসি। ভেতরে যেতে যেতে বলল—'নিশ্চয়ই। শুধু একটু পরে।'

বিবি বলল—'মা কোথায় রে বাচ্চু ?'

—'মাঝের ঘরে। কাগজ-টাগজ পড়ছে বোধহয়।'

হাত পা ধুয়ে বিবি মায়ের ঘরে ঢুকল। বিছানার ওপর উঠে খুব লক্ষ্মী মেয়ের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মা চোখ থেকে চশমাটা নামালেন, কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন, তারপর বললেন, —'মুন্নির হোস্টেলেই ঠিক ছিলি তো ?'

—'তাই তো তোমায় বললুম কাল !'

—'না রে বিবি, যা বলবি আমাকে অন্তত ঠিক বলবি। না হলে বিপদ আছে। অন্তুর সাড়া পেলুম যেন !'

—'এসেছে তো !'

—'তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?'

—'মুন্নিদির ওখানেই।'

—'এতদিন কোথায় উধাও হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলি ?'

—'না। জিজ্ঞেস করলেও জবাব দেয় না মা।'

মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বললেন—'ওকে না হয় বল রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে। তাড়াতাড়ি করে দোব এখন।'

—'বলব।'

মা যতক্ষণ না ঘুমোলেন বিবি মায়ের কপালে তারপর পায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বিবি জানে এই সময়ে মায়ের মাথা টিপ টিপ করে, কাজ কর্মের শেষে শুলেই পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এক এক সময়ে মা পায়ে ছেঁড়া শাড়ির পাড় বেঁধে রাখে যন্ত্রণায়। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে কিছুটা ভালো আছে এখন। পা টিপতে টিপতে আরামে মার চোখ বুজে আসছে। তবু কক্ষনো মুখে বলবে না। গভীর মমতা বিবির চোখে, যেন মা নয়, সে-ই এখন তার মায়ের মা।

ঘন্টা দুয়েক পর বাপ্পা দরজার কাছে এসে ইশারায় ডাকল। বিবি দেখল বাপ্পা তার দিকে একটা অন্যরকম উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। মুখে শুধু বলল—'আমাদের কথা হয়ে গেছে, অন্তুদার কি দরকার। ডাকছে তোকে।'

বাপ্পার পড়ার ঘরে, টেবিলের ওপর কনুই রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা অঙ্কের বই পড়ছিল অন্তুদা। বিবি চৌকাঠ থেকে বলল—'মা আপনাকে রাত্তিরে খেয়ে যেতে বলছে অন্তুদা।' অন্তুদা যেন শুনতেই পায়নি। বিবি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বলল—'বাপ্পার মাথাটা খেলেন তো ?'

—'অর্ধভুক্তই ছিল।'

—'বাকিটা চিবিয়ে শেষ করে দিলেন ?'

—'বিবি, বিপ্লবের মাটি যে কতটা তৈরি, তার হাতে-হাতে প্রমাণ কিন্তু তুমি নিজের বাড়িতে বসে পেলে। শুধু তোমাদের শ্যামপুকুরে নয়, এই জিনিস আমি শিবপুরেও দেখে এসেছি। কারুর কাছ থেকে কোনও নির্দেশ এরা পায়নি। আমাদের সঙ্গে বাপ্পা আর তার বন্ধুদের কোনও যোগ নেই। জিজ্ঞাসা করে জানলুম ওরা নিজেরাই জনা পনের ছেলে, তার মধ্যে অষ্টার মতো স্কুল-ড্রপ-আউটও আছে, বাপ্পার মতো ব্রিলিয়ান্ট স্কলারও আছে—ওরা নিজেরাই ঠিক করেছে, পরীক্ষার এই প্রহসন ওরা চলতে দেবে না। শিক্ষার নামে এই চর্বিত-চর্বণ, এই ভুলে-ভরা পরীক্ষার সিসটেম কিছুতেই মানবে না। বুঝতে পারছো কিছু ?'

—'কি ?'

—'স্বাধীনভাবেই, কারো অপেক্ষা না রেখেই, ওরা বিপ্লবের পথে পা

বাড়িয়েছে। ওরা তত্ত্ব জানে না। রাজনীতিও কোনদিন করেনি। জিনিসটা স্বতঃস্ফূর্ত। কমরেড মজুমদারের কথার সত্যতা আমি ষোল আনা বুঝতে পারছি।' অন্তুদার চোখ জ্বলতে লাগল। সে চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে রইল। বিবি বলল—'বাচ্চুটাকে বাদ দিলেন কেন ?'

—'বাচ্চু আমার সবচেয়ে দামী ঘোড়া। ওর প্রস্তুতি অন্যরকম। ওকে আমায় শীগগিরই অ্যাকশন স্কোয়াড কম্যাণ্ড করতে পাঠাতে হবে। পীপলস্ কোর্টও পরিচালনা করবে ও।'

বিবি হঠাৎ আকুল হয়ে বলে উঠল—'অন্তুদা, আমি একাই কি যথেষ্ট ছিলুম না ?'

—'কি আশ্চর্য !' গলার স্বর পাল্টে গেল, 'তুমি এবং আমি, বাপ্পা, বাচ্চু এবং অন্যান্য আরও এক্স, ওয়াই, জেড্, কেউই একা একা তো যথেষ্ট নয়ই। সবাই মিলেও যথেষ্ট কিনা সন্দেহ আছে বিবি। আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে পেলে তো কথাই ছিল না। এখনও পর্যন্ত পাতি-বুর্জোয়ার নেতৃত্বই চলছে, চলবে। জঙ্গল সাঁওতালের মতো দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। অনেক স্যাক্রিফাইস আরও অনেক স্যাক্রিফাইস আমাদের সামনে অপেক্ষা করে রয়েছে' গলা খাদে নামিয়ে বলল—'গোপীবল্লভপুরে শেষ পর্যন্ত ওরা তো পিছিয়ে গেল, কেন এখনও বুঝতে পারিনি, অ্যানালিসিস দরকার। খুব সম্ভব শহরের ছেলেদের অধীনে কাজ করতে ওদের ভালো লাগেনি। তাছাড়াও, আমরা রাজনৈতিক অধিকার দখলের ওপর জোর দিয়েছি, ওরা চায় নগদ লাভ। ব্যাপারটা বোধহয় ওরা ঠিক বুঝতে পারে না। আসলে কাজে নামলে বোঝা যায় থিয়োরি দিয়ে বেশিদূর এগোনো যায় না।'

—'অন্তুদা, আপনার এই উপলব্ধির কথা পার্টিকে তো জানানো দরকার। ফার্দার অ্যাকশনের আগে অ্যানালিসিস করে নেওয়াই তো ভালো।'

—'সময় নেই, সময় নেই। পশ্চাত্তাপের সময় এ নয় বিবি। বারবার ভুল করতে করতে ঠেকে শেখা ছাড়া গতি নেই। সব কাজগুলো যুগপৎ করতে হবে। তুমি কাজ না করলে কাজ তোমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। কি ব্যাপার বলো তো ? তোমাকে দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে ?'

বিবি আস্তে আস্তে বলল—'যেখানে নেতৃত্ব এত র‍্যাশ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সুযোগ এতো কম, সেখানে আমরা তিনজনেই যদি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ি, কে আমাদের মাকে দেখবে বলুন ? নিশ্চয়ই সুনীলদা, আর আরতিদিদের মতো করে আপনিও বলবেন না আগে বিপ্লব, পরে মা। পরে অন্য সব।'

—'দাদাকে বাদ দিয়েছি তো বিবি।'

—'কেন দিয়েছেন ভালো করেই জানেন। দাদা নিরীহ, ভালোমানুষ। ওকে দিয়ে আপনাদের কাজ হত না। কিন্তু আমাদের তিন ভাই বোনকে বাদ দিয়ে শুধু দাদা মায়ের সান্ত্বনা হবার পক্ষেও যে বড্ড দুর্বল, এটা আপনার জানা উচিত।' অন্তু টেবিলে টোকা মারতে মারতে বলল—'বিবি, তোমার মতো ধীর স্থির, বিপদে অচঞ্চল এরকম নির্ভরযোগ্য ক্যাডার আমাদের আর আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তুমি কিছুতেই মশালের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠতে পারো না, তুষের আগুনের মতো বোধহয় ধিকি ধিকি জ্বলো। আচ্ছা, তোমার এরকম ডিফিটিস্ট মনোভাব কেন ? কেন বিশ্বাস করতে পারো না, আমরা জয়ী। সমস্ত দুর্নীতি, বিবৃতি, নষ্টামি, ধাষ্টামির ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে জয়ের নিশান হাতে এগিয়ে চলেছি !'

নিশ্বাস ফেলে বিবি বলল—'এখনও পর্যন্ত আপনাদের টোটাল প্ল্যানের কোনও হদিশ পেলুম না। লীডারশিপ সম্পর্কেও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রথমে ভেবেছি—আপনি, আপনিই সব। এখন দেখছি আপনিও শুধু কয়েক গজ দূরত্ব অবধি দেখতে পান। তারপর অন্ধকার।'

অন্তুদা বলল—'হদিশ পাবার দরকার কি ? আরব্যান গেরিলা ওয়রফেয়ারের ভিত্তিই হল গোপনীয়তা।'

বিবি বাধা দিয়ে বলল—'আপনারা কি বই দেখে যুদ্ধ করবেন অন্তুদা। এতো গোপনীয়তা, এ তো বাতিক।'

—'শোনো বিবি, গোপনীয়তা বাতিক নয়। অ্যাবসলিউট নেসেসিটি। যা জানো না, তা কখনও কাউকে বলতেও পারবে না, হাজার প্রেশারেও না।' শিউরে উঠে মুখ তুলল বিবি—'শুধু যদি কিছু সংশপ্তক সেনারই দরকার ছিল তাহলে চিন্তা করবার, প্রশ্ন করবার মন যাদের আছে, তাদের বাছলেন কেন ? চিন্তা শক্তি এবং কল্পনার ব্যবহার হারিয়ে কোনও অদৃশ্য নেতার হাতের পুতুল, হয়ে কাজ করে যাওয়া যে ঈশ্বর আর মানুষের সম্পর্কের চেয়েও অতৃপ্তিকর !' অন্তু একটু চুপ করে রইল, মুখ দেখে বোঝা যায় একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। তারপর বলল—'অল রাইট বিবি, তোমাকে আজ থেকে মুক্তি দিলাম। আর কোনও কাজের ভার তোমাকে দেবো না। শুধু শুধু তোমাকে বড় ভারাক্রান্ত করেছি।'

বিবি দুচোখে কুয়াশা নিয়ে বলল—'মুক্তি দিলেই কি আমি মুক্তি পাবো ? আপনি কি ফিরবেন ?'

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল অন্তুদা, বলল—'আমার সঙ্গে কি মরতে চাও, বিবি ?'

বিবি বলল—'যদি নিয়তি তাই হয় তো তাই-ই।'

অন্তু নিচু গলায় বলল—'আমায় মালগুলো এবার দাও। আমি খেয়ে যেতে পারছি না। রাত্তিরে অ্যাকশন আছে। মাসিমাকে ন্যাচ্যারালি বুঝিয়ে বলবে।'

বিবি উঠে গিয়ে কাপড়ের আলমারি খুলল। তিনটে ভারি প্যাকেট অন্তুর হাতে তুলে দিল, বলল—'এইটে এক নম্বর-জন্মদিনের উপহারটা, এইটে বিয়েবাড়ির দু-নম্বর, আর এইটে তিন নম্বর—অন্নপ্রাশনের। ঠিক আছে তো ?'

প্যাকেট তিনটে একটু টিপে-টুপে দেখে অন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াল—'বিবি ?'

—'কি !'

—'আমার দিকে একবার স্পষ্ট করে তাকাও। যাচ্ছি কিন্তু। রাগ নয়, ভয় নয়, শুধু সাহস আর বিশ্বাস। মনে রেখো, তুমি আমাদের অস্ত্রাগার আর····তুমি লীডারের কথা বলছিলে না ? জেনে রেখো, তোমার জন্য তোমাদের জন্য আমি, শুধু আমিই যথেষ্ট।'

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মা ঘরে ঘরে চৌকাঠে জল দিয়ে শাঁখ বাজালো। কত কালের পুরনো সান্ধ্য অনুষ্ঠান। পাড়হীন সাদা কাপড় কাঁধের ওপর খসে পড়েছে। মুখশ্রী শান্ত। মা সারাজীবন যে দুঃখ ভোগ করেছে তা এ দেশের এ সমাজের সংস্কৃতিরও অন্তর্গত। নিদারুণ শোষণ, নিপীড়নেও মা বিদ্রোহ করেনি, সে কি উপায় ছিল না বলে ? বিদ্রোহ কি উপায়ের প্রতীক্ষা করে ? বিদ্রোহ না করুক, মা প্রতিশোধ নিতে পারত। যে শাশুড়ি মার অল্পবয়সে খাওয়া-পরা, শোয়া-বসা নিয়ে উৎখাত করে দিয়েছেন তিনিই যখন সাত বছর প্যারালিসিস হয়ে শুয়েছিলেন, তাঁকে কিন্তু মা মায়ের মতোই সেবা করেছেন। বাবা মারা যাবার পর দীর্ঘ দুঃসময় গেছে। মা জমা টাকার আয় আর সামান্য বাড়ি ভাড়া থেকে কিভাবে সব চালিয়েছে, ভাবতে গেলে থই পাওয়া যায় না।

—'সন্ধে হল, চুল বাঁধিসনি, মুখ ধুসনি, সেই কোন সকালের কলেজের কাপড় পরে এখনও বসে আছিস ! ওঠ !'

মায়ের কথায় বিবি উঠে দাঁড়াল নিঃশব্দে। ঘরে এতোক্ষণ অন্ধকার ছিল, মা এক্ষুনি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আলনা থেকে কাপড় নিয়ে চলতে চলতে ফিরে দাঁড়াতে হল। অস্থির গলায় মা বলছে—'তোদের সব আজ কি হয়েছে বল তো?'

—'কাদের মা ?'

—'কাদের আবার ? তোর, বাপ্পার, বাচ্চুর ? কি যেন পাকাচ্ছিস একটা !'

—'কি আবার পাকাবো ?'

—'আমি তোর পেটে হইনি বিবি, তুই-ই আমার পেটে হয়েছিস। মনে রাখিস। সব সময়ে ভাববি তুই আমার বড় মেয়ে, বাপ্পা-বাচ্চুর দিদি, তোর অনেক দায়িত্ব। পয়সা-কড়ির দায়িত্ব নিতে বলিনি। তোর আসল দায়িত্বটা ওদের ঠিক পথে রাখবার। বয়সটা খারাপ বিবি। আর একটা কথা। অন্তুর বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। খুবই ভালো ছেলে। কিন্তু বেশি ঘনিষ্ঠতা করো না, বিপদে পড়বে। ঘর-গেরস্থালি করবার ছেলে ও নয়। তোদের অভাবটাই বা কিসের বিবি ?'

বিবি বলল—'কি যে বলছো মা। আচ্ছা মা, তুমি কি মনে করো 'নিজেরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেই আমাদের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় ?

—'কার দায়িত্ব ? কিসের দায়িত্ব ?'—মা অবাক হয়ে বললেন।

—'ধরো সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি !'

—'সে কি কথা রে ! এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন তোদের নিয়েই তো সমাজ ! তোরাই তো দেশ ! তোরা মানুষের মতো মানুষ হলেই তো দেশের প্রতি দায়িত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করা হয়।'

মা সরল মনে কথাটা বলল, খানিকটা বিমূঢ় হয়ে। বিবির বুকের মধ্যে কথাটা বিঁধে রইল। কথাটা তো একরকম সত্যই। মায়ের ওই সরল সত্য কথনের উত্তর অন্তুদা কি দেবে ? বলবে—সত্য ঠিকই, তবে বড় লং-টার্ম সত্য। প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষ আলাদা আলাদা করে সৎ, নিঃস্বার্থ, কর্মবীর এককে পরিণত হবে আর সেই একক জুড়ে জুড়ে তৈরি হবে আদর্শ সমাজ ! এ অন্তত লক্ষ বছরের প্রোগ্রাম। তা-ও অনিশ্চিত। এই সব শোধনবাদের পথ একেবারে ত্যাগ করতে হবে। না হলে ধনতন্ত্র কোনদিন নড়বে না, কোনদিন শেষ হবে না মানুষের হাতে মানুষের শোষণ, কোনদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা মেহনতি মানুষের হাতে আসবে না। ভেঙে ফেলো কাঠামোটা। অকেজো অঙ্গগুলো নির্মমভাবে ছাঁটাই করে ফেলে দাও।'

ঘামে-ভেজা শরীরটার ওপর চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল ঢালতে ঢালতে হঠাৎ বিবির মনে হল কতদিন মুন্নিদির দেখা নেই। মা মুন্নিদিকে জানে বলেই ওর হোস্টেলে রাতটা থাকবার কথা বলে গিয়েছিল মাকে। আসলে ও ছিল আরতিদির বাড়ি। বহু স্লোগান লেখার ছিল। মুন্নিদি মিটিঙ্-এ আসে না, ইউনিভার্সিটিতেও দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ কি ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে

ওকে দীক্ষিত করেছিল মুন্নিদি । চোখ বুজলেই চৌবাচ্চার জল সমুদ্রের চেহারা নেয় । এমন একটা ঢেউয়ে ভেসে চলেছে সে যেখানে সাঁতার কাটা না কাটা সমান । একদম গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই । ফিরে আসারও পথ নেই । বুকের ভেতর অনেক গোপন দলিল । না জেনে-জেনেও অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে । ঢেউ যদি কোন দিন নিজের খেয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যায়, তবেই । তবে কি অনুশোচনা ? ভয় ? না, তা-ও ঠিক নয় । মহৎ কিছু করার উদ্বেল আনন্দটা সব সময় ঘিরে থাকে না । সেই সময়গুলো বড় কঠিন । বুক হিম হয়ে যায়, শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা সাপ নামে, ভয়ের নয়, সংশয়ের ।

বাথরুম থেকেই হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পেলো বিবি । কারা যেন চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল । কোথায় কারা দরজা-জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে । ঝড় অথচ ঝড় নয় । গোলমালটা ওদের বাড়ির দরজার কাছে এসে ঢুকে পড়েছে বলে মনে হল । বিবি ভিজে গায়ের ওপরেই জামা কাপড় কোনরকমে চাপিয়ে বেরিয়ে এলো ।

দালানে মাকে ঘিরে পাড়ার কয়েকটি ছেলে নিতাই, অষ্টা, নীলু, কেশব । মা আতঙ্কিত গলায় বলছেন—'বলছিস কি ?' নিতাই বলল—'ঠিকই বলছি, মাসিমা ।'

বিবি বলল—'কি হয়েছে রে ?'

নীলু বলল—'জীবনবাবু, আমাদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই, ওই যে যাঁর হাত দিয়ে কমপিট করা ছেলে বার হত—খুন হয়েছেন বিবিদি ।'

নিতাই বলল—'আজ সকালে এইচ-এস পরীক্ষায় টোকাটুকি হচ্ছিল তো, সার ধরিয়ে দিয়েছিলেন, শোনেননি ? জীবনবাবু আমাদের পাশের গলিতেই পড়াতে আসছিলেন । তেলিপাড়াটা ভীষণ ঘুপচি অন্ধকার মতো তো ! চার পাঁচটা ছেলে লাফিয়ে পড়েছিল ঘাড়ের ওপর । স্ট্যাব করে করে শেষ করে দিয়েছে । দুটো একটা ঘা হলে বেঁচে যেত স্যার । ছুরি মারছে তো মারছেই । রক্তগঙ্গা হয়ে গেছে চারদিকে । আঁ আঁ করে উঠেছিল একবার । তারপরেই সার মরে কাঠ হয়ে গেছে ।'

অষ্টা পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল । গোমড়া মুখে বলল—'প্রতিক্রিয়াশীল, পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীশত্রু এইরকম ভাবেই শেষ হয় ।'

মা শিউরে উঠে বললেন—'কি বলছিস রে অষ্টা ! ছি ছি ! চুপ কর । জীবনবাবু বুড়ো মানুষ আহা ! বাড়িতে তিনটে আইবুড়ো মেয়ে । ছেলেটা বোধহয় বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে । মরে যাই ।'

স্কুলমাস্টার জীবনধন রক্ষিতের হত্যা দিয়ে শুরু হল কলকাতার পুব, পশ্চিম, উত্তরে বৃহত্তর কলকাতা ও মফঃস্বলে এক নতুন অধ্যায় । ট্র্যাফিক কনস্টেবল হারাধন বারি, পুলিস ইন্‌সপেক্টর রবিন বসু, হেড-মিসট্রেস রুণু ভৌমিক, ছোট ব্যবসাদার মৃগাঙ্ক বসাক, ডাক্তার হরমোহন পাল । হত্যার ধরন এক । পেছন থেকে, অনেক সময়ে বাড়ির সামনে, প্রকাশ্য দিবালোকে চার পাঁচ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাইপগানের গুলি বর্ষণ কিম্বা ছোরা বা দা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত । ধড় থেকে মাথা আলাদা, পেট ফাঁসানো, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে । হত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে লেখা 'চেয়ারম্যান মাও—যুগ যুগ জিও ।' নকশালবাড়ি—লাল সেলাম ।'

কণ্টকিত স্বপ্নের বিছানা

পেছনে স্কুটার রেখে, ঘুরে এসে সামনের পর্চ দিয়ে বাড়ি ঢুকলো অরণ্য । প্যারাপেটের ওপরটা মাধবীলতা আর লতানে জুঁইয়ে ছেয়ে গেছে । বেশ একটা চিকের মতো আড়াল হয়েছে । ও পাশে স্থলপদ্মর গাছটা চোখে পড়ছে না আর । লতাগুলো একটু ছাঁটা দরকার । হিরুকে বলে দিতে হবে । এই জন্যেই বোধহয় কদিন ব্রততী এখানে বসছে না । কদিন বলতে অবশ্য ছুটি-ছাটা আর দীর্ঘ ভেকেশন ছাড়া শনিবারগুলোতেই বোঝায় । অন্যান্য দিন ও-ও তো কলকাতায় স্কুলে চলে যায়, দুজনে একসঙ্গে হেভি ব্রেকফাস্ট করে, ব্রততী নিজের জন্য একটা টিফিন হোক, লাঞ্চ হোক, তৈরি করে নেয় । অরণ্য বাড়ি ফেরে না । অফিস ক্যানটিনে ব্যবস্থা ভালোই । বললে, হাল্কা মশলা ছাড়া রান্না-টান্না করে দেয় । নাহলে বাড়ি ফিরে একলা একলা খেতে বিশ্রী লাগে । নিজের সামান্য খারাপ লাগার কারণে ব্রততীর এই একটু মুক্তির খুশিটা বন্ধও করে দেওয়া যায় না । করতে চাইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবে তা অবশ্য নয় । গুঁইগাঁই করবে । সারাদিন বাড়ি বসে বসে করবেই বা কি ? অরণ্য ওকে বলেছিল—'নার্সারি স্কুলের ওই চাকরিটা না করে বরং রিসার্চ-টিসার্চ একটা ধরো ।'

ব্রততী বলেছিল—'নিজের নামের আগেও একটা ডক্টরেট বসাও তাহলে । আমি পি এইচ ডি করি তারপর তুমি কমপ্লেক্সে ভুগে ভুগে আমার অবস্থা কাহিল করে দাও আর কি !'

ব্রততীর অনুমানটা সত্য নয় । অরণ্য চায়, ব্রততীর একটা খুব সুন্দর, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন হোক । লেখাপড়া করে যদি সেটা সম্ভব হয় তো তাই-ই হোক । পড়াশোনা অবশ্য করে ও । কিন্তু ওরকম লক্ষ্যহীন পড়াশোনায় কি ফল ?

কিছুদিন ধরেই অরণ্য লক্ষ করছে ব্রততীর মুখে একটা কালো মেঘ। এতো চাপা স্বভাব যে, ওর পেটের কথা বার করা শক্ত। যুধিষ্ঠিরের অভিশাপটা অন্তত এ মেয়ের ক্ষেত্রে সত্য হয়নি। অন্যান্য শনিবার অরণ্য দেখতে পায় ও পর্চে প্যারাপেটের ওপর বসে আছে হাল্কা রঙের শাড়ির ওপর লতাপাতার ছোট ছোট ছায়া ফুটিয়ে খোলা চুল। হয় চুপচাপ বসে আছে, নয় কোনও বই-টই হাতে রয়েছে। পর্চটা ব্রততীর খুব প্রিয় জায়গা। সামনে ফ্যাক্টরি যাবার পথ আগাগোড়া গুলঞ্চ, দোলনচাঁপা আর করবীতে মোড়া। ডানদিকে বাইরে যাবার গেটের দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা, মেহেদির বেড়া। বাঁদিকে কলোনির ভেতর দিকে যাবার পথ। এদিকটায় বড় বড় গাছ। সকাল-বিকেল দুপুর কখনও মিঠে কখনও তীব্র সুগন্ধ ভেসে আসে। শুধু ফুলের নয়, গাছেরও শরীরের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। লতার আড়ালে বসে, তিনটে রাস্তার বীথিকা, পাখির ডাক, প্রজাপতিদের আসা-যাওয়া, মানুষের চলাচলের শব্দ উপভোগ করা যায়। নিজেকে দৃশ্য না করলেও চলে। অরণ্যকে দেখে মুখ তুলে হাসে ব্রততী, বইটি মুড়ে ভেতরে চলে যায়। কপালে এমনিতে কখনও টিপ দেয় না ব্রততী। সরু সিঁথিতে সিঁদুর প্রায় না থাকার মতোই। গলায় কিছু পরে না। দুহাতে শুধু দু গাছি চুড়ি। বিয়ের আগেও ওকে এমনি দেখেছিল অরণ্য। ভালো লেগেছিল। আকাশের মতো নিরাভরণ। তাই-ই মেঘ, গোধূলি, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ-ঝলক। পাখিদের উড়ে-যাওয়া, তাই-ই এতো বৈচিত্র্য।

রেজিস্ট্রেশনের দিন ব্রততী এলো, লম্বা একটা বেণী। কানে ছোট্ট নীল পাথর। গলা, হাত সমস্ত খালি। গাঢ় নীল একটা শাড়ি পরণে। দুজনে মিলে একসঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে যাবার কথা, বাকিরা সেখানেই আসবে। অরণ্য ওর সাজপোশাক দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বুঝে নিয়ে ব্রততী বলেছিল—'সালংকারা কন্যা-সম্প্রদান চেয়েছিলেন নাকি ?'

—'সালংকারা প্রয়োজন হলে আমি করে নেবো, কিন্তু আজকের দিনে তোমার একটা লাল শাড়ি-টাড়ি পরা উচিত ছিল।'

—'আমি শাড়িকে পরবো, না শাড়ি আমাকে পরবে, অরণ্যদা। তাছাড়া লাল আমার সহ্য নয় না।'

—'সহ্য হয় না ? তোমার আবার এসব কুসংস্কার আছে নাকি ?'

—'কুসংস্কার-টার নয়। লাল পরলে অ্যালার্জি হয়।'

—কিন্তু তুমি আজও অভিসারিকার সাজ পরে এসেছ যে।'

হেসে ফেলে ব্রততী বলেছিল—'তাতে তো আপনারই সুবিধে। একটা পরকীয়া পরকীয়া গন্ধ থেকে যাচ্ছে।' তারপরই গম্ভীর হয়ে বলেছিল—'কোথাও কোনও আতিশয্য যে আমার ধাতে সয় না, কি করি বলো!'

—'কি আশ্চর্য! সামান্য জিনিস নিয়ে এতো ভাববার কি আছে ? আসলে আমাদের অনেক দিনের অভ্যাস তো। কোনও কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

সেদিন কিন্তু সত্যিই ব্রততীকে লাল শাড়িতে দেখতে ইচ্ছে করেছিল।

কদিন হল ব্রততী প্যারাপেটটায় বসছে না। রাস্তাটা বাড়ির মুখোমুখি বলে অনেক দূর থেকে এই শূন্যতা দেখতে পাওয়া যায়। পর্চের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অরণ্য দেখতে পেলো সদর দরজা খুলে ও একটু পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ঘড়িতে একটা বাজার আওয়াজ পেলো অরণ্য। বলল—'তোমার শরীর ঠিক আছে ?'

—'আমার কি কিছু হয়েছে ?' অবাক হয়ে ব্রততী বলল।

—'ভেতরে বসেছিলে বলে মনে হল—'

—'রোদের তাত ভালো লাগে না—' সংক্ষেপে কথা সেরে ব্রততী দরজা বন্ধ করে দিল।

—'সেনগুপ্তকে আসতে দেখলে নাকি ?'

—'কি আশ্চর্য! আমি কি করে দেখব ?' পেছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল ব্রততী।

হঠাৎ অরণ্যর মনে হল সেনগুপ্তর জন্যই ব্রততী পর্চে বার হচ্ছে না এ সময়। সেনগুপ্ত দম্পতিকে একেবারে পছন্দ করে না ও। ওর পছন্দ অপছন্দগুলো বড় নির্বিচার। কিন্তু এটা ঠিক নয়।

সোফায় বসে জুতো খুলতে খুলতে অরণ্য জিজ্ঞেস করল—'আজ মেনু কি ?'

ব্রততী টেবিল সাজাচ্ছে, বলল—'মাছের ধোঁকা আছে।'

—'আমাকে ধোঁকা খাওয়াচ্ছো না তো ? মাছের ধোঁকা···সোনার পাথরবাটি!' ব্রততী হেসে ফেলে বলল—'আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে, আমার মেজাজ ভালো করবার জন্য ছেলেমানুষি করতে হবে।'

বেসিনের কলে মুখ-হাত ধুতে ধুতে অরণ্য বলল—'আরে, আমিও তো এগজ্যাক্টলি তাই বলি,! একটা বুদ্ধিশুদ্ধিওলা মেয়ে বিনি নোটিসে যখন তখন এরকম গম্ভীর হয়ে যাবে কেন ?'

ব্রততী মিটি মিটি হেসে বলল—'আগে ধোঁকাটা তোমাকে দিই। তারপরে

ঘোল খাওয়াবো, তারও পরে যদি জানতে চাও তো ভেবে দেখা যাবে সব কেনর উত্তর তোমার পাওনা কিনা।'

চেয়ারে বসে অরণ্যর দিকে একটা মোটা তোয়ালে এগিয়ে দিল ব্রততী।

—'প্লীজ, কোলের ওপর রাখো!'

—'কি আশ্চর্য! আমি কি বাচ্চা?'

—'তুমি বাচ্চার বাড়া। সেটা নিজেও জানো। এক ফোঁটা পড়লেও কেলেঙ্কারি হবে। সাদা পরেছো।'

অরণ্য কাঁধ নাচাল। মুখে একটু ধোঁকা ভেঙে দিয়ে বলল—'ইস্‌স্ দারুণ হয়েছে তো? মিষ্টান্ন কিছু করেছো?'

—'ফলের পায়েস।'

—'গ্র্যান্ড। আঙুর দিয়েছো? বাঃ বাঃ, আচ্ছা, ব্রততী, এক কাজ করলে হয় না? ওদের একটু যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায়!'

—'কাদের?'

অরণ্য ওপরের দিকে চোখ তুলল, বলল—'আফটার অল গেস্ট তো!'

—'ওমা! গেস্ট কিসের?' ব্রততী রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল।

—'তুমি এমন এক একটা কথা বলো না!'

—'আমরা আগে থেকে এ বাড়িটায় আছি। ওরা এসেছে পরে। সেই হিসেবে গেস্টই তো! তাছাড়া, আমাদের কাছে ওদের একদিন খাওয়া পাওনা আছে। ব্রততী, ব্রততী ভেবে দ্যাখো, চৌধুরীকে খাইয়েছ, ঘোষালকে খাইয়েছো, রায়দের তো যখন-তখন খাওয়াচ্ছো!'

ব্রততী মনোযোগ দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল—'অত দেনা-পাওনার হিসেব আমি কষতে পারি না গো। ইচ্ছে হয় বোলো। তবে আমার শরীরটা কিছু দিন থেকে খুব, খুব খারাপ যাচ্ছে। স্কুলেও নতুন নতুন দায়িত্ব এসে পড়ছে মাথার ওপর। একটু সময় দিও।'

অরণ্য বলল—'কি আশ্চর্য! আমি কি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছি? এই যে তখন বললে তোমার শরীরে কিছু হয়নি!'

ব্রততী সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—'কিছুক্ষণ আগে পারমিতা সেনগুপ্ত এসেছিল।'

—'তাই নাকি?' অরণ্য চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত গুটিয়ে বসল—'কেন?'

—'ওদের ফ্ল্যাটের একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে রেখে গেল। বলল দুজনেই নাকি ওরা ভীষণ ভুলো। যদি দুটো চাবিই এক সঙ্গে হারায়, তাই। আজ

নাকি কলকাতা যাবে।'

অরণ্য বলল—'এতো ভুলো? আচ্ছা লোক তো!'

ব্রততী গম্ভীর হয়ে বলল—'আমি নিলুম। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।'

—'ভালো লাগা-না লাগার কি আছে? রেখে দাওগে তোমার চাবির ছুকে।

—'বোঝ না তুমি। এটা একটা দায়িত্ব!'

—'আর কিছু বলল?'

—'আলাপ-সালাপ করল সামান্য। একটু কৃত্রিম টানে কথা বললেও মেয়েটি খারাপ না। বলল আবার আসবে।'

—'ব্রততী, তুমি তোমার এই পায়েস আর ধোঁকা একটু পাঠিয়ে দাও প্লীজ।'

—'তুমি বড্ড পাবলিসিটির ভক্ত। পরমার্থদার মতোই। এরকম করো না।'

—'যে প্রোফেশনের যা। মজ্জাগত হয়ে গেছে হয়ত। কিন্তু এটা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল নেবারলি জেসচার।'

—'কাকে দিয়ে পাঠাবো?'

—'বাঃ খাবার আর কাকে দিয়ে পাঠাবে? নিজেই যাবে!'

—'কি করে যাবো। আমি এখন খাচ্ছি না!' ব্রততী দুটো আঙুল চাটতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।

অরণ্য উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল। এ সময়ে, ওপরের কাজ সেরে রামের মা বাড়ি ফেরে। ওকে দেখতে পেয়ে একটা ডাক দিল। রামের মা এলে অরণ্যই ছোট ছোট বাটিতে খাবারগুলো সাজিয়ে দিল একটা ট্রেতে, আর একটা ছোট ট্রে ঢাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল ওপরে।

ব্রততী বলল—'বাসনগুলো ফেলে এসো না।'

রামের মা চলে গেলে অরণ্য বলল—'বাসনগুলো কি তোমার এক্ষুনি দরকার ছিল?'

—'না। কিন্তু রেখে এলে আবার বাসন ভর্তি করে কিছু পাঠাবে-টাঠাবে। এসব ফর্ম্যালিটি আমার ভালো লাগে না।'

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে, জানলার পর্দাটা টেনে দিয়ে পাশেই বসল অরণ্য। ছোট্ট একটু পনের মিনিটের নিদ্রা, তারপর আবার অফিস যেতে হবে। ব্রততী খাবার টেবিলটা পরিষ্কার করছে। সদর দরজাটা খোলাই থাকে এই সময়ে। দরজার কাছে ছায়া পড়ল, দুজনেই মুখ তুলে তাকাল। পারমিতা, পেছনে সুমন্ত সেনগুপ্ত। রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়ে।

সেনগুপ্ত দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল—'অপূর্ব খেলাম মিসেস মুখার্জি,

অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

পারমিতা বলল—'আপনি যা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেখতে এবং খেতে একেবারে টিভির অ্যাড থেকে উঠে এসেছে।'

সেনগুপ্ত বলল—'মিঃ মুখার্জি, আমরা একটু কলকাতা যাচ্ছি। রাতে আমি ফিরব, পারমিতা পার্ক সার্কাসে ওর বাবার কাছে থাকবে। মনে রাখতে চেষ্টা করব, তবু যদি ভুলে যাই, তাই ফ্ল্যাটের চাবিটা রেখে গেলাম। অসুবিধেয় ফেললাম না তো?'

অরণ্য বলল—'কিছুমাত্র না। ডোন্ট ওয়ারি। ঘুরে আসুন।'

পারমিতা বলল—'বলতে খুব খারাপ লাগছে মিসেস মুখার্জি, বাসনগুলো শূন্যই দিয়ে গেলাম। পূর্ণ করে দেবার বিদ্যে আমার নেই। একেবারে আনাড়ি।'

অরণ্য বলল—'ওসব ফর্ম্যালিটির কথা একদম ভাববেন না ব্রততী দিয়ে যাবে, আপনি খেয়ে যাবেন। আমিও অবিকল তাই করি।'

পারমিতা হাসল। ব্রততী রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে, সেদিকে একবার তাকাল। তারপর লুটিয়ে-পড়া শাড়ি সামলাতে সামলাতে চলে গেল। পেছনে সেনগুপ্ত—মন্থর। অন্য কোথাও যেন যাবার ছিল। কিছু বলার ছিল। মনে করতে করতে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে এসে ব্রততী সদর দরজা বন্ধ করে দিল। পর্দাগুলো সব টেনে দিল। ঘরের মধ্যে পর্দার রঙের ছায়া। উল্টো-দিকের সোফাটায় বসল। অরণ্য বলল—'দারুণ অ্যাট্রাকটিভ পার্সন্যালিটি, না?'

ব্রততী জবাব দিল—'হ্যাঁ, মেয়েটি খুব সুন্দর দেখতে।'

অরণ্য বলল—'আমি সেনগুপ্তর কথা বলছি। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব! পারমিতার মতো মেয়ে যে কোনও লেডিজ বিউটি পার্লারের সামনে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। সেই আইসবার্গের কথা জানো তো? আট ভাগ জলের তলায়, একভাগ খালি জেগে থাকে! আচ্ছা, ভদ্রলোকের বোধহয় এক সময়ে চশমা ছিল, না?'

ব্রততী বলল—'আমার জানার কথা নাকি?'

অরণ্য বলল—'নাকের দুপাশে দাগ আছে বেশ। অত বসা দাগ শুধু সান-গ্লাসে হওয়ার কথা নয়। বোধহয় কনট্যাক্ট লেন্স্ পরেন।'

ব্রততী বলল—'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘরে যাচ্ছি। তুমি যাবার সময়ে দরজাটা টেনে দিয়ে যেও। আমাকে জাগিও না।'

অনেক সময় ব্রততী জেগে জেগে ঘুমোয়। চোখ খোলা থাকে, মস্তিষ্ক কোন

কিছুর ছাপ নেয় না। দেখব না, শুনব না, বুঝব না। শুধু নিজের ভেতরে তলিয়ে স্থির হয়ে থাকব। একে জাগ্রত নিদ্রা ছাড়া আর কি বলা যায়? যখন চারপাশের আবহাওয়া প্রতিকূল, কিম্বা অপছন্দের, তখন টুক করে এই নিদ্রার জগতে ডুব দেওয়া ব্রততীর কাছে কিছু না। অভ্যেস আছে। কলকাতায় নিত্য স্কুলে যাবার পথটা এইভাবে জেগে জেগে ঘুমোয় ও। চালের পুঁটলি নিয়ে গাদাগুচ্ছের বুড়ি ওঠে, অল্পবয়সী মেয়েও। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে, দুহাতে উকুনে-মাথা চুলকোয় পাশে বসে, কারও কারও শরীর দিয়ে তীব্র রসুনের গন্ধ, মাঝে মাঝে পুলিস ওঠে—'এ বুড়িয়া, উঠ্।' রুলের গুঁতো মারে। বুড়ির জায়গায় বসে হাতে খইনি ডলতে ডলতে দাঁত বার করে হাসে। দেখবার কিছু নেই, শোনবার কিছু নেই।

কিন্তু এখন ব্রততী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে আছে। চোখ বোজা। সমান তালে দুলছে শরীর। মন্থর আলস্যে মগ্ন দুপুর জাবর কাটছে বাইরে। ঘুমন্ত ব্রততীর মাথার মধ্যেও রোমন্থন। কিছুতেই ডুব দিতে পারছে না। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারছে না। তাই ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলো বাইরের দরজা টেনে দিয়ে অরণ্যর বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। মিনিট খানেক পরে স্কুটারের আওয়াজ। ব্রততীর বন্ধ জানলার পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

মাথার মধ্যে দিয়ে এইভাবে শব্দের বল গড়িয়ে যায়। অর্ধচেতন শরীর কি এক স্নায়বিক বিকারে হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে ওঠে। কানের মধ্যে দিয়ে যেন বোমার পলতে গলিয়ে দিয়েছে কেউ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, তবুও মুখে একফোঁটা শব্দ করতে পারে না, একটু নড়ে নিজের এই স্নায়বিক বিভ্রমকে ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে পারে না। ঘুমোতে ঘুমোতেই শুনছে ব্রততী। বেল বাজছে, আস্তে। মিউজিক্যাল বেল। এক একটা স্পর্শে এক এক রকম সুর মৃদু মায়াময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মাথার ভেতর। প্রচণ্ড ভয়ে বিবশ হয়ে যায় মস্তিষ্ক। তোমরা কে? কেন এমন করে মাথার ভেতরে ভয়াবহ বাজনা বাজাও! কালীপুজোর বলির বাজনা বাজছে, রক্ষাকালীর দংষ্ট্রাকরাল মূর্তি। ঢং ঢং ঢং। ঘড়িতে তিনটে বাজল। শোবার ঘরের জানলায় টোকা।

—'কি ঘুম ঘুমোচ্ছিস রে ব্রততী, শীগগির খুলে দে।'

অনেক কষ্টে উঠে বসতে পারল ব্রততী। ধীরে সুস্থে মুখে চোখে জল দিল, তারপর গিয়ে দরজা খুলল। ফুরফুরে শাড়ির আঁচল দুপুরের হাওয়ায় উড়ছে। মাথার ঘনকুঞ্চিত চুল বয়কাট। সোজা ঘাড়, ডান দিকে একটা লাল তিল। নীলচে চোখে ভয়।

—'কবে থেকে এতো দুপুর-ঘুমোনি হলি ? শরীর ঠিক আছে তো ?'

—'বেঠিক থাকলে চলে ?'

—'রাগ করেছিস আমার ওপর ?'

—'তোমার ওপর রাগ করা যায় ? তুমি সম্রাজ্ঞী। তোমার মর্জিমতো তুমি চলবে, চালাবে। নাই বা হল দিনের বিশ্রাম, রাতের ঘুম ! নাই বা হল সাঁঝের খেয়ায় ঘরে ফেরা...'

"রাত্রি মোর শান্তি মোর রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।"

তীব্র জ্বালাময় আবেগের সঙ্গে বলে থামল ব্রততী। জয়ন্তী রায়ের মুখ দেখে মনে হল কেঁদে ফেলবেন !

—'ভেতরে ঢুকতে বলবি না ?'

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ব্রততী।

জয়ন্তী ভেতরে ঢুকে ওর চিবুকে হাত ছুঁইয়ে বললেন—'অমন করে আমাকে লজ্জা দিবি ? দুঃখ দিবি ? ব্রততী, আমি কি কোনদিন তোর দিদির মতো কিছু করতে পারিনি ? তোকে কি শুধু খাটিয়েইছি ? প্রাণভরা ভালোবাসা, আশ্রয়, নিরাপত্তা, আনন্দ, শান্তি কিছুরই উপলক্ষ্য হতে পারিনি। এইট্টি ওয়ানে যখন আবার দেখা হল ? ভাবতে পেরেছিলুম আবার দেখা হবে ? কিন্তু হল তো ! এগুলো সব আমাদের ভাগ্যের নির্দেশ। এই দ্যাখ, তোর মুখার্জির জন্যে কেমন ফন-কালারের সোয়েটার বুনছি।' ঝোলা থেকে জয়ন্তী রায় আধ-হওয়া সোয়েটারের খানিকটা অংশ বার করে দেখালেন। খুব কাঙালের মত চেয়ে বললেন—'ব্রততী, আমি তোর বন্ধু, তোর দিদি, বুঝিস না কেন কিছুতেই !'

—'কি দরকার এসব কথার ?' ব্রততী আড়ষ্ট স্বরে জবাব দিল।

—'দরকার আছে বলেই তো বলছি ! আমার ওপর বিশ্বাস রাখ্।'

ব্রততী একটু চুপ করে রইল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'চা-টা কিছু করে নিয়ে আসি, ঘুমটা ছাড়ছে না।'

জয়ন্তী হাসি-হাসি মুখে ঝোলার ভেতর থেকে একটা ফ্লাস্ক বার করলেন—'তোর অপেক্ষায় আমি আছি নাকি ? তোর পরমার্থদাকে দিলুম, আমাদেরটা ফ্লাস্ককে ভরে নিলুম। যা, শুধু দুটো পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে আয়।'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে জয়ন্তী বললেন—'সৌম্য শীর্ষকে আসতে বলিস

না কেন রে ?'

—'ওরা আসবে না'—ব্রততী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল।

—'আসবে, আসবে। আমার নাম করে ডেকে পাঠা। দিন সাতেক থেকে যাক।'

—'তুমি কি এই কথাই বলতে এসেছিলে ?'

—'আমি কি আসি না ? যখন তখনই তো আসি।'

—'আজ এই কথাই বলতে এসেছ।'

—'ধর তাই। ওদের তুই কালই লিখে দে, কিম্বা একটা ফোন কর।'

—'অত তাড়া কিসের ? তাছাড়া, ফোনে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।'

—'কেমন মনে হচ্ছে তাড়া করা দরকার। খুব তাড়া। পৃথিবীটা যখন গোল তখন সব শুরুর শেষ যেখানে, সেখান থেকেই আবার শুরুও, তাই না ?'

দরজার বাজনা আবার বাজল। ব্রততী চমকে তাকাল। জয়ন্তী বললেন—'যে-ই হোক না কেন, তোর এতো ফ্যাকাশে হয়ে যাবার কি আছে ? তুই কেন ভয় পাস ? কোনও বাজে লোক এমন অসময়ে তোর কাছে আসতে সাহস করবে না। দাঁড়া, আমি খুলছি।'

ব্রততী যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। দরজার কাছ থেকে চাঁছা-ছোলা গলা ভেসে এলো—'এখান দিয়েই তো ফ্যাক্টরি ফিরি-রোজ, ভাবলাম একবার দেখেই যাই, মুখার্জিসাহেবের গিন্নিকে। একলা থাকেন। দেখ্-ভাল তো করা দরকার। তা স্বয়ং স্বামিনী উপস্থিত বুঝতে পারিনি।'

মার্কেটিং ম্যানেজার চৌধুরী। নিচু গলায় দুজনে অনেকক্ষণ ধরে কিসব বলছেন, ব্রততী শুনতে পেল না। শেষে অধৈর্য হয়ে খাট থেকে নামল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ওকে দেখেই চৌধুরী বলল—'ব্রততী বাঁচাও। আমাকে বাঘিনীতে খেয়ে ফেললে।'

ব্রততী ফিকে হাসল, বলল—'খাওয়াই উচিত।'

জয়ন্তী বললেন—'ইয়ার্কি পেয়েছো, না ? দুপুর বেলায় মুখার্জি বাড়ি নেই, এখন তুমি ব্রততীর সঙ্গে আড্ডা দেবে, কাজ ফেলে ? আর এই ছোট্ট কুয়োর মতো কলোনি, লোকে যা-তা বলবে !' জয়ন্তী চড় মারার ভঙ্গিতে হাতটা তুললেন।

চৌধুরী বলল —'ভদ্রমহিলার অপযশ করবার কোনও বদুদ্দেশ্য আমার ছিল না। বিশ্বাস করুন ইয়োর হাইনেস ! আমার খালি কদিন মনে হচ্ছে ব্রততীদের মাথাটা ভর্তি হয়ে গেছে। কোন ভাগ্যবান এই দেবদুর্লভ ফ্ল্যাটবাড়িটি পেলেন জানবার জন্যেই ব্রততীর কাছে ছুটে আসা।

—'কে আবার পাবে ? চীফ এঞ্জিনিয়ারের জন্য তৈরি হয়েছিল, তিনিই পেয়েছেন;— জয়ন্তী মারমুখী এখনও।

—'চীফ এঞ্জিনিয়ারের জন্যই তৈরি ? এক্কেবারে এক্সক্লুসিভ ? কোন মতেই মার্কেটিং ম্যানেজারের হতে পারে না ?'

জয়ন্তী রায় আবার চড় তুললেন—'তুমি সেই দরের মানুষ ? ফাজিল কোথাকার ! পরমার্থ রায় তোমার মতো ফাজিল ব্যাচেলরকে যা দিয়েছে খুব দিয়েছে !'

—'আরে বাবা, আজ ব্যাচেলর বলেই কি আর চিরটাকাল ব্যাচেলর থাকব ?'

—'তোমার গলায় ঘুঁটের মালা ছাড়া আর কিচ্ছু জুটবে না, বুঝলে ? সে গুড়ে বালি।'

চৌধুরী বলল—'তাই ভাবি যেন আমার বিয়ে-সাদির ফুলটি ফুটব ফুটব করেও ফুটছে না কিছুতেই। এখান থেকে একজন যে ক্রমাগত ভাঙচি দিয়ে যাচ্ছে এতদিনে বোঝা গেল। তা চীফ এঞ্জিনিয়ারকে সেদিন দূর থেকে দেখলাম। চেহারাপত্তর বেশ ভালো। প্রসপারাস-লুকিং। নামটা কি সুমন্ত সেনগুপ্ত ? ঠিক শুনেছি ?'

জয়ন্তী বললেন 'তুমি আবার ভুল শুনবে ? ঠিকই শুনেছো। ও ফ্ল্যাট সেনগুপ্ত ছেড়ে দিলেও তুমি পাচ্ছো না। পরমার্থ রায় নিজে নিয়ে নেবে সে ক্ষেত্রে। বুঝলে ?'

চৌধুরী দুহাতে একটা হতাশার ভঙ্গি করে বলল—'চলি তাহলে, ব্রততী।'

জয়ন্তী নিজের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন—'চলি রে, ছেলেদের আসবার সময় হল। না দেখতে পেলে তুলকালাম করবে। তুই ঘুমোগে যা। তোকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। একটা ভালো দেখে টনিক খা তো ! রোজ এই লম্বা ট্রেন-জার্নি ! সহ্য হয় না কি ? সময় কাটানোটা যদি প্রবলেম হয় তো আমার কফি-ক্লাব কি দোষ করল ?'

দু সেকেন্ড উত্তরের অপেক্ষা করে চলে গেলেন ম্যানেজার-গৃহিণী।

পাড়ার এই বাড়িটাই সবচেয়ে ভব্যিযুক্ত। কোণের বাড়ি। তিন দিকেই খোলা রাস্তা। বাইরের চেয়েও ভেতরটা বেশি ফিটফাট। ফোন-টোন করতে হলে এ বাড়িতেই আসতে হয় পাড়ার বেশির ভাগ লোককে। বাড়িটা অপূর্ব মিত্তিরের। ভদ্রলোকের কেরিয়ার অদ্ভুত। পঁয়তাল্লিশ সালে যুদ্ধবন্দীদের বিচার হয় সিঙ্গাপুরে। সেখানে উনি স্টেনো হিসেবে গিয়েছিলেন। এক শিল্পপতির চোখে পড়ে যান সেখানেই। তখন উনি নেহাতই বাচ্চা ছেলে। সিঙ্গাপুরে কিছুদিন চাকরি করার পর ধাপে ধাপে ম্যানেজমেন্টের নানারকম পরীক্ষা দিতে দিতে কলকাতার কাছাকাছি এক নামকরা বিদেশি কম্প্যানিতে ছিলেন। রীতিমত উঁচু পদে। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দেন। অপূর্বদার সঙ্গে বাপ্পাদের সম্পর্ক খুব ভালো। ওরা ভাইবোনেরা লেখা পড়ায় ভালো বলে অপূর্বদার কাছে ওদের খুব খাতির। বাবা মারা যাবার পরও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন উনি। বাপ্পার দাদার এখনকার চাকরিটাও বলতে গেলে ওঁর প্রভাবেই হয়েছে।

আজ অপূর্বদা সাত সকালে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন বাপ্পা বুঝতে পারল না। বাড়ির দরজা খুলে দিল খুদে চাকর ভজু। বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল। ভজুকে দিয়েই ডেকে পাঠিয়েছিলেন অপূর্বদা। দিনটা রবিবার। রবিবার বলেই অনেক অতিরিক্ত কাজ থাকে। সারা সপ্তাহের পড়াশোনার গাফিলতি পুসিয়ে নিতে হয় একদিনে। পরীক্ষার সিসটেমের ওপর সেই পুরনো রাগটা থেকে গেলেও, সিলেবাসের সম্পর্কে ঝালটা মরে এসেছে বাপ্পার। ওদের কলেজের ল্যাবরেটরি খুব ভালো। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সময়ে আহার-নিদ্রা ভুলে যাবার অবস্থা হয় তার। কিন্তু পড়তেও হয় পর্বত প্রমাণ। সেগুলো রবিবার অনেক রাত পর্যন্ত করে। তাছাড়াও সংসারের কিছু কাজ থাকে। দাদা বেচারা সকাল দুপুর চাকরি, সন্ধেয় টুইশনি—আর কত করবে ? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অন্দরমহলের দরজার কাছে গিয়ে বাপ্পা হাঁক দিল একটা, 'অপূর্বদা !' কেমন মনে হল অনেকেই আশপাশ থেকে, পর্দা-টর্দার পেছন থেকে, বন্ধ দরজার ফাঁক-টাঁক দিয়ে তাকে লক্ষ করছে। ভেতরের কোথাও থেকে চেঁচিয়ে সাড়া দিলেন অপূর্বদা—'তাড়া আছে ? তো ওপরে উঠে এসো !' সিঁড়ির বাঁ দিকে অপূর্বদার মায়ের ঘর, ঘরের পর্দাটা সরিয়ে উনি কিরকম করে যেন তাকালেন বাপ্পার দিকে, ভজু সঙ্গে সঙ্গে ওপরে গেল।

অপূর্বদার ঘরে পা দিয়ে একটু অবাক হয়ে গেল বাপ্পা। ঘরটা অপূর্বদার

একার। প্রায় অফিসঘরের মতো সাজানো। ঘরে যেন একটা পারিবারিক কনফারেন্স বসেছে। বউদি বসে আছেন একটা চেয়ারে, ছোট ছেলে বউদির হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড়টি আর একটা চেয়ারে বসে। মনে হল, বউদি কোন কারণে ওদের বসিয়ে রেখেছেন। অপূর্বদা দাড়ি কামাচ্ছেন। দেয়ালের ব্র্যাকেটের আয়নায় তাঁর আধকামানো মুখের ছায়া পড়েছে। অপূর্বদার মা এসে ঢুকলেন। বাপ্পাকে দেখে বউদির মুখ শক্ত হয়ে গেল। জোর করে একটু সহজভাব আনবার চেষ্টা করে অপূর্বদা বললেন—'বাপ্পাকে একটু চা-টা খাওয়াও!'

বাপ্পা বলল—'না, না। চা খাবো না। খেয়ে এসেছি। ব্যাপার কি বলুন তো?'

অপূর্বদা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'তোমরা খেলাধুলো করোগে যাও। তুমিও যাও আলো। বাপ্পা না খায়, আমিই একটু চা খাবো।' মা, তুমি কি বসেই থাকবে!'

—'হ্যাঁ'—জ্যাঠাইমা কেমন শুকনো গলায় বললেন। বউদি ছেলেদের নিয়ে বাইরে যেতে অপূর্বদা চেঁচিয়ে বললেন, —'ওরা যেন কোনমতেই বাড়ির বাইরে না যায়, ভজুকে দেখতে বলো!'

গালের শেভিং ক্রিম-টিম মুছে, রেজরটা ধুতে ধুতে অপূর্বদা বললেন—'দাঁড়িয়ে কেন? বসো বাপ্পা, কথা আছে।'

—'বলুন'—বাপ্পা অনুভব করছিল কোথাও কিছু একটা বিশ্রী রকমের গণ্ডগোল হয়েছে।

—'তোমার মনে আছে বাপ্পা, গণেশ বলে আমাদের যে কাজকর্মের লোকটি ছিল, তাকে আমার ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়েছিলুম?'

—'মনে আছে বইকি! নদীয়া জেলার লোক ছিল। খুব পরিষ্কার, মার্জিত কথাবার্তা, গণেশ তো এখন এক্সপার্ট হয়ে গেছে শুনতে পাই।'

—'এক্সপার্ট অনেক রকমে হয়েছে ভাই। আমার বিরুদ্ধে আমার ওয়ার্কারদেরই খেপাচ্ছে। আমি নাকি শোষক। ওদের মজুরি কম দিই। রক্তচোষা বাদুড়। এখন গো-স্লো যাচ্ছে, এরপর একেবারে স্ট্রাইক। প্রোডাকশন নেই। নতুন অর্ডার তো নিতে পারছিই না, পুরনো যেগুলো পড়ে আছে শ্রীলঙ্কার, হংকং-এর সেগুলোও সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারবো কিনা সন্দেহ। অথচ আমার কাঁচামাল সব স্টক করা রয়েছে, বসিয়ে বসিয়ে মাইনেও দিতে হচ্ছে সবাইকে।'

—'তাই নাকি?"

—'হ্যাঁ ঠিক তাই। এই তো অবস্থা। তা তুমিও কি আমাকে শোষক, ভ্যাম্পায়ার, শ্রেণীশত্রু ইত্যাদি মনে করো?'

ছোটখাটো উজ্জ্বল চেহারার মানুষটি। মাথায় ঘন কালো চুল ব্যাক ব্রাশ করা। ধীর স্থির। চলনে বলনে একটু সাহেবি ধরন। অপূর্বদার বাদামি চোখের মণি বাপ্পার মুখের ওপর একেবারে অনড় অচল। চোখের পাতা পড়ছে না।

বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে বলল—'আমাকে একথা জিজ্ঞেস করছেন অপূর্বদা?'

বাপ্পার কথা যেন শুনতে পাননি এমন ভাবে অপূর্ব মিত্র বলতে লাগলেন —'তোমরা খানিকটা দেখতে পাও, যেমন দেখো আমার একটা নতুন অ্যামবাসাডর গাড়ি আছে। ফ্যাক্টরির ম্যাটাডর-ভ্যানটাও মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করি। একজন ড্রাইভারও রেখেছি সর্বক্ষণের। দেখো বোধহয় আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে দোকান থেকে চুল-টুল বেঁধে আসেন, আমার সঙ্গে পার্টিতে-টার্টিতে যান। ছেলে দুটিকে মিশনারি স্কুলে দিয়েছি, এদিকের স্কুলগুলোর থেকে এক্সপেনসিভ। আর কতটা দেখতে পাও, জানি না। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার আছে, যেগুলো একেবারেই দেখতে পাবার কথা নয়, কাজেই জানোও না। সেগুলো তোমাকে জানিয়ে রাখি। আমি ছিলুম একটা বিদেশি কম্প্যানিতে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঠিক পরেই আমার স্থান প্রশাসনের ব্যাপারে। যে কারণেই হোক, নরওয়েজিয়ান কোল্যাবোরেটর ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেল, যাবার সময়ে শেয়ার ট্রান্সফার হল সব মারোয়াড়িদের হাতে। মারোয়াড়ি মালিকরা অমন চালু কম্প্যানিটাকে নিয়ে কি করবে তক্ষুনি বুঝতে পারি। ছিবড়ে করে দিয়ে চলে যাবে। সিক-ইনডাস্ট্রির দলে নাম লেখাবে কম্প্যানি। আমি চাকরি ছেড়ে শুধুমাত্র আমার পি এফ এবং তোমার বউদির সোনার গয়না বেচে নিজের ব্যবসা আরম্ভ করি। প্রিন্টিং ইঙ্কের নো-হাউ আমার ছিল। মার্কেটে গুড উইল ছিল, চলছিল খুব ভালোই। মোট সত্তরজন কর্মী আমার কম্প্যানিতে। কেমিস্ট, সুপারভাইজার, ম্যানেজার সব নিয়ে। ওয়ার্কারদের জন্য আমি চীপ ক্যানটিনের ব্যবস্থা করেছি, মেডিক্যাল ফ্রি, নিজের এবং পরিবারের। তাছাড়াও প্রতিমাসে ওয়ার্কারদের মেডিক্যাল চেক-আপ হয়। অসন্তোষের কোনও কারণই ছিল না। তারপর কিভাবে জানি না এক শ্রেণীর বিপ্লবীর ধারণা হল, আমি শোষক। গণেশকে তারা এই ধারণার প্রচারক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র ঠাওরালো। কারণটা কি বলো তো? গণেশ আমার কাছে সবচেয়ে উপকৃত ব্যক্তি। নদীয়াতে এরই মধ্যে ওর জমিজমা হয়েছে বেশ। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়েটা পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছি।'

বাপ্পা কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছিল না। এইবার বলল—'অপূর্বদা, আপনি এতো কথা কেন বলছেন ? এসব প্রশ্ন উঠছে কেন ?'

অপূর্বদা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলেন, বললেন—'রোববার সকালে অযথা নিজের গুণগান করবার জন্য আমি তোমায় ডাকিনি বাপ্পা। কারণটা কি তুমি সত্যিই বুঝতে পারছো না ?'

বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে বলল—'আমার কি বুঝতে পারবার কথা ? না কি বলুন তো !'

অপূর্বদা ডাকলেন—'আলো !' বউদি বোধহয় কাছকাছি কোথাও ছিলেন এসে দাঁড়ালেন। মুখটা থমথম করছে। বাপ্পার দিকে একবারও তাকালেন না। অপূর্বদা বললেন—'কাগজটা দাও।' বউদি ভেতরে চলে গেলেন, এক মিনিট পরেই একটা খাম নিয়ে ফিরে এলেন। খামের মধ্যে থেকে একটা কাগজ বার করে অপূর্বদা বাপ্পার দিকে এগিয়ে দিলেন। বাপ্পা অবাক হয়ে দেখল—অবিকল ওরই হাতের লেখা একটা হুমকি চিঠি। পাঁচদিনের মধ্যে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা চাই। অন্যথায় অপূর্ব মিত্তিরের মাথা তাঁর স্ত্রী ও মার কাছে পৌঁছে যাবে ষষ্ঠ দিন। নিচে লেখা—'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।'

বাপ্পা স্তম্ভিত হয়ে বলল—'বিশ্বাস করুন অপূর্বদা এ আমার লেখা নয়।'

—'হাতের লেখাটা তোমার। তুমি একসময় নন্দিতাকে পড়াতে, আমি ওর পড়াশোনায় ইনটারেস্ট নিতাম। লেখাটা আমার চেনা।'

—'তা হোক। এটা জাল।'

—'তলায় যে রাজনৈতিক দলের স্লোগান রয়েছে তুমি তার অ্যাকটিভ মেম্বার বাপ্পা।'

—'আপনি কি করে জানলেন ?'

—'এসব কথা কি চাপা থাকে বাপ্পামাস্টার ? তোমরা সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য এইভাবে টাকা যোগাড় করছো। তোমাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। সবই বুঝলাম। মিথ্যা হুমকি, চুরি, জালিয়াতি, খুনোখুনির মধ্যে দিয়ে তোমরা কি অ্যাচীভ করতে চাইছো আমার জানা নেই বাপ্পা। আমার খুব সন্দেহ তোমাদেরও জানা নেই। বিপ্লব কি রকম জানো ? কোটি-কোটি লোক দিনের পর দিন একদম না খেতে পেয়ে, মর্মান্তিক দুর্দশায় যখন সহ্যশক্তির শেষ প্রান্তে চলে আসে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনীর গোলার ওপর। পার্ল বাকের 'গুড আর্থ'-এ এইরকম একটা বিপ্লবের কথা পড়েছিলাম। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনও এমনি এমনি হয়নি।'

জ্যাঠাইমা এইসময়ে বলে উঠলেন—'তুই অত কথা ওকে বলছিস কেন খোকা ও ওসব তোর চেয়ে অনেক ভালো জানে।'

অপূর্বদা বললেন—'হ্যাঁ আমার বোধহয় এসব বলা ঠিক হচ্ছে না। মার্কসিজমের আমি কিই বা জানি ! কমনসেন্স থেকে বলছি। এদেশে ইনডাস্ট্রির বয়স কত বাপ্পা ? আর এই স্প্যোরাডিক বিপ্লবে কতকগুলো নির্দোষ লোকের প্রাণ যাওয়া ছাড়া আর কি হচ্ছে ? শ্রেণিশত্রু বলে যাদের মারছো তারা তো স্মল-টাইমার, একটা গদীতেও হাত দিতে পেরেছো কি ? ভেজাল আর কালো টাকাই যাদের ব্যবসার মূলধন, তাদের টাচ করবার সাহস কই তোমার কমরেডদের ?'

বউদি এই সময়ে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি বললেন—'থামবে তুমি ? থামবে ? মা-ওকে থামতে বলুন না।'

অপূর্বদা বললেন—'যাই হোক। অনেস্টলি বাপ্পা আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ মানি। সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ? ব্যবসায় টাকা সব সময়ে রোল করে জানবে। আই অ্যাম এ সেল্‌ফ্‌-মেড ম্যান। এরকম অনেক সময়ে হয় যে ঠিকমতো পেমেন্ট আসেনি বলে আমাকে সংসারের খরচা কার্টেল করতে হয়েছে। যা ইনকাম-ট্যাক্স হয়, পাই পয়সা মিটিয়ে দিই। আমার পক্ষে এই ডিমান্ড মীট করা আদৌ সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও আমি দিতাম না। যার পেছনে কোনও যুক্তি, কোনও হৃদয় নেই, আমি তাতে নেই।'

বউদি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন—'বাপ্পা, দাদার কথা শুনলে তো ! আমার সোনার গয়নাগুলো পর্যন্ত ফ্যাক্টরির জন্য বিক্রি হয়ে গেছে। নইলে আমি টাকাটা দেবার চেষ্টা করতাম। তুমি একটু বোঝো, ওদের বোঝাও।'

বাপ্পা তখন অপূর্বদার কথা শুনছিল না। বউদির কথাও না। খালি ভাবছিল কিভাবে ব্যাপারটা ঘটল। বলল—'কিভাবে টাকাটা ওদের দিতে হবে। স্পষ্ট করে বলছে না তো !'

—'পাঁচদিন সময় দিয়েছে। তারপর কিভাবে নেবে ওরাই জানে। আমাকে টাকাটা রেডি রাখতে হবে এই আর কি ! এখন প্রাণে বাঁচবার জন্য আমি একটিমাত্র কাজই করতে পারি, সেটা এই বসত বাড়িটা বিক্রি করা। কিন্তু তা আমি করব কেন ? আর পাঁচদিনের মধ্যে পারবই বা কেন ? বাপ্পা সী রীজন !'

বাপ্পা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—'অপূর্বদা, এ লেখা আমার না। আবারও বলছি। আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। বউদি নার্ভাস হবেন না। একটা না একটা উপায় আমি বার করবই।'

পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে দ্রুত সিঁড়ি নেমে এলো বাপ্পা। চট করে একবার চার দিকে দেখে নিল ধারে কাছে কে আছে। কেউ না। কোন দিকে চলেছে সশস্ত্র আন্দোলন! বড় বড় ব্যবসাদার যারা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে, জাল-জুয়াচুরি যাদের হাতের পাঁচ, ওয়ার্কারদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে, পার্মানেন্ট কাজ পর্যন্ত দেয় না, তাদের কারও কাছে এই জাতীয় হুমকি গেছে বলে তো জানা নেই? এ জাতীয় হুমকি চিঠি আজ পর্যন্ত বাপ্পা নিজে কখনও লেখেনি। অথচ হাতের লেখা অবিকল তার। কাজটা কে করল? খুব কাছের মানুষদেরই সন্দেহ হয়। দিদি? না কি বাচ্চু? বাচ্চুটা নকল করতে ওস্তাদ। বেশ কিছুদিন হল অজ্ঞাতবাস করছে। মাকে বলে গেছে বিষ্টুপুরে গিয়ে কিছুদিন থাকবে পড়াশোনার জন্য। কলেজে ক্লাস হয় না। অন্য সবাই তাই জানে। বাচ্চুই কি? কিছুক্ষণ এইভাবে চিন্তা করবার পর হঠাৎ শিউরে উঠল বাপ্পা। কি ভয়ানক! এইভাবে চললে তো শেষ পর্যন্ত কেউই আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না! সত্যি কথাও কেউ কাউকে বলবে না।

অন্তুদাও আন্ডারগ্রাউন্ডে। ওর নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে। কারো সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। পাইকপাড়ায় ইন্দ্রদার বাড়ি চলে গেল বাপ্পা। দরজা খুলে দিয়ে ইন্দ্রদার মা ওর আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিতে জরিপ করলেন। তারপর ঈষৎ কর্কশ গলায় বললেন—'আর কেউ নেই তো?'

বাপ্পা বলল—'না। ইন্দ্রদা আছে তো? আমি তাহলে ওপরে যাই? আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

ইন্দ্রদার ঘরটা ছাদের ওপর। ঘরে ঢুকে বাপ্পা দেখল ইন্দ্রদা মাথা সুদ্ধু চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। বাপ্পা গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠে বসল। একমুখ দাড়ি। চোখ কোটরে বসে গেছে। কিরকম অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রদা। ওর দৃষ্টি দেখে মাসিমার তীব্র চাহনিটার কথা মনে পড়ে গেল বাপ্পার। এইসব মায়েরা গোড়ায় গোড়ায় ওদের ওপর খুব খুশি ছিলেন। খবরের কাগজে ওদের সম্পর্কে বেরোত—'দা ফ্লাওয়ার্স অফ বেঙ্গল', 'ক্রিম অফ দা বেঙ্গলি সোসাইটি,' মায়েদের বুক গর্বে ভরে উঠত। ছেলেরা জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে দেশে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা আনবার জন্য ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে লাল-আতঙ্ক মাসিমাদের মুখের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

—'কি হয়েছে তোমার?' বাপ্পা জিজ্ঞেস করল।

—'তুই কোত্থেকে আসছিস?' জবাবে ইন্দ্রদা বলল।

—'বাড়ি থেকে আসছি। আবার কোথা থেকে?'

—'আমি জিজ্ঞেস করছি কার কাছ থেকে? মানে কে তোকে পাঠিয়েছে?' বাপ্পা বলল—'কে আবার পাঠাবে?'

ইন্দ্রদার হাত বালিশের তলায়, বলল—'মেদিনীপুর থেকে ফিরেছি আজ সকালে, কারুর জানবার কথা নয়। মাসখানেক একেবারে ঠিকানাহীন ছিলুম। তুই কি করে জানলি?'

—'না জেনেই এসেছি ইন্দ্রদা। একটা বিষয়ে তোমার পরামর্শ দরকার।'

—'কোনও বিষয়ে কারুর পরামর্শ চাসনি—' বলে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ইন্দ্রদা।

—'ইন্দ্রদা শোনো। আমার বড্ড দরকার!' ইন্দ্র শুনবে না, তবু বাপ্পা জোর করে অপূর্বদার ব্যাপারটা ওকে শোনাল।

—'নো কমেন্ট'—ইন্দ্রদা বলল।

—'মানে?'

—'ইন্দ্রদা আস্তে আস্তে বলল—'জানি না, কোনও শপথের দাম আর আমাদের কাছে আছে কিনা, তবু তোর কাছে যা সবচেয়ে পবিত্র তার নাম করে বল তুই আমায় মারতে আসিসনি?'

বাপ্পা স্তম্ভিত হয়ে গেল।—'বলছো কি ইন্দ্রদা?'

ইন্দ্র নিচু গলায় বলল—'বিশ্বর বন্ধু নির্মল, আরও দু তিনটে ছেলে ওকে ডেকে নিয়ে গেল সিনেমায় যাবে বলে। ফেরার পথে পেছিয়ে পড়ল, সাইকেলের চেন দিয়ে পেছন থেকে ওকে খুন করল। ব্যাপারটা তুই জানিস না?'

—'পুলিশের চর সন্দেহে চতুর্দিকে এরকম খুনোখুনি হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি, এ ধরনের নির্মম খুন কার নির্দেশে হচ্ছে, জানি না। কিন্তু বাচ্চুর নামে শপথ করে বলছি ইন্দ্রদা, অপূর্বদাকে শাসানি-চিঠিও যেমন আমি লিখিনি, তেমনি তোমাকে মারতেও আমি আসিনি। এরকম নির্দেশ পালন করার আগে আমি নিজে মরব ইন্দ্রদা!'

গা থেকে চাদরটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ইন্দ্র বলল—'বাপ্পা, ব্যাপার বড় ভয়ানক। আমাদের হাত থেকে লুম্পেন এলিমেন্টদের হাতে চলে যাচ্ছে বিপ্লব। শুনছি, তাতে না কি নেতাদের পুরোপুরি সায় আছে। ওঁরা নাকি কোনদিনই আমাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি। বলছেন মিডলক্লাস ইন্টেলিজেন্সিয়া বেশিদিন বিপ্লবের আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না। শোধনবাদের পথে চলে যায়। তাদের রোখ নেই, দুঃসাহস নেই, আমাদের ওঁরা বলেন 'ইডিওলোগ'।

সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই অ্যান্টি-সোশ্যালদের চালনা করবার লোক খুব সম্ভব নেই। ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সব। শ্রেণিশত্রু বলে এখন ওরা যার যার ওপর রাগ আছে তাকে তাকে খুন করছে, নকশাল নামের শিখণ্ডীর আড়াল থেকে। মার্কস-এর, লেনিনের এমন কি মাওয়ের কোনও তত্ত্বই এই লুম্পেনরা জানে না, বোঝে না, নেতারা সেটা জানেন। খোলাখুলি খুনজখম, লুঠতরাজের সুযোগ পেলে গুণ্ডারা কখনও ছেড়ে দেয়! উন্মাদ, এরা বদ্ধ উন্মাদ! বেলেঘাটাতে নাবিক বলে যে লোকটাকে ওরা খুন করল একটা পেটি ব্যবসাদার ছিল লোকটা, বরাবর মস্তানদের তোলা দিত। ইদানীং নকশাল নাম নিয়ে সেই সেম গ্রুপ তোলা নিচ্ছিল। টাকার অঙ্কটা এবার বোধহয় বেশি চড়ে যায়। দিতে পারেনি। ব্যাস। তাইতেই সে শ্রেণিশত্রু, তাইতেই খুন! বারাসত, ব্যারাকপুর, বেলঘরিয়া—সর্বত্র তাই। এসব আমাদের কাজ তো নয়ই। আমার এ সন্দেহও হচ্ছে, কিছু কিছু রাজনৈতিক দলও নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে নকশাল নামের আড়ালে যথেচ্ছাচার করে যাচ্ছে। আমাদের মুখে কালি লেপার কাজটাও এক ঢিলেই হয়ে যাচ্ছে।'

বাপ্পা বলল—'এভাবে পিছিয়ে গেলেই চলবে ইন্দ্রদা? আমরা শুরু করেছিলুম, বিপ্লবের মোরাল ঠিক রাখার কাজে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে, দরকার নেই কাউকে জিজ্ঞেস করে, নিজেই যা করার করব।'

ইন্দ্র বলল—'সাবধান বাপ্পা। সাবধান। কোনও গলি-টলি দিয়ে হাঁটবি না। আমি গিয়ে বেরোতে বললেও বেরোবি না। আমার পেছনে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে কেউ হয়ত তোকে শেষ করে দিতে বলবে। আমাদের সঙ্গে আর কে আছে বল তো? কিষাণরা আপাতত আর আমাদের সঙ্গে নেই। শহরে মজদুরদের সঙ্গে আমাদের কোনদিনই কোনও যোগাযোগ হল না। তাহলে রয়েছে কে? রয়েছে কয়েকজন ক্ষুদিরাম, কানাইলাল আর দলে দলে ভাড়াটে গুণ্ডা।'

বাপ্পা উঠে পড়ল। বিভ্রান্ত হয়েছিল মন। ইন্দ্রদার কাছে আসার পর একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে।

বুধবার অর্থাৎ তৃতীয় দিন সকাল সাতটায় অপূর্ব মিত্রর মা নাতিদের নিয়ে স্কুলে পৌঁছতে গেলেন, অপূর্বদার অ্যামবাসাডার-এ। আলোবউদিও সঙ্গে রয়েছেন, হাতে বাজারের ব্যাগ, প্লাস্টিকের ঝুড়ি। অদৃশ্য কতকগুলো চোখ যেন পাহারা দিচ্ছে বাড়িটাকে। হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এসে বাড়ি ঢুকলেন। অপূর্ব মিত্র তখন অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পায়জামা পরা। খালি গা।

কথা কইতে কইতে হাতে রেজর নিয়েই এলেন অপূর্ব, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। একগালে কামানো তখনও বাকি, অপূর্ব বললেন—বলেন কি? কোন হাসপাতালে দিয়েছেন?

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—'চিত্তরঞ্জন। এক্সরে রিপোর্টটা পেলেই অপারেশন শুরু হবে। সম্ভব হলে আজই।'

—'অপারেশনের কন্ডিশন আছে তো?'

—'আমরা লে-ম্যান আর কি বুঝব। ডাক্তার বলছে ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার।'

মোড়ের মাথা পর্যন্ত ওষুধ, ডাক্তার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, 'ও' গ্রুপের রক্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন আলোচনা করতে করতে এগোলেন দুজনে। অপূর্ব মিত্তির বাড়ির হাওয়াই চপ্পল পরেই বেরিয়ে পড়েছেন। কপাল কুঁচকে আছে দুশ্চিন্তায় একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন—'যায়গা সর্দারজী?'

—'কিধর?'

—'ভবানীপুর। চিত্তরঞ্জন হসপিট্যাল।'

—'আইয়ে'—বড় করে দরজা খুলে ধরল সর্দারজীর অ্যাসিস্ট্যান্ট।

—'চলি তাহলে'—ভদ্রলোক উঠে পড়লেন—'তুমি সময় করে একবার....' পায়জামা-পরা অপূর্ব মিত্তির বিদ্যুদ্বেগে উঠে পড়লেন। ট্যাক্সি দমকলের মতো লাগাতার হর্ন বাজাতে বাজাতে মুহূর্তে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে পড়ল। একটু পরে পেছনে পরপর দুটো বোম ফাটল। কিন্তু অপূর্ব মিত্তিরের ট্যাক্সি তখন অনেক দূর। অনেক রাত্তিরে অপূর্ব মিত্রের খোলা বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এলো বাপ্পা।

এতদিনে একটা কাজ করা গেল যেটাকে তৃপ্তিকর বলা চলে। কিছুদিন আগে ইলেকশনের তিন সপ্তাহ আগে হেমন্ত বসুকে হত্যা করা হল। ফরোয়ার্ড ব্লকের হেমন্তবাবু এ অঞ্চলের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা। ঠিক ইলেকশনের আগে তাঁকে কারা হত্যা করল এ নিয়ে জনান্তিকে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। সি পি আই এম-কে দোষ দেয় কেউ, কেউ নকশালপন্থীদের। কিন্তু যারাই হোক, বাপ্পাদের সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই। এটাই সবচেয়ে ভয়ের কথা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলে কিছু থাকবে না? অজস্র আলাদা আলাদা দল, নিজের নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে? কাজটা মানুষের প্রাণ নেওয়ার মতো সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও? কনস্টেবল নাকি পুলিসি অত্যাচার আর দুর্নীতির প্রতীক, ডাক্তাররা মানুষের রোগ নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে, একজন ডাক্তার সে

দফায় দফায় ফি বাড়িয়ে যাক না যাক, সেও ডাক্তারি লোভের প্রতীক ; কিন্তু প্রতীক বলে কি হত্যা চলে ? প্রতীকী হত্যা !

বিবি বাড়ি ফিরছে। ট্রাম-স্টপে নামতেই কাঁধে হাত পড়ল।

—'বিবিদি এখন বাড়ি যেও না।'

—'কেন রে সনু ?'

—'আমাদের বাড়ি এসো, বলছি।'

—'তেমন কিছু যদি কারণ থাকে তো আমাকে যেতেই হবে।'

সনুর হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল বিবি। বুকের ভেতরটা দুরদুর করছে। কেউ জানে না, শুধু সে আর বাপ্পা জানে, বাচ্চু ফেরার, ওর মাথার ওপর খাঁড়া। ও কি ধরা পড়ল ? ওকে কি শেষ করে দিল ? শ্যামপুকুর স্ট্রীটের প্রত্যেকটি বাড়ির সদর এবং জানলা বন্ধ। মনে হয় পাড়া থেকে সব্বাই অন্য কোথাও চলে গেছে। দূর থেকেই শিবমন্দিরটার কাছে প্রচুর পুলিস দেখতে পেল বিবি। পুলিস কর্ডন করে শিবমন্দিরের সামনেটা ঘিরে রেখেছে। বিবি আর একটু এগোতেই দুজন কনস্টেবল বাধা দিল।

—'আমার বাড়ি এই পাড়ায়। বাড়ি যাবো।'

তৎক্ষণাৎ একজন ইন্সপেক্টর এগিয়ে এলেন—'কত নম্বরে থাকেন ?'

—'পাঁচ নম্বর—'

—'কি নাম আপনার ?'

ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে পুলিস কর্ডন ফাঁক হয়ে গেল। শিবমন্দিরের সামনে রক্তের পুকুর। একটা মৃতদেহ। মাথাটা ক্ষতবিক্ষত। তবু চেনা যায়। দাদা। আজ সকালে বিবির নিজের হাতে কাচা যে চেক-শার্টটা পরে বেরিয়েছিল, সেটাই এখনও পরণে। ছাই-ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট। এই প্রথম টেরিলিনের প্যান্ট করাতে পেরেছিল দাদা।

ইন্সপেক্টরটি ধরেছিলেন বিবিকে।

—'দেখুন, ভালো করে দেখে নিন। এই হল আপনাদের আন্দোলনের আসল চেহারা। দেখেছি আমারই হাতে হয়ত নিহত ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ; জীবনানন্দ পড়েছেন নিশ্চয়ই', চিবিয়ে চিবিয়ে কথা শেষ করলেন ইন্সপেক্টর। নিজেই ধরে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন, বিবির চলবার ক্ষমতা ছিল না। বাচ্চুর কোনও খবর নেই। অন্তুদা উধাও। বাপ্পা বাড়ি নেই। শূন্য বাড়ির কলঘরে বুকফাটা কান্না কাঁদছিল মা। শোনবার কেউ ছিল না, সান্ত্বনা

দেবারও না। সব বাড়ির জানলা-দরজা আটকাঠ বন্ধ।

দাদা বাড়ি ফিরছিল অফিসের পর ট্যুইশনি সেরে ! শিবমন্দিরের চাতাল থেকে কারা ডেকেছিল ? পরিচিত না হলে দাদা তো দাঁড়াত না ? পাইপগানের জন্য খুব শর্ট রেঞ্জ চাই। কারা ? কে ? আশপাশের লোকে কি আর কিছু বুঝতে পারেনি ? কিন্তু মুখে কুলুপ, চোখে কালো চশমা, কানে তুলো।

বাপ্পা পায়চারি করছিল উন্মত্তের মতো। দু চোখ লাল।

—'ওরা কারা দিদি ? কারা ? অপূর্বদাকে ধরতে না পেরে ওরা আমার দাদাকে শেষ করে দিল ? এ তো নোংরা খুনোখুনি। দিদি, ওরা কি পাঞ্জাবি ড্রাইভারের পাশে বসা আমাকে চিনতে পেরেছিল ? দিদি, দিদি, কে লিখেছিল অপূর্বদাকে শাসানো চিঠিটা ? অবিকল আমারই হাতের লেখা !'

বিবি ক্ষীণকণ্ঠে বলল—'বাপ্পা, তুই কি আমাকে সন্দেহ করছিস ? করাই স্বাভাবিক। আমরা তিন ভাই বোন তিনরকম কাজে লেগেছি। কারুর কথা কাউকে বলা বারণ। কিন্তু আমিও চিঠি লিখিনি। বিশ্বাস কর। ও চিঠির কথা আমি জানতুম না। অপূর্বদাকে বাঁচাতে তোর ভূমিকার কথাও না। এখন এইমাত্র জানছি।'

বাপ্পা বলল—দিদি, দিদি, আমরা এখন কি করব ?

—'যেমন করে হোক বেরিয়ে আসতে হবে, এ বাড়িটা বিক্রি হয় কিনা খোঁজখবর নে। অনেক দূর চলে যাবো। অন্যভাবে বাঁচব।'

বাপ্পা বিষণ্ণ, কঠিন, হতাশ গলায় বলল—'উই আর ইন ব্লাড স্টেপড্ ইন সো ফার দ্যাট, শুড উই ওয়েড নো মোর, রিটারনিং ওয়্যার অ্যাজ টিডিয়াস অ্যাজ গো ওভার। দিদি। বাচ্চুকে না নিয়ে আমরা কি করে ফিরব ?'

—'বাচ্চুকে আমি ফেরাবই। মায়ের কোলে ফিরিয়ে দোবই। যে কোনও মূল্যে।' বিবি দুহাতে মুখ ঢাকল।

ইতিহাসের এক ভীষণ চিল চিৎকার

শেষ দুপুর থেকেই সব থমথম করছে। আকাশের চোখ লাল। গুমোটটা হঠাৎ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। বিবি আজকাল মাকে ছেড়ে বড় একটা বেরোচ্ছে না। পরীক্ষা এসে গেছে। তৈরি হচ্ছে চুপচাপ। দালানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পড়তে পড়তে ও মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। আজ প্রচণ্ড দুর্যোগ আসবে মনে হচ্ছে। কাছে যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব দিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রদার কাছে। ইন্দ্রদা যা বোঝে করবে, দরজার কড়া নড়ল না ? খুট খুট করে কে যেন কড়াটা

নাড়ছে ! পড়তে পড়তে বিকেল হয়ে গেছে কখন। আকাশের মেঘের জন্যে অকালসন্ধ্যা নেমেছে। বিবির হঠাৎ কিরকম ভয়-ভয় করল। পরক্ষণেই তার মুখে কঠিন হাসি ফুটে উঠল। তার আর ভয় করলে চলে ? তাদের জন্যে, তার জন্যে নির্দোষ নিরীহ দাদাকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে না ? হঠাৎ মনে হল যদি বাচ্চু হয় ? নিঃশব্দে নিচে গিয়ে দরজার খিলটা নামিয়ে রাখল বিবি, হাওয়ায় আপনা থেকেই ফাঁক হয়ে গেল দরজা। অন্ধকারে বেঁটেমতো একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢুকল না। বলল—'আপনি বিবিদি ? ইন্দ্রদা খবর পাঠিয়েছে পুরনো ঠিকানায় অনেকদিনের ফেরার একজন আসছে। আপনার যা করণীয়, করবেন।'

বিবি বলল—'কে ?'

—'জানি না।' তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে চলে গেল ছেলেটি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল বিবি। ফাঁদ নয় তো ? পুলিশ এখন গুণ্ডাদের সাহায্যে ধরছে ওদের। যে গুণ্ডারা নকশাল নামের আড়ালে যথেচ্ছ খুন করে গেছে তারাই এখন ওদের ধরতে এগিয়ে আসছে। পাড়ায় পাড়ায় প্রচণ্ড দলীয় মারামারি, খুনোখুনি। বাপ্পা থাকলে ভালো হত। পরামর্শ করার কেউ নেই। মাকেও একা রেখে যেতে হবে। দাদা মারা যাবার পর মা কেমন হয়ে গেছে। সংসারের কাজ-কর্ম বেশির ভাগ বিবিকেই করতে হয়, মা শুয়ে-বসে থেকেও কি এক ভেতরের আগুনে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন।

বিবি টিফিন ক্যারিয়ারে রাত্রের জন্য তৈরি রুটি, তরকারি, চাটনি ভরে নিল। টিফিন ক্যারিয়ারটা একটা ঝোলার মধ্যে। মায়ের ঘরে চৌকাঠের ওপর একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়াল। তারপর মনস্থির করে বলল—'মা, আমি একটু বেরোচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

মা ব্যাকুল হয়ে উঠে বসলেন—'বিবি, ও বিবি, কোথায় যাবি ? ঝড় আসছে মা, দিনকাল ভালো নয়, কোথাও যেও না।'

ছলছলে চোখে বিবি গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল—'মা, আজ বোধহয় বাচ্চুর খবর পাবো। তাই যাচ্ছি।'

—'বাচ্চু ? তুই নিয়ে আসবি তাকে ? বিবি ?'

—'নিয়ে আসতে পারব কিনা জানি না মা। তবে খবর পাবো। তুমি আমার জন্য ভেবো না। সাবধানে থেকো।'

দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে মা বলল—'ভাবব না কি মা ! সোমত্ত মেয়ে, সন্ধেবেলায় ঝড়ের মুখে বেরোচ্ছ ? নারায়ণ, নারায়ণ।'

বিবি মাকে বলতে পারল না, বাচ্চুর নামে অনেকগুলো পুলিস ওয়ারেন্ট আছে। তাকে আনা সম্ভব নয়। কতদিন, কে জানে হয়ত চিরদিনই তাকে পালিয়ে থাকতে হবে। বাপ্পাকে পরিস্থিতি জানিয়ে গেলে ভালো হত। কিন্তু সময় নেই।

ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করল বিবি প্রথমটায়। ওদিকে কেউ যাবে না। খানিকটা বাস, খানিকটা রিকশা, খানিকটা হাঁটাপথে যখন নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছলো, তখন ঝড় এসে গেছে। ঝড়ের প্রচণ্ড মত্ত হাওয়াই তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল বাড়িটার মধ্যে। ঠিকানা বহুদিনের চেনা। মুক্তাঞ্চল বলে এটাকে ওরা। এখানে কমরেডরা মোটামুটি নিরাপদ। আশপাশের লোকেরা তাদের গতিবিধির কথা জানলেও বড় একটা বলে দেয় না। এ বাড়িটা তালাবন্ধ থাকে এখন। বাড়ির মালিক চাকরি করেন দিল্লিতে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভদ্রলোকের মা বেঁচে ছিলেন। তিনি সে সময়ে আশ্রয় দিয়েছেন অনেককে। কেন কে জানে অকৃত্রিম দরদ আর সহানুভূতি ছিল ভদ্রমহিলার ওদের ওপর। খুব সম্ভব বৃদ্ধা বাংলার টেররিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অল্প বয়সে। উনি মারা যাওয়াতে বাড়িটা তালা বন্ধ পড়ে থাকে। সদরে তালা, খিড়কির দরজার খিল বাইরে থেকে লোহার তার দিয়ে খুলে যাতায়াতের ব্যবস্থা সহজ করা হয়েছে। সরু মাটির গলি পার হয়ে দরজার ভেতরে এসে বিবি দেখল—ইন্দ্রদা, নিরঞ্জন, পৃথ্বীশ, জিতু। ওদের মুখে চাপা উত্তেজনা।

বিবি বলল—'ইন্দ্রদা তুমি ?'

—'কুইক ভেতরে যাও।' ইন্দ্রদা বলল, তারপর নিচুগলায় যোগ করল—'বন্ধু-বান্ধবদের ফেলে কোথায় যাবো বিবি ? আমাদের মুক্তি নেই। যাও শীগগিরই।'

ইদানীং ইন্দ্রদা একটু একটু করে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া আগের মতোই করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এই এলাকায় ইন্দ্রদাকে দেখে বিবি অবাক হয়েছিল খুব।

টিফিন-ক্যারিয়ারটা ঝোলার মধ্যে, ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ও সরু প্যাসেজ দিয়ে ডানদিকের ঘরে ঢুকল। জানলাগুলো বন্ধ। আলো জ্বালবার উপায় নেই। মেঝেতে একটা মোমবাতি বসানো। ধুলো ভর্তি মেঝেতে একটা মাদুর, তার ওপর শুয়ে আছে বাচ্চু। পেছন ফিরে। খুব রোগা হয়ে গেছে। মাথা ভর্তি বড় বড় চুল, বাতির আলোয় আর বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। বিবি ঝোলাটা আস্তে মেঝেতে রাখল। নিচু গলায় ডাকল—'বাচ্চু।'

শব্দে ও মুখ ফেরাল। বাচ্চু নয়। অন্তদা।

বিবি এতো চমকে গিয়েছিল যে ওর হাতে-ধরা টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। বলল—'তুমি! তুমি কোথা থেকে এলে?'

গত ন মাস ধরে অন্তদা একেবারে বেপাত্তা। বাচ্চুও প্রায় তাই। কেমন একটা ধারণা ছিল যেখানে আছে দুজনে একসঙ্গে আছে। অন্তদাকে চেনা যায় না। মুখময় জঙ্গল। চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে, ঘাড়ের কাছে কুঁকড়ে পাকিয়ে আছে চুলগুলো। ফর্সা রঙ কালি-ঢালা। পরিষ্কার প্যান্ট-শার্ট পরণে, কিন্তু সেগুলো নিশ্চয়ই নিজের নয়। জামাটা অতিরিক্ত ঢলঢল করছে, প্যান্টটা খাটো। টিফিনবাটির ঢাকনা খুলে বিবি এগিয়ে ধরল, ফিসফিস করে বলল—'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও অন্তদা। আমাকে অনেকটা পথ ফিরতে হবে। বাচ্চুর খবর কিছু জানো?'

—'বাচ্চু ঠিক আছে।'

—'অন্তদা ইদানীংকার খুনগুলো কি তোমরা করেছ?'

অন্তদা চমকে উঠল।

—'কেন জিজ্ঞেস করছ, বিবি?'

—'শ্রেণিশত্রু বলতে যে ছবি চোখের সামনে ভাসে—যে হাসি, চালচলন, কাজকর্ম, চরিত্র—তা এদের কারো নেই। আমার হিসেব কিছুতেই মিলছে না অন্তদা। প্রশ্ন করার স্বাধীনতা আমি বরাবর ব্যবহার করে এসেছি, করে যাবো। উত্তর দাও আর নাই দাও।'

অন্তদা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল—'কোনটা আমাদের তালিকার, আর কোনটা তার বাইরের এখন আমিও বলতে পারব না বিবি। অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে।'

বিবি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল—'এবার আমায় মাপ করতে হবে অন্তদা। আমি আর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারব না। সংশয়ী বলে যদি হত্যা করো, তাতেও রাজি আছি। পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে দিও। তারপর ছিন্নভিন্ন করে ফেলো....'

অন্তদার মুখে খাবার আটকে গেছে। মুখটা ব্যথায় নীল। বলল— 'আমাকে ফেলে চলে যাবে বিবি? সত্যি? এই তুমিই না আমার নিয়তি ভাগ করে নিতে চেয়েছিলে একদিন?'

—'চেয়েছিলুম। সেই তুমি আর এই তুমি এক নয় অন্তদা। আমিও পাল্টে গেছি। অভিজ্ঞতার হাতে সিদ্ধান্তের এই বিবর্তনকে আমি মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি

অন্তদা। আই উড নো লংগার অ্যাক্ট এগেনস্ট মাই কনভিকশনস্। কারো জন্যেই না।'

—'বিশ্বাস করো বিবি, সৌরর হত্যা একটা রাজনৈতিক চাল। আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা সবচেয়ে মূল্যবান সদস্যদের চোখে। শহুরে লুম্পেনকে ঢুকতে দিয়ে সমস্ত বিপ্লবের চেহারা এরা পাল্টে দিয়েছে। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবকে প্রাণপণ চেষ্টা করেও মেলাতে পারছি না আর আমিও।'

—'তাহলে বেরিয়ে এসো। বাচ্চুকেও বার করে আনো।'

নীল শিরা ওঠা তামাটে হাতটা অন্তদা বিবির হাতে রাখল। হাতটা গরম, ভারি, ঈষৎ কাঁপছে। বলল—'অনেকগুলো ওয়ারেন্ট ঝুলছে আমার মাথার ওপর। কিছুদিন অপেক্ষা করো। ওরা আমাকে ধরবেই। তারপরে যেও।'

বিবির কোলের ওপর টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে। বলল—'তোমার কি ফেরার কোনও পথ নেই!'

—'না। বাচ্চুর কথা ভেবো না। আমার প্রাণের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান ওর প্রাণ। গচ্ছিত রেখে এসেছি এমন জায়গায় যেখানে ওকে কেউ খুঁজে পাবে না। একদিন এই ঝড় থেমে যাবে। বর্ষণ শেষ হবে। তখন, সেই শান্তির দিনে পুলিস ওর কথা ভুলে যাবে। ও আস্তে আস্তে তোমাদের বৃত্তে ফিরে আসবে। আবার তোমাদের পৃথিবী আহ্নিকগতিতে ঘুরবে, বিবি। ভেবো না। আমি ছাড়া ওর ঠিকানা কেউ জানে না। কেউ না। সে ঠিকানা আমার প্রাণভোমরার কৌটোয় বন্ধ।'

বিবি বলল—'অন্তদা, আমি এবার যাই।'

—'একটু দাঁড়াও বিবি, একটু। কতদিন পরে দেখা। আবার কখনও দেখা হবে কিনা তাও জানি না। খুব সম্ভব হবে না। খাবারগুলো বাচ্চুর কথা মনে করে এনেছিলে, না?

বিবি মুখ নিচু করে বলল—'যদি তাই-ই হয়। তুমি যোদ্ধা, তোমার হাতে শ্রেণিশত্রুর রক্ত। ভাবালুতা, অভিমান এসব কি তোমাকে মানায়?'

—'নাথিং ইজ ইমপসিব্‌ল্ ইন লাভ, বিবি।'

মহাবরষার রাঙা জল ভেতরে, বাইরে। দু কূল ছাপিয়ে ঢেউ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত কাছাকাছি। আগুনের হলকার বদলে জল। চোখে জল। ব্যথায় নীল, আড়ষ্ট মুখ, দু চোখে অপার মমতা—বিবির কপালে, গালে নিঃশব্দ চুম্বন ঝরে পড়তে লাগল। শীতের শুরুতে পাতাঝরা গাছের বনে পাতারা যেমন ঝরে।

দরজায় মৃদু টোকা। ইন্দ্র মুখ বাড়িয়ে উত্তেজিত গলায় বলল—'পুলিসে সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেলেছে। অন্তুদা, বিবি—যে যার মতো পালাও। আমাদের হাতে অ্যামিউনিশন বেশি নেই', ইন্দ্রর মুখ সরে গেল।

খিড়কির দরজা দিয়ে অন্ধকার গলি। পাশের পাঁচিলের ভাঙা ইঁটের ওপর পা রেখে রেখে অন্তু উঠে গেল। পেছন পেছন টেনে তুলল বিবিকে। ঝুপ করে পড়ল ও পাশের উঠোনে। অনেকগুলো দরজা যেন শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। উঠোন পার হয়ে গৃহস্থ বাড়িতে ওঠবার রোয়াক। রোয়াকে মাজা বাসন উপুড় করা। অন্তু ছুটে গেল। বন্ধ দরজাগুলো ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সদরের উল্টোদিকের দরজাটার দিকে দৌড়লো অন্তু। বিবির হাত ছাড়ছে না একবারও। খুব সরু গলি, একজনের বেশি পাশাপাশি যাওয়া যায় না। মেথরের গলি-টলি হবে। দেয়াল ধরে ধরে পায়ে কাদা মেখে পাশের বিল্ডিংটাতে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল চোখ অন্ধ-করা তুমুল বৃষ্টি।

চারদিকে চারটে পিলার। কিন্তু মাথায় চাল নেই। জায়গাটা খোলা একটা ইয়ার্ডের মতো। চতুর্দিকে ভাঙা লোহা-লক্কড় ছড়িয়ে আছে। খুব কাছ থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল একটানা। বন্দুক নয়, বোধহয় স্টেনগান। রাস্তার আলোয় কেউ টিপ করে কিছু ছুঁড়লো। অমানিশির অন্ধকারে ডুবে গেল সব। উপর্যুপরি বোম পড়ার শব্দ।

অন্তু বলল—'আমাদের অনেকেই তো এখানে আজকাল বসবাস করছে। আজ সব শেষ হয়ে যাবে।'

ইয়ার্ডের এখানে ওখানে টর্চের আলো পড়ছে। যন্ত্রের মতো দুজনে গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে উঠে এলো রাস্তায়। চারদিকে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। অন্ধকারে ঝমাঝম বৃষ্টি বাজছে মাদলের মতো। দেয়াল ঘেঁসে এগোতে এগোতে একটা গলি মুখ। নিস্তব্ধ। এদিকটায় এখনও কেউ আসেনি। একটা দোকানের শাটার অনেকটা ফেলা। তলা দিয়ে আলো আসছে। খোলা জায়গাটা দিয়ে শরীর গলিয়ে দিয়েছে দুজনে। ঝুপ ঝুপ করে শব্দ হল। নিচু গ্যারাজ-ট্যারাজের মধ্যে দোকানটা। স্টেশনারি দোকান। অন্তর হাতে রিভলভার। মাঝবয়সী ভদ্রলোক যেন একটা লিস্ট মেলাচ্ছিলেন। আওয়াজে পেছন ফিরেই স্থানু হয়ে গেলেন। রিভলভারটা আড়াল করে বিবি সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—'পেছনে পুলিস তাড়া করে আসছে, কিভাবে মারবে আমাদের বুঝতে পারছেন?'

ভদ্রলোকের মুখ থেকে ভয়ের ভাবটা আস্তে আস্তে চলে গেল।

বললেন—'আমি শাটার ফেলে দিয়ে যাচ্ছি মা, শেষরাতে সব চলে গেলে একবার এসে তুলে দেবো, নির্বিঘ্নে চলে যাবেন।'

অন্তু চাপা গলায় বলল—'এখনই আলো নিভিয়ে শাটার ফেলে দিন। আপনাকেও থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

ভদ্রলোক বললেন—'আমাকে আপনাদের বিশ্বাস করতেই হবে। আমি না ফিরলে বাড়ি থেকে তো আমার খোঁজ করতে দোকানে লোক আসবেই। তখন?'

বিবি বলল—'আপনার সঙ্গে তাহলে আমিও বেরিয়ে যাই।'

অন্তু ওর হাত ধরে বলল—'না বিবি, তা হয় না। তোমাকে ওরা আর কিছু না হোক, বাচ্চুর বোন বলে চেনে, দেখামাত্র গুলি করবে।'

বিবি আকুল হয়ে বলল—'বাড়ি না ফিরলে আমার মা ভয়ে হার্টফেল করবে। আমাকে যেতেই হবে অন্তুদা। যেমন করে হোক, যত রিস্ক নিয়েই হোক।'

কানফাটা শব্দ করে বাজ পড়ল। তারপর বোম ফাটার বিকট আওয়াজ। ভদ্রলোক বললেন—'দুর্গা শ্রীহরি, মা, আপনাকে আমার সঙ্গে দেখলে আমাকেও ছেড়ে কথা বলবে না পুলিস। দয়া করে আমাকে এবার ছেড়ে দিন। আর কথা বাড়ালে আপনারা ধরা পড়ে যাবেন। এসব পথে পা বাড়াবার আগেই বাপ-মায়ের কথা চিন্তা করে নিতে হয় মা।'

গড়গড় করে সামনের শাটার পড়ে গেল। কূপকূপে অন্ধকার। উঁচুতে দেয়ালে দু চারটে ঘুলঘুলি থেকে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো অক্সিজেনটুকু শুধু আসছে। প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে বাইরে। ভারি বুটের শব্দ দৌড়তে দৌড়তে যাতায়াত করছে। বুকফাটা চিৎকার কার—'মা-মা-বাঁচাও।' গোঙানি। নিষ্ঠুর আঘাতের প্রতিক্রিয়ার গোঙানি। একবার থামে, একবার উচ্চকিত হয়। মাথার ওপরকার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তোলপাড় চলল। চেয়ার টেবিল সব দুমদাম করে উল্টে ফেলা হচ্ছে, মনে হল। অন্ধকারে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ। দুটো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ।

বেশ কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে থেমে গেল গোলমালের আওয়াজ। গুলির শব্দ দূর থেকে বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর পর ভেসে আসছে। বোমার শব্দ আর নেই। ওদের যা কিছু ছিল ফুরিয়ে গেছে। শেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করছে। অসম লড়াই। শেষ পর্যন্ত সেই প্রথম চিৎকার'মা, মা, মা।'

বৃষ্টি চলেছে একটানা। দোকানঘরের মধ্যে অন্ধকার। মাতৃগর্ভের মতো তরল, আঠাল অন্ধকার। বহমান সমুদ্রস্রোতের মতো। ভারি, দম বন্ধ-করা। না

অন্তুদা না···বিবি তোমার কাছে জীবনের কাছে এই আমার শেষ ভিক্ষা। এ হয় না, এ হতে নেই····আমি আর পারছি না···। এ জীবনে আর ভালোবাসার সুযোগ পাবো না কোনদিন না, একবার ভেবে দ্যাখো কী ভীষণ শূন্যতা চারদিকে। বিবি এই শূন্যতা আমায় গ্রাস করে নেবার আগে আমাকে বাঁচতে দাও, একবার, জন্মের শোধ একবার। সারারাত ধরে চলে দামাল বৃষ্টির হুঙ্কার। ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন ধাতুর গায়ে। প্রচণ্ড শব্দে। তারপর আবার ফিরে যায়। কখনও মৃদু কান্নায়। কখনও চাপা গোঙানিতে, কখনও আবার তীব্র, অনিচ্ছুক শীৎকারে বৃষ্টির আর ঝড়ের মাতন চলতে থাকে। সারা রাত। সারাটা রাত।

দুশ আড়াইশ সশস্ত্র পুলিস সেদিন চিরুনি আঁচড়ানোর মতো করে আঁচড়ে ফেলল বরানগর। কে উগ্রপন্থী কে নয়, বিচার করল না। মা বাবার চোখের সামনে গুলি করল ছেলেকে। গঙ্গায় ছুঁড়ে-ফেলা মৃত গলিত শবদেহ দু তিন দিন পর ভেসে ওঠে।

ঠিক তিন মাসের মাথায় অন্তুদার গ্রেপ্তারের খবর কাগজে পড়ল বিবি। আর তার ঠিক চতুর্থ দিনে পুলিস হানা দিল ওদের পাঁচ নম্বর বাড়িতে।

পুলিস ভ্যানে অচৈতন্য কয়েকটি তরুণীর শরীর। জীবিত না মৃত ? রক্তমাখা ছেঁড়া কাপড় জড়ানো। তলায় নগ্ন। ঘাড়ে, বুকের ওপর, পেটে, গোপন অঙ্গে জ্বলন্ত সিগারেটের, চুরুটের ছ্যাঁকার দগদগে ঘা। কয়েকদিন হাসপাতাল। চেতনা ফিরলেই আবার লালবাজার।

দু হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। টান মেরে শাড়ি খুলে ফেলে দিল। চারদিকে এত পুরুষ, এত পুরুষ কেন ? লুঠেরার মতো খলখল করে হাসছে। চোখের মণির ওপর তীব্র আলোর ঝলক। দৃষ্টি অন্ধ। তর্জনীর নখের মধ্যে ছুঁচ ঢুকে যাচ্ছে। হা-হা-হা-হা করে উন্মাদের মতো হাসছে কে ? তীব্র গর্জন পরক্ষণেই—

—'কি হল ? অগ্নিকন্যা ? জবাব নেই কেন ? হাসিটা কার চিনতে পারলে ? পারলে না ? নিজের ভাইয়ের গলা নিজেই চিনতে পারছো না ? তোমার ফায়ার ব্র্যান্ড ছোট ভাই ? কি করে পারবে ? হাসিটা যে আমাদের কানেই স্বাভাবিক লাগছে না···ধরা পড়ে থেকে এমনি করে হেসে যাচ্ছে।'

—'যে লিস্টগুলো দিয়েছি ঠিকানা মনে পড়ল ? নাম বল্। ঠিকানা বল্। বলবি না ? জানিস না ? ফের মিথ্যে কথা ?'

—'কি রে নকশালী ? ডাক্তার যে বলছে গাভীন ! পেটে পেটে এতো ? কলির কেষ্ট রাধা সব ? আন্দোলন হচ্ছে। আন্দোলন ! বিপ্লব পয়দা করবি না কি ?

পেটের ওপর বুটের লাথি সশব্দে ফেটে পড়ল।

রক্ত ! রক্ত ! রক্ত ! লাল অন্ধকার। লাল আতঙ্ক। সাদা আতঙ্ক। অসংখ্য নরবলি। ছিন্নমস্তার পুজো। অসংখ্য শিশু বলিপ্রদত্ত হচ্ছে। রক্তমাখা খাঁড়া ঊর্ধ্বে তুলে নাচছে কাপালিক। ডাকাতে কালীর পুরোহিত।—আর রক্ত নিবি মা ? রক্ত চাই ? আর রক্ত চাই ? অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

অগ্নিকোণ

কোনও কোনও রাতে কারও কারও চোখে ঘুম নামতেই চায় না। আবার কারও কারও চোখ জুড়ে নিবিড়, নিতল, নিঃস্বপন ঘুম। দেয়াল ঘড়িতে একটার পর একটা ঘণ্টা কাটার শব্দ, একটানা ঝিঁঝির খত্তাল, ফাঁকা জায়গা পেয়ে উন্মত্ত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। দোহারকি দিচ্ছে কি একটা রাতচরা পাখি কু-কু-কুক্ কু-কু-কুক্। জানলার ফাঁক দিয়ে দমকা হাওয়ার সঙ্গে হঠাৎ নাম-না-জানা গাছালির উৎকট উগ্র গন্ধ। জানোয়ারের গায়ের গন্ধের মতো। সারারাত ছটফট করেছে ব্রততী। শেষ রাতে যেই পাতলা ঘুম নেমেছে অমনি শুরু হল ভয় দেখানো স্বপ্নদের আনাগোনা। মাঝবয়সী একজন আঁটসাঁট মোটা ভদ্রমহিলা, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো পাকা চুল, এক পা এক পা করে তার দিকে এগিয়ে আসছেন, হাতে সুদর্শন চক্রের মতো একটা অস্ত্র। কিরকির কিরকির করে ঘুরছে। মুখ দিয়ে চিৎকার বেরোচ্ছে না, পেছোতে পেছোতে একটা গরাদহীন খোলা জানলা দিয়ে ব্রততী পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে অনেক নিচে, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ বেরোতে যাচ্ছিল, ঘুমটা চড়াৎ করে ভেঙে গেল। এইবার মনে হল স্বপ্নে-টপ্পে নয়। সত্যি-সত্যি বাইরে চোর এসেছে। কি রকম একটা অস্পষ্ট খড়খড় খড়খড় মতো আওয়াজ। কেউ যেন সন্তর্পণে গরাদ কাটছে। মেঝেতে কোনও কাগজের টুকরো পাখার হাওয়ায় ঘুরপাক খেলেও এ জাতীয় শব্দ হয়। ইঁদুর-টিঁদুরের জন্য বা পাখি টাখি...।

গতকাল শুতে বারোটা বেজে গিয়েছিল। সৌম্য এসেছে। শীর্ষ এসেছে। বহু সাধ্য-সাধনার পর। অরণ্য বলছিল—'যেভাবে আমরা তোমাদের জন্য সাধনা করেছি সৌম্য, ঈশ্বরের জন্য করলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হত।' সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যর অবধারিত প্রশ্ন—'আপনার এই ঈশ্বর অভ্যাসের ঈশ্বর না বিশ্বাসের ঈশ্বর, অরণ্যদা—'

তর্ক এড়াতে অরণ্য বলেছিল—'ঈশ্বরটা ইয়ের বিকল্প সৌম্য, আর কিছু না।' ব্রততী জানে অরণ্য গভীরভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী, এতো গভীর, যে অন্যের ঠাট্টা-তামাশায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না ওর।

শীর্ষ এমনিতে বেরোতে চায় না। সাহায্য ছাড়া তো পারবেও না। অভ্যেস করলে হয়ত এতদিনে কিছুটা সহজ হয়ে যেত। কিন্তু অভ্যাস করবার ইচ্ছেটাই ওর মরে গেছে। জোর করতে মন চায় না। শীর্ষকে চোয়াল শক্ত করে কোনও নির্দেশ দেবার দিন তার বড়দের চলে গেছে। সৌম্যর চলাফেরাও তাই খুবই সীমাবদ্ধ। খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজন হলে ব্রততীই যায়, কিম্বা অরণ্য। অরণ্যদাকে ওরা দুজনেই দারুণ ভালোবাসে। মতের মিল থাক না থাক। বুকের মধ্যে একটা কাঁটা সব সময়ে খচখচ করে। ওদের জন্য দিদি সত্যিকারের করার মতো কিছু কোনদিন করতে পারল না। ওরাই বরং নিজেদের দুঃসহ জীবনের পরিধি থেকে দিদিকে সন্তর্পণে পার করে দিয়েছে। পার করেছে অসীম মমতার সঙ্গে। শীর্ষর জন্য সৌম্যই সংসার করল না। বেতের ব্যবসা করে। আজকাল কাঠও ধরেছে। সেই সূত্রে কিছুটা ভ্রমণ ওকে করতেই হয়, নইলে সৌম্য বলতে গেলে শীর্ষর ছায়া। ছায়া যেমন অনেক সময়ে লম্বা বড়মাপের হয়ে পড়ে, শীর্ষর পাশে সৌম্যও তেমনি। সৌম্যর সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল সেই শ্রীময়ী অসম্ভব ধৈর্যশীল মেয়ে। অনেক, অনেকদিন ওর জন্য অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু সৌম্য ও ব্যাপারে নির্বিকার। ওর মধ্যে কোনও ভাবালুতা নেই, বড় বড় কথা নেই, কিচ্ছু না। কিন্তু যে কাজটা করবে বলে মনে করে, তা থেকে কেউ ওকে নড়াতে পারবে না। আজও। কাউকে আঘাত-টাঘাত না দিয়ে এটা যে ও কেমন করে পারে! শ্রীময়ীর সঙ্গে ওর আলাপ স্কুলের বয়স থেকে। অথচ শীর্ষর জন্য অমন মেয়েটাকে অনায়াসে চলে যেতে দিল। খুব সম্ভব ব্রততীকেও যেমন বুঝিয়েছিল, শ্রীময়ীকেও তেমনি বুঝিয়েছে। বিয়ে করাটা শ্রীর একান্ত দরকার, এবং ওর নিজের না করাটা। ব্রততী বোঝাবার চেষ্টা করেছিল—শ্রী তো খুব ভালো মেয়ে সোম, ওকি শীর্ষকে দেখবে না?' সৌম্য বলেছিল—শ্রী খুব ভালো মেয়ে দিদি, আমিও খুব ভালো ছেলে। কিন্তু স্বার্থপরতা যদি একবার এসে ভর করে শীর্ষর কি হবে?' ব্রততী বলেছিল—'তোদের কারুর পক্ষেই স্বার্থপরতা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।' সৌম্য তখন আস্তে আস্তে বলেছিল—'দিদি, তোর কি মনে নেই, শীর্ষ কি রকম ফুল ব্লাডেড ইয়ংম্যান ছিল!' শীর্ষ অনাগ্রহী চোখে তাকিয়ে থাকে, কিছু বলে না। বলে না—'ছোড়দা, তুই আমার জন্যে কেন...।'

আসল কথাটা বললে সেটা মোটেই সত্যি হত না। ন্যাকামি হত। একজন যদি কীটদষ্ট হয়ে অসম্ভব কষ্টে বাঁচে, তাহলে তার প্রিয়জনরা আর সবাই স্বাভাবিকভাবে, সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবে, যেন কিছুই হয়নি, কোথাও অসমতল কিছু নেই—সেটাই অস্বাভাবিক, সেটাই মিথ্যে। সৌম্য আর শীর্ষর মধ্যে কোনও ভাবালুতা নেই, ন্যাকামি নেই। মিথ্যেও নেই। তাই শীর্ষ বলে না—'ছোড়দা, তুই তোর নিজের মতো করে বাঁচ।' ভাবাবেগে আমরা এরকম কথা প্রায়ই বলে থাকি, যদিও আসলে বলতে চাই না। অন্যরকম একটা দায়িত্ববোধ, খুব সূক্ষ্ম বিবেকের কীটদংশন কি সৌম্যর ভেতরেও চিরকাল কাজ করে যাবে না? জীবন দর্শনের ব্যাপারে শীর্ষ যে একদা ভীষণভাবে ছোড়দার ওপর নির্ভরশীল ছিল! তাই ওরা দুজন এক, একা।

একভাবে দেখতে গেলে ব্রততী, অরণ্যও একা। তিনজন হতে পারল না বলে। অরণ্য কিছু বলে না। ওর ভেতরে একটা মেনে নেওয়ার ব্যাপার আছে। ব্রততী যখন ডাক্তার-টাক্তার দেখানোর হাঙ্গামায় রাজি হল না, তখন সে কিছুই বলেনি। সহকর্মীদের পরামর্শেই খুব আলতোভাবে কথাটা তোলা। ব্রততী আমল না দিতে দ্বিতীয়বার আর বলেনি। নিজেকে দেখিয়ে নিয়ে চুপ করে থেকেছে। ব্রততী-অরণ্য দুজন ঠিকই। আবার দুজনে মিলেও সব সময়ে একজন হতে পারে না। কোথাও কোথাও একা। একেবারে একা। সেই একাকিত্ব বিদ্ধ করবার চেষ্টা নেই অরণ্যর। সেটা উদ্যমের অভাবের জন্য না। সৌম্য-শীর্ষর মতো নিভাঁজ বোঝাপড়া না থাকলেও ওদের মধ্যেও একটা নিরুক্ত বোঝাবুঝি আছে। ব্রততী একা হয়ে গেলে, কারণটা অনুমান করতে পারলেও অরণ্য আস্তে আস্তে গভীর ভাবে হারিয়ে যায়। ইচ্ছে করেই। একাকিত্বটা ব্রততীর ভীষণ প্রয়োজন বুঝে সেটাকে যেন সম্ভব করে দিতেই।

আড্ডাটা সত্যিকার জমেছিল আসলে কাল। রবিবার ছুটি বলেই শনিবার রাত্তিরের আড্ডা সবচেয়ে রমণীয়। ওরা শুক্রবার থেকে রয়েছে অথচ চারজনে মিলে একসঙ্গে খেতে বসা পর্যন্ত হয়নি কদিন। শনিবার রাতে প্রথম হল। অরণ্য বলছিল—'তোমার হাত আজ খুব খুলেছে মনে হচ্ছে!' কদিন আগেই, ওদের আসার ঠিকঠাক হতে ব্রততী বলেছিল—'তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

—'অসুবিধে কিসের?'

—'অন্য কিছু না। শীর্ষর জন্য কোনও জবাবদিহি... কারো ব্যঙ্গ... এটা তো ফ্যাক্টরি-কলোনিই... আমি এখানকার ব্যাপার-স্যাপার জানি বলেই বলছি।'

—'দ্যাখো ব্রততী, এদেশে কিম্বা সারা পৃথিবীতে কত প্রতিবন্ধী আছে তার স্ট্যাটিসটিক্স্ জানো ? কাজেই তার 'কি কেন কবে কোথায়' নিয়ে মাথা ঘামাবে কে ? কার অত সময় ?'

—'তোমাদের মিল কলোনিতে সময় আছে গো। অনেকের।'

—'এসব ব্যাপারে বেশি টাচি হয়ো না ব্রততী, দ্যাট্স্ অল।'

খুব জমেছিল কাল। যারা সবসময়ে একমত তাদের মধ্যেও আড্ডা জমে, কিন্তু একটু-আধটু রকমফের হলে জমে আরও। অরণ্য খুব ধীর, শান্ত ব্যক্তিত্বের মানুষ। তলিয়ে বোঝবার আগে কখনও কিছু সিদ্ধান্ত নেবার পাত্র নয়। চওড়া কাঁধ, হাত-পাও কর্মী-মানুষের কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় গভীরতা মাপতে কিছু সময় প্রয়োজন। সৌম্যও একটা ধীরতা আয়ত্ত করেছে আজকাল। কিন্তু সেটা চেষ্টাকৃত। খুব ঠুনকো। শীর্ষ এখনও ছেলেমানুষ, খুব মেজাজি। ওর মেজাজের ঋতুবদল খুব দ্রুত হয়। মস্ত এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলছিল—'নাইটমেয়ার্স অফ এমিনেন্ট পার্সন্স্' পড়েছেন অরণ্যদা ? পড়লে বুঝতে পারতেন সাহিত্যিক হিসেবেও মানে ফিকশন মেকার হিসেবেও রাসেল কি অসাধারণ ছিলেন !'

অরণ্য বলছিল—'দ্যাখো শীর্ষ, রাসেলের গ্রেটনেস কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে শ এর সঙ্গে তুলনা চলে না।'

—"এই দেখুন, আপনি রাসেলের কি পড়েছেন ? 'এবি সি অফ রিলেটিভিটি' আর 'কংকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস' এই তো ? অ্যাভারেজ পাঠক তাই পড়ে। আর শ-এর ?'

—উঃ অনেক। স-বই বোধহয়। কি অসাধারণ মণীষা ! লেখার ধার কি ! আমাদের সময় তখন কলকাতার আঁতেল সার্কলে এলিয়ট খুব চলছে আর বোদলেয়র। কিন্তু পজিটিভ কিছু দিতে না পারলে... আর রাসেলের ওই বারবার বিয়ে করাটা যাই বলো...'

উচ্চৈস্বরে হেসে উঠেছিল শীর্ষ এবং সৌম্যও।

ব্রততী ফোড়ন কেটেছিল—'যতই হাসো, তোমাদের এই গ্রেটমেনরা সব অটোমেশন। হৃদয়হীন, যান্ত্রিক...'

—'যান্ত্রিক ? তাই-ই বোধহয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অ্যান্টি-ওয়ার মুভমেন্ট করলেন। সমস্ত জগৎ যখন কমিউনিজম আর বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে তখন রাশিয়া ঘুরে এলেন।'

—'এদের কি বলে জানিস ? ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে।'——ব্রততী

নির্লজ্জভাবে মেয়েলি মন্তব্য করল।

অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ার মতো ঘুরপাক খেতে খেতে ওদের আড্ডা শেষ হয়েছিল সৌম্যর মন্তব্যে—'তোমাদের গান্ধী মহারাজ অরণ্যদা দারুণ মজাদার লোক কিন্তু। মিডিইভ্যাল সেন্ট আর মর্ডান ম্যানের জগাখিচুড়ি। দুঃখের বিষয় যেখানে মর্ডান ম্যানের ভূমিকায় নামা উচিত ছিল সেখানে সাধুগিরি করে গেলেন। আর যেখানে সাধুসন্ত হয়ে চুপচাপ থাকা উচিত ছিল সেখানে গোলমেলে পলিটিক্সের একেবারে মাঝমধ্যিখানে নাকটি গলালেন' বলতে বলতে সৌম্য মাথা অবধি মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এ বিষয়ে ও আর কিছু শুনতেও চায় না, বলতেও চায় না। অরণ্য তা সত্ত্বেও বলেছিল—'সেই জন্যেই কি সারা পৃথিবীতে আজ ভদ্রলোককে নিয়ে এতো হইচই ?'

চাদরের তলা থেকে সৌম্যর ঠাট্টা — সে তো এ্যাটেনবরোর গ্যান্ডি !'

ঘড়িতে ঢং করে বেজেছিল বারোটা। —'আর রাত করিসনি শীর্ষ, ঘুমিয়ে পড়।'

জড়ানো গলায় শীর্ষর উত্তর—'আমি তো অনেকক্ষণ আগে থেকেই ঘুমোচ্ছি !'

চারজনের ধুম হাসি। আসলে শীর্ষ রাজনৈতিক আলোচনার বাষ্পের মধ্যেও থাকতে চায় না। ও আজকাল সাহিত্য পড়ে, দর্শন পড়ে, সংস্কৃত শিখছে নাকি টুলো পণ্ডিত মশাই রেখে। অতঃপর ব্রততী-অরণ্যর মস্ত বড় বড় সমাপ্তিসূচক হাই।

ব্রততী জিজ্ঞেস করেছিল—'শীর্ষ তোর আর বালিশ লাগবে ? সঙ্কোচ করিসনি। আমার অনেকগুলো কুশন তোলা আছে।'

—'থাকলে দে। অ্যাজ মেনি অ্যাজ পসিবল।'

শুতে শুতে অরণ্য আত্মগত বলছিল—'আগে ভাবতুম এক্সট্রিমিজম্‌টা বয়সের ধর্ম। ম্যাচিওরিটি এলে আপনা আপনিই অরুচি এসে যায়। এখন দেখছি ওটা ব্যক্তিগত চরিত্র আর মেজাজের ব্যাপার।'

ব্রততী হাই চাপা দিতে দিতে বলেছিল—'রাত্তিরবেলার আড্ডাগুলো তোমরা একটু কম সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কোরো।'

—'অর্থাৎ হিন্দি- সিনেমা এবং টিভি সিরিয়াল ?'

অরণ্য শব্দ করে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলেছিল। দরজা খোলা, সৌম্যও শুনতে পেয়েছে, ও-ও হাসছিল, বলছিল—'দিদি তোর মাথা গরম হয়ে গিয়ে থাকে একটু জল থাবড়ে শুয়ে পড়।'

কোথা থেকে আসছে শব্দটা ! লিভিং রু র পর্দা সরালো ব্রততী। সৌম্য

মনে হল জেগে গেছে। শব্দ করে পাশ ফিরল। পাখাটা শনশন করে চলছে। ঝড় বইছে ঘরে। শীর্ষটা ঠাণ্ডায় একেবারে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে গেছে। এদিককার ভোরে এতোটা দরকার হয় না। গ্রীষ্মকালেও ভোরে চাদর লাগে এক এক সময়। ব্রততী বন্ধ করে দিল সুইচটা। বলল—'শব্দটা শুনতে পাচ্ছিস ?'

জড়ানো গলায় উত্তর এলো—'পাখি-টাখি হবে, বাসা করছে বোধহয়... দিস ইজ দি স্প্রিং টাইম, দিস ইজ দা হ্যাপি রিং টাইম...।

—সেপ্টেম্বরে স্প্রিং টাইম ?

—'ওই হলো। ঘুমে সব গুলিয়ে দিচ্ছে রে দিদি। প্লীজ পালা।'

—'চোর নয় তো ?'

—'চোর হলে আগে ওষুধ-ফষুধ স্প্রে করত। কষ্ট করে জাগাতো না এভাবে। যা এখন... ঘুমোতে দে।...'

সুরক্ষিত মিল এলাকা হলেও ঘরের মধ্যে ওষুধ স্প্রে করে জানলার গ্রিল উপড়ে চুরি বা ডাকাতির ঘটনা যে এখানে একেবারেই ঘটে না, তা বলা যায় না। গত বছরই সুপারভাইজার মহাপাত্রর বাড়ি হয়েছে। আসলে মিলের পেছনে সোয়া মাইল গেলেই রেলওয়ে সাইডিং। ওই দিক থেকেই আসে এরা। একতলা বলেই বেশি সাবধানতা। ব্রততী একবার চারদিক দেখে এলো। এখন যদি স্বপ্নের সেই মোটা ভদ্রমহিলাকে সামনে পেতো দেখে নিত একবার। স্বপ্নের কথা মনে করে ব্রততীর হাসি পেলো। রান্নাঘরে সিঙ্কের ওপর রাজ্যের এঁটো বাসনকোশন জড় করা রয়েছে। বিশ্রী গুমসোনি গন্ধ বেরোচ্ছে। কোথাও কিছু নেই। কিন্তু শব্দটা একই ছন্দে হয়েই যাচ্ছে। হয়ে যাচ্ছে। খড়খড় খড়খড়। ধুত্তেরি। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। আরেকবার বিছানায় ঢুকল ব্রততী। রবিবার। তাড়া নেই। সারা দিন গড়িয়ে গড়িয়ে কাটবে। বারবার চা চাইবে শুধু তিনটে ছেলে। উপছোনো অ্যাসট্রে পরিষ্কার করতে হবে বারবার। আর কোনও হাঙ্গামা নেই।

সকালে বাগানের দিকের দরজাটা খুলতে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা গেল। দোতলার বারান্দার নল দিয়ে খুব সরু ধারায় জল পড়ে যাচ্ছে। সারারাত জলটা এইভাবে সমানে পড়ে গেছে। মাটির ওপর বিছোনো মোরামে পড়ে শব্দ হয়েছে ছড়ছড় ছড়ছড়। ব্রততী সেটাকে শুনেছে খড়খড় খড়খড়। সারা রাত শব্দটা উড়ো আপদের মতো ঘুমের শান্তি তছনছ করেছে। সৌম্যটাও জেগে গিয়েছিল। ওরও হয়ত। শব্দ-টব্দ হলে ব্রততী একদম ঘুমোতে পারে না। ছেঁড়া ঘুম দুঃস্বপ্নের দাঁড়ি কমা সেমিকোলন সমেত ঘোরাফেরা করেছে মাথায় যেন

সাইক্লোনের মেঘ।

আসলে রান্নাঘর দুদিক থেকে বন্ধ। বাইরে প্যাসেজ। প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে তবে পেছনের বারান্দা। তারও ওদিকে বাগানের মোরামের ওপর দোতলার বারান্দা থেকে জল পড়েছে। এদিক থেকে বোঝার উপায় ছিল না। তাই রাতে দু তিনটে ঘর খুলে তদন্ত করেও উৎসটা আবিষ্কার করা যায়নি।

দোতলায়, চীফ এঞ্জিনিয়ার সুমন্ত সেনগুপ্তদের বারান্দায় কলওয়ালা পেল্লাই জয়ঢাকের মতো জালা থাকে। হরিদ্বার-টারে যেমন পাওয়া যায়। খুব সম্ভব বিদঘুটে চেহারা আর বোম্বাই সাইজের জন্যই ওটার বাইরের বারান্দায় স্থান হয়েছে। তবে ওতে টিউবওয়েলের পানীয় জলই তোলা থাকে বোধহয়। এই জালাটা থেকেই নিশ্চয় জল পড়ছে। মাঝরাতে কোন সময়ে জল খেয়ে কলটা ভালো করে বন্ধ করতে ভুলে গেছেন সুমন্তবাবু। উনি নাকি আবার ফ্রিজের জল খান না। গলা ব্যথা করে। বলছিল একদিন ওঁর স্ত্রী পারমিতা। সব মানুষেরই কিছু কিছু বাতিক থাকে।

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে বেরিয়ে ব্রততী মুখ উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করছে তার অনুমান ঠিক কিনা, পেছন থেকে রামের মার সাড়া পেলো।

—'কি দেখতেছ গো বউদিদি ?'

ব্রততী বলল—'তুমি এসে পড়েছ ভালোই হয়েছে, রামের মা। ওপরের বাবুকে গিয়ে বলো তো বারান্দার নালি দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, জালার কলটা যেন আগে বন্ধ করেন। দেখো, দেয়ালময় কিরকম কাদার ছিটে উঠেছে।'

রামের মা ওপর নিচ দুতলাতেই কাজ করে। প্রথমে নিচের কাজ সারে, তারপর ওপরে যায়। ব্রততীর কথায় সে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এলো আবার। —'ধাক্কা মারতেছি, বেল বাজিয়ে মরতেছি, কেউ খোলেনি কেন গা ?'

ব্রততী বলল—'ওপরের বউদি তো শনি-রবিবার বাড়ি থাকেন না। তুমি ভুলে গেছো ? বাবু একা আছেন তো ! হয়ত আজ বেশি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তুমি আর একটু ধাক্কা দাও।'

চায়ের কেটলির শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে রামের মার ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ বেশ ভালো করেই কানে এলো।

একবার করে তীব্র নিখাদে বেল বেজে ওঠে। তার জলতরঙ্গ বাজনা শুরু হয়, তারপরেই রামের মার খনখনে গলার আওয়াজ—"ও বাবু, সায়েব, সায়েব

গো ! দরোজাটা খোলবেনি ?'

চোখ মুছতে মুছতে অরণ্য উঠে এলো।

—'কি ব্যাপার ? সাত সকালে রামের মা লাগিয়েছেটা কি ? রোববারেও যে একটু আয়েস করে ঘুমোব। তার উপায় নেই। বারোমাস ছত্রিশ দিন...'

—'তা তোমাদের সেনগুপ্ত সাহেব যদি কুম্ভকর্ণ হন, রামের মার আর দোষ কি বলো ? —ব্রততী চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল —'তুমি এক কাজ করো তো। আমাদের শোবার ঘরের ওদিকটায় চলে যাও, বাগান দিয়ে, নিচে থেকে একটা হাঁক দাও। ওদিকের জানলা দিয়ে শুনতে পাবে এখন।'

অরণ্য চটি পায়ে বাগানের দিকে বেরিয়ে গেল।

ব্রততী রান্নাঘর থেকে দেখল সৌম্য লিভিংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে। দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল— 'শীর্ষ কাল সারারাত ছটফট করেছে, আজ ভাবছি চলেই যাবো। একটু বেশি করে ব্রেকফাস্ট দিস।'

ব্রততী স্থম্ভিত হয়ে বলল—'সে কি রে ? চলে যাবি কি ? আজকের জন্যেই তো যত আয়োজন। জল্পনা-কল্পনা। ঠিক আছে। তোদের যা ইচ্ছে চিরকালই করে এসেছিস, এখনও কর।'

ব্রততী তৃতীয় কাপে চা ছাঁকতে লাগল। সৌম্য একটু ইতস্তত করে বলল—'ব্যাপারটা ঠিক মান অভিমানের পর্যায়ে নেই রে। শীর্ষ একটু বেশিরকম আপসেট হয়ে পড়েছে। বুঝতেই পারছিস। সবকিছু তো আর আগে থেকে হাত গুনে বলা যায় না ! ফিজিক্যাল হ্যানডিক্যাপ নিয়ে তবু যা হয় করে চালাচ্ছি, মানসিক বিপর্যয় কিছু ঘটে গেলে কি করব বলতে পারিস ?'— শেষের দিকে সৌম্যর গলা নিচু, ভারি হয়ে এলো। অরণ্য ফিরে এসে বলল—'ষাঁড়ের মতো চেঁচালুম, নাথিং ডুয়িং।'

রামের মাও ততক্ষণে আবার নিচে নেমে এসেছে।

—'বাবুরে যে কালঘুমে ধরেছে গো। অসুকবিসুক নাকি ?'

অরণ্য একটু চিন্তিত হয়ে বলল— 'তোমার কাছে তো মিসেস সেনগুপ্ত ডুপ্লিকেট চাবিটা রাখে, সেটা দিয়ে খুলে দেখো না হয়। তুমি নিজেই একবার যাও, রামের মার সঙ্গে। অসুখ টসুখ কিছু করল কিনা কে জানে।'

ব্রততী বলল—'আমি অতশত পারবো না। তুমি যাও না।'

অরণ্য বলল—'এই দ্যাখো। আমি শেভিং ক্রিমটা মেখে ফেলেছি। নইলে যেতুম ঠিক। দুটো টান দিয়েই আমি যাচ্ছি। তুমি প্লীজ একবার দেখো। ওপরতলার প্রতিবেশী খারাপ দেখাবে না হলে।'

চাবিটা খুঁজে পেতে সামান্য দেরি হল ব্রততীর। একটা হুকে ও নিজের সমস্ত চাবি রাখে। আলাদা একটা হুকে সেনগুপ্তদের ফ্ল্যাটের চাবি। চাবিটা সেখানে ছিল না। ওর বারোয়ারি চাবির হুকেই কখন রেখেছে মনের ভুলে।

শীর্ষ গুঁড়িসুঁড়ি মেরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। খানছয়েক কুশন ওর বাঁকাচোরা শরীরের চারপাশে। সৌম্যর হাতে চায়ের কাপ এবং কাগজ। গালে সবে সেফটি রেজারের একটা দুটো টান দিয়েছে অরণ্য, এমন সময়ে এলো ব্রততীর চিৎকারটা। একটা লম্বা লং ক্লথের টুকরোকে যেন কেউ চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলল। ব্রততীর তো নয়ই। কোনও মানুষের গলা বলেই মনে হয় না এতো গা ছমছমে আওয়াজ। তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে গেল অরণ্য। চায়ের কাপটা ঠক করে নামিয়ে পেছন পেছন সৌম্যও। মাঝসিঁড়ি অবধি উঠেছে কি ওঠেনি, দেখল ব্রততী কেমন এলোমোলো পা ফেলে অন্ধের মতো টলতে টলতে নেমে আসছে। মুখটা রক্তহীন। অরণ্যকে দেখে পায়ের কাছে কেমন জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। ধরে না ফেললে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যেত।

—'কি হয়েছে ? হয়েছেটা কি তোমার ?'

সৌম্য পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্রততীকে ভালো করে ধরে বলল—'রামের মার দিকে দেখো অরণ্যদা।'

হলঘরটার অপর প্রান্তে দেয়ালজোড়া একটা দেওদারের ফ্যাব্রিক পেন্টিং। সাদার ওপর গাঢ়, কালচে সবুজ। তার তলায় সটান শুয়ে পড়েছে রামের মা। খুব সম্ভব দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে এবং দেখতে অরণ্যর এক লহমার বেশি সময় লাগল না। ওরা ধরাধরি করে ব্রততীকে ঘরের মেঝেতে বসিয়ে দিল, তারপর শোবার ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। হলের অপর প্রান্তে। ডান দিকে শোবার ঘরের দরজা খোলা। দরজাপথে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল অরণ্য। পুবের জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। সূর্যকে পেছনে নিয়ে বাইরের কমপাউন্ডের রেনট্রিটার ছায়ার ঝিলিমিলি আন্দোলিত হচ্ছে সুমন্ত সেনগুপ্তর বিয়েতে পাওয়া সাদা সানমাইকার খাটের ধবধবে চাদরে। ডানলোপিলোর গদি একেবারে টানটান। খালি পায়ে, খালি গায়ে খাটের মালিক স্বয়ং অনতিদূরে একটা স্টীলের চেয়ারে আসন পিঁড়ি হয়ে ধ্যানস্থ। তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কালো কালো সরু সরু সাপ।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে অরণ্য আর একটু এগিয়ে গেল। সাপগুলো এসেছে সুইচবোর্ড থেকে। একটা সুইচের ঢাকনা খোলা। সেখান থেকে দুটো তার

সোজা সুমন্তর পায়ের আঙুলে এসে পৌঁছেছে। মোক্ষম প্যাঁচ দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে চলে গেছে গলা অবধি। কাগজের মতো শাদা একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। বরাভয় মুদ্রাটি শুধু নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সৌম্যকে ধাক্কা দিয়ে সভয়ে পিছিয়ে এলো অরণ্য। টেলিফোনটার দিকে ছুটে গেল তারপর।

ছায়ার পাশে

মর্নিংওয়াক সেরে ফিরেছেন পরমার্থ। মোটাসোটা থাইয়ের ওপর খাকি শর্টস। খানিকটা জগিংও করেন উনি ফি সকালে। এখন ঘামে চকচক করছে বাদামি চামড়া। জানলার ধারে দোলনা চেয়ারে বসে আরাম করে লেবু চা খাবেন। কোথায় পড়েছেন লেবু চা, লেবুর শরবত, লেবুর সব কিছু চর্বি কমাতে সাহায্য করে। খালি গায়ের ওপর একখানা মোটা তোয়ালে, মাঝে মাঝে নিচু হয়ে ভুঁড়ির থাকগুলো খামচে ধরছিলেন পরমার্থ। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। এতো করেও থাকগুলো সংখ্যায় কমছে না। জয়ন্তী শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন —'তোমার ফোন। মুখার্জি করছে।' ফোনটা শোবার ঘরে থাকে। জয়ন্তী খাটের ওপর বেড কভার ঢাকা দিতে দিতে শুনলেন পরমার্থ বলছেন —'কি, কি বললে ? ওহ গড্।' রিসিভারটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি এসে ধরে না ফেললে চৌচির হয়ে যেত জিনিসটা।

পরমার্থর চোখ ঠিকরে আসছে। বললেন—'শীগগিরই এক গ্লাস জল দাও। শরীরটা কেমন করছে।'

জয়ন্তী সহজে ঘাবড়ান না। আজ ঘাবড়ে গেলেন। ফ্রিজ থেকে তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ভরে এগিয়ে দিলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন —'কি ব্যাপার ?'

এক চুমুকে ঠাণ্ডা জলটা শেষ করলেন পরমার্থ। জয়ন্তী বললেন—'তোমার কপালে ঘাম দিচ্ছে। কতবার বলেছি ওভাবে জল খেয়ো না। হয়েছে টা কি ?'

পরমার্থ বললেন—'মুখার্জিদের ওপরে সেনগুপ্ত...'

—'কে সেনগুপ্ত ?'

—'আহা, সুমন্ত সেনগুপ্ত! চীফ এঞ্জিনিয়ার! আত্মহত্যা করেছে।'

—'কি করেছে ?' প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তী।

পরমার্থ এখন একটু সামলে উঠেছেন। স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন —'সুইসাইড। বুঝলে এবার ? তুমি কি মেমসায়েবি ইস্কুলে পড়েছ বলে সরল বাংলাটাও বোঝ না! মুখার্জি পুলিসে ফোন করছে। এতক্ষণে করা হয়েও গেছে। আমি চললুম। একটা শার্ট দাও শিগগির।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন পরমার্থ। প্রথম আলাপের পর সুমন্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে রায় পরিবারের ঠিক হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

জয়ন্তী বলেন,—'অত আড়ষ্ট লোক নিয়ে সামাজিকতা চলে না।'

ওরা নিজেরাও কখনও আসেনি। সে নিয়ে পরমার্থর একটা ক্ষোভই থেকে গেছে মনে। তিনি নিজে হাসিখুশি দিলখোলা লোক। অত মেপেজুপে চলতে পারেন না। জয়ন্তী তাঁকে প্রায়ই দোষ দেন এ জন্যে।

আয়নায় জয়ন্তীর ছায়া পড়েছিল। চোখদুটো বিস্ফারিত। আতঙ্কিত। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁকা। কাঁপছে। শোবার ঘর থেকে বসবার ঘরে তাড়াতাড়ি চলে এলেন তিনি। সামনে গোল আয়না। মুখের ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ঘন নিঃশ্বাসের তালে তালে মুখের ছোট ছোট মাংসপেশীগুলো থরথর করে কাঁপছে। জয়ন্তী প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকলেন—'রামশরণ!'

—'কি মা ?'

—'মিমি-মিন্টু কি এখনও ঘুমোচ্ছে ?'

—'ওরা বাগানে গেছে মা। মাটি কোপাচ্ছে।'

—ওদের শিগগির ডেকে দাও।'

একটু পরে হাতে কাদা-মাখা খুরপি নিয়ে হাসি-হাসি মুখে ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়ালো, দুজনকে আঁকড়ে ধরে ওদের ঘরে ঢুকে গেলেন জয়ন্তী। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও ঠোঁট দুটো কেঁপেই যাচ্ছে, কেঁপেই যাচ্ছে।

কান্তিভাইয়ের গাড়ি পৌঁছেছে প্রায় পুলিসের গাড়ির আধঘণ্টা পরেই। কান্তিভাই ভীতু মানুষ। অকুস্থল একবার দেখে এসে বসে আছেন। ম্যানেজারের নিজস্ব চেম্বারে। ঘনঘন কফি খাচ্ছেন, আর কপালের ঘাম মুছছেন। রায় ওঁকে চেনেন ভালো করেই। ভরসা দিয়ে গেছেন। কাছাকাছি মার্কেটিং ম্যানেজার এবং একজন এঞ্জিনিয়ার দেখভাল করবার জন্য ঘুরঘুর করছেন। ছোট মালিক স্বয়ং। কখন কিসে ত্রুটি ধরেন। তবে কান্তিভাইয়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে না, ত্রুটি ধরবার মেজাজ আছে তাঁর। পাঁচ মিনিটে অন্তত সাতবার 'ওহ্ গড্' বললেন। চৌধুরী এবং ঘোষাল বৃথাই পাশের ঘরটায় বসে সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

—'ইলেকট্রিসিটির এ রকম অভিনব অ্যাপ্লিকেশন ইতিপূর্বে আমি তো অন্তত দেখিনি'— স্থানীয় থানার ও সি দ্বারিকা মৈত্র বললেন, 'ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার বলছিলেন না ?'

—'উঁহু। মেকানিক্যাল। মেনটেনান্স ডিজাইনিং সব কিছুরই মাথার

ওপরে'— ম্যানেজার রায় জবাব দিলেন।

'এভাবে মৃত্যু, মানে এরকম ইল্যাবোরেটলি মরার কারণ কি বলে মনে হয় আপনার ? খানিকটা শকই তো যথেষ্ট, না কি ?' —ডাক্তার গুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন দ্বারিকাবাবু। ম্যানেজার রায়ও তাঁর প্রশ্নের পরিধির বাইরে নয়।

ডাক্তার বললেন—'সুইসাইডের সাইকলজি কি বলব বলুন। হয়ত ইন্সট্যানটেনিয়াস, পেনলেস এবং শিওর ডেথ চেয়েছিল।'

—'ব্যাপারটা কি তাই ?'

—'শিওর তো বটেই। অন্যগুলো সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ব্লাড সেলগুলো ইলেকট্রোলাইজড হতে কিছুটা সময় লাগে। মে বী জাস্ট এ কাপল অফ সেকেন্ডস। বাট দোজ সেকন্ডস আর অ্যান ইটারনিটি। কষ্টর দিক দিয়ে বললাম।'

দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা আওয়াজ হল কোথাও।

পরমার্থ রায় পুলিসি রঙ্গ রসিকতায় যোগ দিতে পারেননি। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বললেন— 'এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ? একেবারে আমার ফ্যাক্টরি এরিয়ার ভেতর···এ তো কল্পনাই করা যায় না।'

—'তা না যাক।' দ্বারিকা মৈত্র নীরস মন্তব্য করলেন—'সত্য সব সময়েই কল্পনাকে এক কাঠি ছাড়িয়ে থাকে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। এখন ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি। কোনও অফিসিয়্যাল কেলেঙ্কারি !'

রায় বললেন—'কি আশ্চর্য ! আউট অফ দা কোয়েশ্চেন। বছর খানেক মাত্র কাজে যোগ দিয়েছিলেন। অত্যন্ত কাজের লোক এবং নির্বিরোধী। কারো সঙ্গে মনোমালিন্যেরও প্রশ্ন ওঠে না। তা ছাড়া এখানে স্টাফের মধ্যে রিলেশন খুব ভালো। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পারেন। এটা আমি কনশাসলি প্রোমোট করার চেষ্টা করি। ফিলিপিনসে থাকতে—'

পুলিশ কন্সটেবল শর্মা ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে খোঁজাখুঁজি করছিল। বলল— 'কাগজ-উগজ তো কুছু মিলছে না সাব। জেনানা লোগের নেল-পালিশ, লিপস্টিক এই সোব চীজ কুছু কুছু আছে।'

দ্বারিকাবাবু বললেন— 'ও সব কাগজ ড্রয়ারে থাকে না শর্মা। তোমার চাকরিটা যাবে মনে হচ্ছে। আশেপাশেই খোঁজো।'

কাগজটা অবশেষে অ্যাশট্রে চাপা পাওয়া গেল। পুড়ে যায়নি ভাগ্য ভালো। কারণ খাটের সাইড-টেবিলের ওপর সিগারেটের টুকরো অ্যাশট্রে থেকে উপছে চতুর্দিকে পড়েছে। সাইড-টেবিলের সানমাইকার ওপর পর্যন্ত দাগ পড়ে গেছে ;

তলায় কার্পেট ফুটো। খুব মনোযোগ দিয়ে দাগটাগগুলো পরীক্ষা করলেন দ্বারিকাবাবু। বললেন— 'সুইসাইডকে আপনারা মোমেন্টারি ইনস্যানিটি বলেন ডাঃ গুপ্ত, কিন্তু এ ভদ্রলোক বহু ভেবেচিন্তে কাজটি করেছেন। ক' প্যাকেট সিগারেট খরচ হয়েছে স্টাবগুলো গুনলে পাওয়া যাবে। শুধু চিন্তা না। ভাবতে ভাবতে একেবারে বেভুল হয়ে গেছিলেন ভদ্রলোক। কিভাবে উপছে পড়েছে স্টাবগুলো দেখুন। দামী কার্পেট ফুটো হয়ে গেছে, ঘরে আগুন লেগে যেতে পারত···।'

স্তূপীকৃত সিগারেটের টুকরোর তলা থেকে পাওয়া গেল কাগজটা। অ্যাশট্রের চীনেমাটি—ওটাকে রক্ষা করেছে খুব সম্ভব। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্বারিকা মৈত্র বললেন— 'এটা না পেলে আপনাদের ···· মানে ফ্যাক্টরির এমপ্লয়িজ ··· বিশেষ করে ··· কি যেন নাম বললেন এঁর ? অরণ্য মুখার্জি ? এঁকে একটু অসুবিধেয় পড়তে হত।'

শুকনো গলায় অরণ্য বলল— 'কি যে বলেন মিঃ মৈত্র। সেনগুপ্ত টেকনিক্যাল স্টাফ। আর আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে····কোনও যোগাযোগই····'

দ্বারিকাবাবু হাত নেড়ে বললেন—'তাতে কিছু ইতরবিশেষ হয় না মিঃ মুখার্জি। কত রকমের পার্সন্যাল গ্রাজ-টাজ', এই ধরুন আপনি এতো দিনের স্টাফ নিচে, উনি ওপরে। একটা ডিসক্রিমিনেশন তো ? সামান্য হলেও সামান্য নয়। এরকম অনেক আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ব্যাপার থেকে অপরাধের মানসিকতা গড়ে ওঠে। যাক আপনাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই'— তিনি দু হাত তুলে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন— 'কাগজটা তো পাওয়াই গেছে। একবার খালি রুটিন চেক ···· সেনগুপ্তর হাতের লেখা কিছু পাওয়া যাবে তো আপনাদের অফিস ফাইলে ? ব্যাপারটা অবশ্য আনডাউটেডলি সুইসাইড, কোনও দ্বিমত হবে না এ ব্যাপারে। এভাবে ইলেকট্রিক ওয়্যার জড়িয়ে জড়িয়ে কেউ কাউকে খুন করতে পারে না।' চোখ দুটো সরু করে দ্বারিকা মৈত্র তাকালেন রায়ের দিকে, তারপর অরণ্যর দিকে— এনিওয়ে উই শুড রিজার্ভ আওয়ার জাজমেন্ট টিল পোস্ট মর্টেম···। তবে মিঃ রায়, আপনার ঝামেলা খুব কমছে না। অফিসের রেকর্ড-টেকর্ড একটু দেখতে হবে। এঁর ফ্যামিলি-ট্যামিলি কি এবং কোথায় ? ব্যাচেলার না কি ! নেল-পালিশ, লিপস্টিক এসব কার ? চরিত্র-টরিত্র ?'

রায় বিরক্ত গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন— 'ম্যারেড। মা-বাবার খবর ঠিক দিতে পারছি না। তবে স্ত্রীর বাপের বাড়ির ঠিকানা পার্ক সার্কাস। আনতে এখুনি গাড়ি পাঠাচ্ছি।'

ডাক্তার গুপ্তর দিকে ফিরে পরমার্থ বললেন— 'আমাদের এখানকার সব কিছু এবং সবাই ক্লীন। যদ্দূর সম্ভব। এটা আমাদের এখানে চাকরির একটা কন্ডিশন বলতে পারেন।'

দার্শনিকের মতো হেসে ডাক্তার বললেন —'তবু তো এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল।' এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

রায় বিমূঢ়ভাবে অরণ্যর দিকে তাকালেন, যেন বলতে চান— 'দ্যাখো কাণ্ড! এঁরা কি মনে করেন যে পরিচ্ছন্নতা আমরা দাবী করছি তা আমাদের নেই!' কিন্তু অরণ্য তখন সেখানে ছিল না। অরণ্য মুখার্জি রায়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। এতো সৎ এবং সব-সময়ে এক-পায়ে-খাড়া মানুষ খুব কম দেখেছেন রায়। তার প্রতিও দ্বারিকা মৈত্রর ব্যবহার দেখো! কথাবার্তার কি শ্রী! অনেকের মধ্যে একজনকে সিঙ্গল আউট করে···। এখন মনে হচ্ছে মুখার্জির বাড়ির ওপরে সেনগুপ্তকে পাঠানো ঠিক হয়নি। প্রতিবেশী হিসেবে ভদ্রলোক কারোরই আশা পূরণ করতে তো পারেননি, উপরন্তু বিপদে ফেলে গেলেন। আর মুখার্জি তলায়, সেনগুপ্ত ওপরে, এটা আদৌ কোনও ডিসক্রিমিনেশন নয়। কি হাস্যকর চার্জ! এগুলো সবই এ-টাইপ কোয়ার্টার্স। টপ্ অফিসিয়ালদের জন্য তৈরি। মুখার্জিরা বরাবর ওই কোয়ার্টার্সে থাকতে ভালোবাসে। ব্রততী কলকাতা যায় রোজ, মেনগেটের কাছে বলে ওইটেই ও পছন্দ করে। দ্বারিকা মৈত্র লোকটিকে হঠাৎ দেখলে খুব করিৎ-কর্মা মনে হয়, আসলে ঢুপ্তু গণেশ। মুখেন মারিতং জগৎ। ডিসক্রিমিনেশন! হুঁঃ।'

অরণ্য নিচে নেমে এসে দেখল সামনের ঘর খালি। রাত্রে সৌম্যরা শুয়েছিল, তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ঘরে রয়ে গেছে, কুশনগুলো সোফার ওপর পর পর সাজিয়ে রাখা, গালচে পাট করা। চাদর পাট করা। এগুলো বোধ হয় দু ভাই মিলে করেছে। ব্রততী করলে এগুলো এতক্ষণ এখানে থাকতই না। যথাস্থানে ঢুকে যেত। অর্থাৎ ব্রততীর এখনও প্রাত্যহিক কাজে নামবার সুস্থতা আসেনি। স্বাভাবিক। শোবার ঘরের পর্দা সরাতেই ব্রততীকে দেখা গেল। জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। এদিকে পেছন। অরণ্যকে দেখতে পেল না। ওর শোয়ার ভঙ্গি থেকে এখনও ভয়ের সেই জড়সড় ভাবটা যায়নি। মাথার ওপর হাত রাখতে মুখ ফেরালো। চোখে একটা শূন্য ভাব। মুখটা ফ্যাকাশে।

অরণ্য একটু ইতস্তত করে বলল— 'একটা শক্ত কাজ না জেনেই করে ফেলেছো ব্রততী। আরেকটা শক্ত কাজ কিন্তু জেনে করতে হবে। সেনগুপ্তর স্ত্রীকে আনতে গাড়ি যাচ্ছে। সে এলে তো যা হবে বুঝতেই পারছি। তুমি একটু

এগিয়ে যেও, হেলপ্-টেলপ্ করো, নয়ত জিনিসটা শুধু শকিং নয়, সাঙ্ঘাতিক বিশ্রী দেখাবে। পারবে তো?'

ব্রততী মুখ নিচু করে ঘাড় নাড়ল। এমনিতে ও খুব শক্ত মেয়ে। বুদ্ধিও ধরে। কিন্তু অত্যন্ত চাপা। কখনও কখনও কেমন ভেঙে পড়ে। কারণ অরণ্যর জানা নেই, কিন্তু লক্ষণগুলো ও নির্ভুল চেনে। কেদার-বদ্রীর পথে যেখানে ওদের প্রথম আলাপ সেখানে অরণ্য ওকে দেখেছে ওর মা-কে সামলাতে। এমনিতে বেশ আছেন, আছেন। মাঝে মাঝে মাথা সম্পূর্ণ গণ্ডগোল হয়ে যেত ভদ্রমহিলার। ব্রততী কোনদিন তাঁর গায়ে আঁচ লাগতে দেয়নি। কোনও যাত্রী বা ট্রাভল এজেন্সির কর্তা-ব্যক্তি তদারকি যাঁদের করার কথা তাঁদেরও কোনভাবেই বিরক্ত করেনি। দারুণ ক্ষমতা ধরে। অরণ্য জানে এই পরিস্থিতিতে সেনগুপ্তর স্ত্রীর দায়িত্ব নিতে যদি কেউ পারে তো ব্রততী-ই পারবে। কিন্তু এখন ওর সংশয় হচ্ছে। ব্রততী উঠে বসেছে। ওর মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে, অরণ্য নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করল— 'কি, পারবে তো?'

ঘাড় নাড়ল ব্রততী।

অরণ্য বলল—'তুমি একটু রেডি-টেডি হও তা হলে। সমস্ত ফ্যাক্টরির লোক জড়ো হবে ওইখানে। আমি চা-ফা করে দিচ্ছি। তোমাকে এখন আর গ্যাসের ধারে যেতে-টেতে হবে না। কি কি করতে হবে বলো, আমি সৌম্যকে নিয়ে করে নিচ্ছি। রামের মা-কে নিশ্চয়ই আর পাওয়া যাবে না।'

ব্রততী শুকনো মুখে ঘাড় নাড়ল। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সৌম্য নিশ্চয়ই ভাইকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। অচেনা জায়গা, যদি পড়ে-টড়ে যায়, সামলাতে না পারে, বাঁ হাতে একদম জোর নেই, ডান পা-ও তাই। সৌম্য তাই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। তার মানে এক ঘণ্টা। ওর নিজের শোবার ঘরের সঙ্গেও একটা টয়লেট আছে। কিন্তু কিছুদিন হল তার শাওয়ার এবং বেসিনের কলের ওয়াশারটা গেছে। মিস্ত্রি এখনও আসেনি। নিচের কলটা দিয়েও ভালোভাবে জল পড়ে না। সামান্য একটু অস্থির-অস্থির লাগল অরণ্যর। কতকগুলো সময় আছে, পরিস্থিতি আছে, যখন মানুষকে নির্বিকারভাবে রুটিন কাজ করতে দেখলে ব্যাপারটা অযৌক্তিক জেনেও মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়ে। অরণ্য রান্নাঘরের দিকে গেল। খুব নোংরা-টোংরা করে চা করল। নিজেই খেয়ে দেখল বেশ কড়া। বোধ হয় বেশি পাতা দিয়ে ফেলেছে। আগে ব্রততীকে এনে দিল এক কাপ। ওদের তবু একবার করে চা পান হয়েছে। ব্রততী বেচারির একেবারেই হয়নি। ওর ফেলে যাওয়া চায়ের ওপর একটা পাতলা সর পড়েছে।

চা পেটে পড়লে হয়ত খানিকটা ধাতস্থ হবে।

সুমন্ত সেনগুপ্ত অরণ্যর থেকে কিছু জুনিয়র। চল্লিশের সামান্য নিচে না ওপরে, অরণ্যর জানা নেই। এ কোম্পানিতে মালিকই সব। তারপর আছেন ম্যানেজার স্বয়ং। টেকনিক্যাল স্টাফ-নিয়োগের ব্যাপারে তাকে ইন্টারভিউ-বোর্ডে ডাকা হয় না। পরামর্শ তো দূরের কথা। সুমন্তর বায়ো-ডেটা তার জানা নেই। ওর ব্যাপারে ম্যানেজার সাব যে রকম গোপনীয়তা রক্ষা করেন, মনে হয় সুমন্ত তাঁর নিজস্ব লকারে আনডিক্লেয়ার্ড সোনার বাঁট। শুনেছে প্রচণ্ড কোয়ালিফায়েড। কিন্তু এই ধরনের ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতা-কৌলীন্য থাকলে যুবকরা যে রকম ডোন্ট-কেয়ার টাইপের হয়, সুমন্ত আদৌ সে রকম ছিল না। এখন চিন্তা করলে মনে হচ্ছে একটু চুপচাপই। গম্ভীর। যে বিষণ্ণতার খোলসের মধ্যে কাজ ছাড়া অন্য সময়ে ও ডুবে থাকত তাকে অনায়াসেই অহঙ্কারের নির্মোক বলে ভুল হতে পারে। বউটি খুবই সুন্দরী। চোখ-মুখ-নাক-ফিগারের বিচারে। স্মার্ট। কনভেন্টে শিক্ষিত। এ ধরনের সফল যুবকরা যে রকমের বউ চায় বা পায়। একটিই ছেলে। শুনেছে বাইরে কোথাও পড়ে। চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। সেনগুপ্ত দম্পতি অরণ্যদের ওপরে থাকত বটে, কিন্তু থাকত নিঃশব্দে। সামাজিক মেলামেশায় ব্রততীর খুব একটা উৎসাহ ছিল না। একদিন ডেকে খাওয়াবার কথা অরণ্য বলে বলে হেরে গেছে। খালি তা না না না। ইদানীং আর বলা ছেড়ে দিয়েছিল। ও পক্ষ থেকেও ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু কখনও পাওয়া যায়নি। সুমন্তর একার সঙ্গে ক্লাবে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। একেবারে ফর্ম্যাল। ড্রিঙ্কস-এর গ্লাস হাতে ধরে খুব সাবধানে আলগোছে কথাবার্তা। এসব প্রাইভেট কনসার্নে— অনেকের মধ্যে একজন, জাস্ট একজন হয়ে থাকতে পারলে ভালো। অনেক ঘাটের জল খাওয়া হয়েছে। বয়স চল্লিশ পার। এখন যথাসম্ভব নিরিবিলিতে কলকাতার কাছাকাছি সে থাকতে চায়।

এক চুমুক খেয়ে ব্রততী বলল— 'আর খাবো না।'

—'খুব বাজে হয়েছে, না?'

—'সে জন্য নয়। কি রকম বিস্বাদ লাগছে।'

—' তা হলে একটু শরবৎ-টা করে খাও ব্রততী। কত বেলা হবে এসব মিটতে কে জানে। তোমার পেটের ব্যথা আরম্ভ হলে এর মধ্যে কে দেখবে?'

ব্রততী নিঃশব্দে উঠে গেল।

পারমিতাকে নিয়ে মিলের গাড়ি যখন এসে পৌঁছলো তখন বেলা খুব বেশি না

হলেও ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। এসব জায়গা খোলামেলা হওয়ার দরুন প্রকৃতির দাক্ষিণ্য যত, অত্যাচারও তত। প্রত্যেকটি ঋতুতে তার ভালোমন্দ সমেত হাড়ে হাড়ে চিনিয়ে ছাড়ে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। কদিন পরেই মহালয়া। এখনও বাতাসে আগুনের আঁচ। লাল ইটের কোয়ার্টার্সগুলো, লালচে রাস্তা, তার ওপর সূর্যের আগুনে রং— যত বেলা বাড়বে ততই মস্ত ফার্নেসের মতো দেখাবে।

অরণ্যদের বাড়ির সামনেটা এখন লোকে লোকারণ্য। খবর রটতে দেরি হয়নি। মিলের ওয়ার্কার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং ওপর মহলেরও অনেকে ভেঙে পড়েছে। কান্তিভাইয়ের গাড়ি চলে গেল, মিনিট পনের হল।

খর রোদ আর সেই পাঁচ মিশালি জনতার সামনে ওরা পারমিতাকে নামাল। মেরুন রঙের জরিপাড়, বুটিদার শাড়ি। ঠোঁটে ঘোর রঙের লিপস্টিক, মুখে চড়া না হলেও বেশ ভালোই প্রসাধন। রঙিন চশমায় চোখ ঢাকা। ওকে নাকি গানের ক্লাস থেকে তুলে আনা হয়েছে। সঙ্গে এসেছেন বাবা। বেশ রাশভারি গম্ভীর চেহারার মানুষ। বয়স হয়েছে। মাথায় টাক। ধারে ধারে গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা চুল। সিঁদুরে আমের মতো রঙ।

পারমিতা শূন্যের দিকে চেয়েছিল যেন। সম্বিত নেই। ব্রততী একটু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো ধরতেই ওর কাঁধে ঢলে পড়ল। ওর বাবা ধরে না ফেললে দুজনেই পড়ে যেত।

অরণ্যই এগিয়ে গিয়ে ম্যানেজারকে বলল কথাটা। মিসেস সেনগুপ্তকে যেন ডেডবডি দেখতে দেওয়া না হয়। শনাক্ত করার ব্যাপার তো আর নেই। যদি জোর না করে, দেখতে না দেওয়াই ভালো। ততক্ষণে মৃতদেহ কারেন্টমুক্ত এবং তারমুক্ত করা হয়ে গেছে। বিছানার ওপর শোয়ানো। গলা অবধি লম্বা চাদরে ঢাকা। ঘরের মধ্যে যা যা দ্রষ্টব্য মনে করছেন বোধ হয় নোট করে নিচ্ছেন দ্বারিকাবাবু। কনস্টেবল শর্মা এবং আরও দু একজন কনস্টেবলকে কি সব নির্দেশ দিলেন। অরণ্যর অনুরোধে রায়ই গিয়ে বললেন কথাটা। ভদ্রলোক অবশ্য মেনে নিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। পারমিতার বাবা যখন দৃঢ়স্বরে জানালেন এ অবস্থায় তাঁর মেয়েকে জেরা-টেরাও করা চলবে না, সেটাতেও কেন কে জানে আপত্তি তুললেন না। ভবিষ্যতে কথাবার্তার দিনক্ষণ ঠিক হল। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল সুমন্তর বিধবা দিদি আঁটপুরের দিকে কোন গ্রামে থাকেন। নিকট আত্মীয় বলতে তিনিই একমাত্র, জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে।

মৃতদেহ পুলিশের গাড়িতে মর্গে চলে গেল। মিসেস সেনগুপ্ত একবারও দেখতে চাইল না। মুখ ফেরাল না। কাঁদল না। পাথরের প্রতিমার মতো

ড্রইংরুমের একটা সোফায় বসে রইল সারাক্ষণ। বাড়ি খালি হয়ে যাওয়ামাত্র বাবার হাত ধরে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ব্রততীকে নিয়ে অরণ্য নিচে এলো যখন তখন বারোটা বেজে ক' মিনিট হয়েছে।

ব্রততী বলল— 'ওদের কিছু খেতে দেওয়া হয়নি এখনও পর্যন্ত।'

অরণ্য বলল— 'সৌম্য কি আর বুদ্ধি করে কিছু করে-টরে নেয়নি। ওর এসব অভ্যেস আছে। তোমার স্টকে তো সবই মজুত ?

ব্রততী ঘাড় নাড়ল।

'—সোম।' একটু আস্তে গলাতেই ডাকল অরণ্য। বাড়ির যা পরিস্থিতি তাতে হাঁকডাক করা ভালো দেখায় না। মনটাও বিশ্রী হয়ে আছে। সাড়া পেল না। বাথরুমের দরজা এখনও তেমনি বন্ধ। সে কি ! এখনও ওরা বাথরুম থেকেই বেরোয়নি ? ধাক্কা দিল অরণ্য বাথরুমের দরজায়—'শীর্ষ।'

দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। কেউ নেই। খোলাই ছিল কি সারাক্ষণ ? এ বাথরুমের দরজাটা একটু আঁট হয়েই বসে। সৌম্য শীর্ষ কেউ নেই। ব্রততী রান্নাঘরটাও দেখে এলো। কেউ কোথাও নেই। সৌম্য শীর্ষ চলে গেছে। ঠিক কখন, ওরা জানে না। কাউকে না বলেই গেছে।

আস্তিনের তলায়

জানলা দিয়ে এক পলক তাকিয়ে অরণ্য দেখল ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। সকলেই খুব হতচকিত। কিন্তু যে যত ওপর মহলের সে তত চুপচাপ। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অনেকের হাত মুখ নাড়া দেখতে পাওয়া গেল। বলছে কিছু। রামের মা সকালবেলায় দাঁতে দাঁত লেগে পড়েছিল, তারপর কাঁদতে আরম্ভ করে। এখন দেখা যাচ্ছে মাথায় জল থাবড়ে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কাজে লেগেছে। একটু আগেই অরণ্যদের ঘরে ন্যাতা দিচ্ছিল। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বড় ঘরের কত রকম কেলেঙ্কারি। ঘরে ন্যাতা দিতে দিতে, কি বাসন মাজতে মাজতে যতটা কানে তুলে নেওয়া যায়। পরে নিজেদের বস্তিতে গিয়ে ওরা পরস্পরের শোনা কথা এবং ধারণা বদলাবদলি করে নেবে। ওদের স্বামীরা, ছেলেরা বেশির ভাগই কান্তিভাই ভুলাভাইয়ের শ্রমিক। তারাও ফ্যাকটরি থেকে আমদানি করবে কিছু তথ্য। টুকরো জুড়ে জুড়ে তৈরি হবে চীফ এঞ্জিনিয়ার সুমন্ত সাহেবের আত্মহননের কোলাজ। বাইরে চট করে কিছু বলবে না। কিন্তু চিত্রটা ওদের মনোমত হলেই যখন তখন আলোচনা

করবে। মদ খেয়ে বউকে পেটাবার সময়ে কেউ কেউ হয়ত বলে ফেলবে সেনগুপ্ত সাহাবের অবস্থায় তাকে দেখতে চায় না কি তার বউ ? সময় মতো খানা দেবে না ; যখন তখন গোছা গোছা কাচের চুড়ি, বিলাইতি শাড়ি, রুপোর মটরদানা, তবু খুশ নেই। আড্ডা দিচ্ছে তো দিচ্ছেই !

একটা সিগারেট ধরিয়ে অরণ্য রান্নাঘর দিয়ে পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ব্রততী বসবার ঘরে, রামের মার সাহায্যে গোছগাছ করছে। পেছন দিকে বাগানটা সরু, লম্বাটে। ওদিকে বেশ কিছুটা দূরে শুরু হয়েছে পাশের বাড়ির সীমানা। ঘোষাল, তারপরে চৌধুরী, তারপর লাহিড়ি। যথেষ্ট ব্যবধান দুটো বাড়ির মাঝখানে। ডাকলেও চট করে শুনতে পাওয়া যাবে না। নিমগাছের ডালের ওপর কাকে বাসা করেছে। সুশ্রী দেখতে লাগছে জায়গাটা। দুটো নিমগাছ পরপর, মনে হয় একটা থেকেই ক্রমে দুটো হয়েছে। ডান দিকে ঈষৎ ফিরলে গাছ-গাছালির জাফরির মধ্যে দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তায় চিত্রবিচিত্র শাড়ির নক্‌শা দেখতে পেল অরণ্য। রায় মেমসাব আসছেন। দরজা বন্ধ করে এদিকে আসতে আসতে শুনতে পেল মিসেস রায় বলছেন—'কি ভয়ঙ্কর না ? ব্রততী একটু কফি খাওয়াতে পারিস ? আগে অবশ্য একটু জল দিস ! সকাল থেকে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিইনি। শুনে অবধি গা শিরশির করছে।'

রায় বললেন—'তোমার আসবার দরকারটাই বা কি ? মিন্টুরা একা রয়েছে ! চলে যাও না ! অন্য কোথাও এরকম ইনফর্ম্যাল হতে পারতে ?'

মিসেস বললেন—'আঃ থামো তো ! এ সময়ে আবার ফর্ম্যালিটি ! কি হরিবল্ ব্যাপার বলো তো ?'

ব্রততীকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন মিসেস রায়।

—'তোকে কিছু একটা করতে হবে না। আমি কফি বানিয়ে নিচ্ছি' ফস্ করে গ্যাস-লাইটারটা জ্বালালেন জয়ন্তী রায়।

ব্রততী মৃদুস্বরে বলল—'তোমার চোখ দিয়ে বড্ড জল পড়ছে জয়ন্তীদি। সরে এসো। আমি পারবো।'

কোমরের রুমাল তুলে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে জয়ন্তী বললেন—'তোর ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে, সব ব্যাপারেই আমাদের হেলপ্ করা উচিত। হেলপ্ কি আমি করি না ?'

—'তোমার গলাও ভীষণ ভেঙে গেছে জয়ন্তীদি, বাথরুমে যাবে ? একটু মুখ-টুখগুলো ধুয়ে এসো। এই দিক দিয়ে যাও'—ব্রততী মাঝের দরজাটা খুলে ধরল। 'ওদিকে ওরা সব বসে আছে।'

মিসেস রায় চলে যেতে ব্রততী চার কাপ কফি তৈরি করে ফেলল। ড্রয়িং রুমে যখন এলো। মুখটুখ ধুয়ে মিসেস রায়ও সেখানে বসে।

ম্যানেজার বলছেন—'এতদিনের চাকরি, এত ঘাটের জল খেয়েছি মুখার্জি এরকম ঘটনা আমি আর কখনও ফেস করিনি। রীতিমতো নার্ভ ফেল করছে আমার। কি কেলেঙ্কারি বলো তো ?'

অরণ্য বলল—'শুধু কেলেঙ্কারির দিকটাই দেখছেন পরমার্থদা, ট্রাজেডির দিকটাও দেখুন !'

জয়ন্তী বললেন—'মুখার্জি ঠিকই বলেছেন। আপনার কি মনে হয় ? আপনারা তো কাছাকাছি থেকে দেখেছেন ?'

অরণ্য বলল—'সত্যি কথা বলতে কি আমি এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আপনি যে তিমিরে আমিও সেই তিমিরে। ভদ্রলোক একটু রিজার্ভড টাইপের ছিল। তবে এমনিতে খুব ভদ্র। দেখা হলেই উইশ করত। বাইরে থেকে একটু দাম্ভিক মনে হলেও আসলে বোধহয় লাজুক ছিল। মিশুক স্বভাব নয় বলে উন্নাসিক মনে হত, তাই না ব্রততী ?'

ব্রততী অবসন্নভাবে ঘাড় নাড়ল।

রায় বললেন—'ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার মশাই। নিজের ফিল্ডে কোনদিন সেকেণ্ড হয়নি। রেকর্ড মার্কস। ইংলন্ড থেকে ডিগ্রি করে সেখানে কিছুদিন কাজ, তারপর চলে যায় মিড্‌ল ইস্ট। যে কোন কারণেই হোক ইন্ডানীং আর বাইরে ভালো লাগছিল না, দেশে চলে এসেছে। ইনটারভিউয়ের সময়ে আমাকে তো তাই বলল। আমি তো সত্যি কথা বলতে কি, সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতুম। এই বুঝি চলে গেল। এই বুঝি কেউ বেটার অফার দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে গেল। ইন্টারভিউয়ের সময়ে ওরা এক্সপার্ট এনেছিল বিলিমোরিয়াকে, বলে গেল—"হী ইজ মেন্ট ফর ফার বিগার থিংস।" কেন যে অ্যাট অল এরকম একটা কোয়ায়েট জায়গায় এলো, তাই-ই মাথায় আসত না আমার। তোমার কি মনে হয় মুখার্জি ?'

—'আমি আর নতুন কি বলবো ?' কফিটা শেষ করে, কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে অরণ্য বলল—'এই ক্যালিবারের ছেলেরা সাধারণত শহরে থাকতে চায়। বাইরে যেতে চায়। ও এলো বাইরে থেকে এই একমুঠো প্রাইভেট কনসার্নে। হয়ত খুব অ্যামবিশাস নয় পীস লাভিং। আমাদের এখানকার আবহাওয়া তো সব জায়গায় পাবে না। নয়ত দুবাই-এর ওরকম চ্যালেঞ্জিং ফ্যাবুলাসলি পেড জব ছেড়ে আসে ?'

—'আমাকে তো একটা কমপ্লিট ওভারহলিং-এর প্রোগ্রাম ধরিয়ে দিয়েছিল'—রায় হৃষ্ট গলায় বললেন—'খুব সম্ভব ধাতটা ছিল ক্রিয়েটিভ। কিছু একটা নিজের মনের মতো করে গড়তে চাইত। ছোট জায়গায় হয়ত সে সুযোগ পাবে বলে মনে করেছিল। আমি লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলুম—'ধীরে ধীরে সব হবে। আনহ্যাপি ফীল করার তো কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। অ্যান্ড আই থিংক হী ওয়জ কোয়াইট স্যাটিসফায়েড উইথ দা টার্মস অ্যান্ড কণ্ডিশনস্ উই অফার্ড হিম হিয়ার। আফটার অল মধ্যপ্রাচ্যের সুযোগ-সুবিধা তো আর ও এখানে এক্সপেক্ট করতে পারে না। তবে গভমেন্ট কনসার্নের থেকে জব স্যাটিসফ্যাকশন অনেক বেশি, কি বল, মুখার্জি ?'

অরণ্য বলল—'একশবার।'

মিসেস রায় এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দুপক্ষের কথাই শুনছিলেন আর পারলেন না। বলে উঠলেন—'আহা হা হা, কি বুদ্ধিই ছাই ধরো তোমরা তা-বড় তা-বড় এগজিকিউটিভরা। অফিস, ফ্যাক্টরি, প্রোজেক্ট ! এসব ব্যাপার সব সময়ে নারীঘটিত হয়, কথায় বলে শেরশে লা ফাম, মানে লুক ফর দা উওম্যান। আচ্ছা ব্রততী, তুই তো ক্লোজ-আপ দেখেছিস ? স্ত্রী কিরকম ছিল ? খোলসা করে বল, দেখি !'

পুবের রোদের প্রথম ঝাপটাটা এখন ওদের জানলা থেকে সরে গেছে। সেখানে ছায়া। জানলা দিয়ে দেখা যায় দূরে একটা গুলঞ্চ গাছের ঈষৎ গোলাপি ফুলের পাত্র শূন্যের দিকে উঁচু করে ধরা। একটু তফাতে পাঁচটা বটল পাম। ফ্যাক্টরি এলাকার এই বিন্দুটা ব্রততীর খুব প্রিয়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা আস্তে আস্তে আবিষ্ট হয়ে আসে। কথা বলবার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না। অনেক চেষ্টায় মুখ ফেরাল। ঘরের মধ্যে তার চোখে অন্তত অন্ধকার। অন্ধকারে ভাসছে কতকগুলো কৌতূহলী মুখ। এই মুহূর্তে মনে হয় শুধু অনাবশ্যক নয়, অপবিত্র কৌতূহল। সানগ্লাস পরে দেখার মতো ছায়ার দিকে চেয়ে বলল—'আমি তো বেশিদিন কাছ থেকে দেখিনি জয়ন্তীদি। চিনতুমই না। তুমিই তো চেনালে।'

জয়ন্তী রায় বললেন—'সরি ব্রততী। আমি ভেবেছিলুম তোদের ভালো প্রতিবেশী হবে। এভাবে ঝঞ্ঝাটে ফেলে যাবে ভাবিনি। যতটুকু দেখেছিস কি মনে হয় পারমিতা সেনগুপ্তকে ?'

অরণ্য ভালোই বুঝতে পারছিল জয়ন্তী রায় কোনদিকে যেতে চান। মেয়েরা সেই জাতের, যারা সিদ্ধান্তগুলোতে আগে পৌঁছে যায় তারপর তথ্য-টথ্য তার

সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়। ব্রততী বলল—'পারমিতাও ওঁর মতোই চুপচাপ ছিল, নিজের কাজ নিয়ে থাকতে ভালোবাসত বোধহয়।'

—'সেল্‌ফ্ সেন্টার্ড বলছো ?' রায় বললেন।

—'তা হয়ত নয়। এখানে তো এখনও ঠিক সেট্‌ল করেনি ওরা !'

—'বছর ঘুরতে চলল, এখনও যদি সেট্‌ল্ করতে না পেরে থাকে তো আর কবে করতো ? ইচ্ছে থাকলে তো ? উইক-এন্ডে বাড়ি নেই কেন ?' মিসেস রায় যেন ব্রততীকেই ধমকে উঠলেন।

—'ও তো কোনও উইক-এন্ডেই বাড়ি থাকে না ! গানের কোর্স নিচ্ছে। একদিন বলছিল এবার শেষ করবই। এক সময়ে বোধহয় গান-টান খুব করত। আঁকাজোকাও করত। ওদের ঘরে যে দেওদারের পেন্টিংটা আছে সেটা বোধহয় পারমিতারই করা।'

—'হুঁ আর্টিস্ট টেম্পারামেন্ট ! স্বাধীনতা-প্রিয়। মেজাজী। খাঁচার পাখি থাকে সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি থাকে বনে···মোটেই গুড কম্বিনেশন নয়···বুঝলে জয়ন্তী।'—মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন পরমার্থ।

জয়ন্তী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন—'আমার ওকে বরাবর খুব স্ট্যাগু-অফিশ্ লেগেছে। প্রথম দিন ফ্ল্যাট দেখাতে এলুম, কতক্ষণ একসঙ্গে থাকা, একবারও বললে না আমাকে পারমিতা বলুন, সারাক্ষণ বোকার মতো একটা হাঁটুর বয়সী মেয়েকে মিসেস সেনগুপ্ত মিসেস সেনগুপ্ত করে গেলুম। ক্লাবে-টলাবে তো কখনোই আসত না। রূপের দেমাকে মটমট করছে। এখনও বাড়িতে ভাল ডাকা হয়নি। ভেবেছিলুম একেবারে মিন্টুর বার্থডে-পার্টিতে ডাকব। কিন্তু ওসব ছাড়ো। সম্পর্ক কেমন ছিল ?'

ব্রততী হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আচ্ছা জয়ন্তীদি। আমি কি করে বলব বলো তো ? প্রথমত পরের ব্যাপারে আমার কৌতূহল বরাবরই কম। দ্বিতীয়ত ওরা এখানে থাকত কম। প্রতি শুক্রবার সেনগুপ্ত নিজে গাড়িতে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতেন। রবিবার বেশি রাত করে ফিরতেন দুজনে। শ্বশুরবাড়ি থেকে খেয়ে-টেয়ে আসতেন বোধহয়।

অরণ্য বলল—গত সপ্তাহেই তো সেনগুপ্ত রবিবার রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বলল—আপনাদের খুব কষ্ট দিচ্ছি, না ? পারমিতা সায় দিল—হ্যাঁ আপনাদের ওপর খুব অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম না না, মোটে তো সাড়ে দশটা, আমরা এতো তাড়াতাড়ি শুই না···'

পরমার্থ বললেন—'ওরা কি ডাকাত-টাকাতের মতো হল্লা করতে করতে

আসত ? তোমাদের ওপর অত্যাচারের প্রশ্ন উঠছে কেন ?'

অরণ্য হঠাৎ চুপ করে গেল। ব্রততী বলল—'ভীষণ ভুলো বলে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবিটা ওরা আমাদের কাছে রাখত। প্রায়ই ওদের দরকার হত সেটা।'

পরমার্থ বললেন—'আই সী।'

অরণ্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'বাইরে থেকে মিল অমিল কিছুই বিশেষ বোঝা যেত না বুঝেছেন পরমার্থদা। ব্রততী স্পেশ্যাল ডিশ-টিশ করলে অনেক সময়ে দিতে বলতুম। খুশি হত খুব। পারমিতা এসে পর দিন বলে যেত আপনার দৌলতে আমার কর্তার মুখটুখ বদলাচ্ছে একটু। আমার আবার রান্না-টান্না একেবারেই আসে না।'

অনাবশ্যক অনেক কথা বলে ফেলছে বলে মনে হল অরণ্যর। সে হঠাৎ ব্রেক-কষার মতো থেমে গেল।

জয়ন্তী চোখ বড় বড় করে বললেন—'আই সী। তা কিছু রিটার্ন-টিটার্ন দিত না ?'

—'ও তো স্বীকারই করত রান্নায় ওর তেমন ইনটারেস্ট নেই। একটা সুন্দর বাটিকের বুদ্ধ করে দিয়েছে। সেট অফ্ করবার মতো দেয়াল খালি করতে পারিনি এখনও—' আস্তে গলায় বলল ব্রততী।

রায় বললেন—'যা জানা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে নাথিং এগজ্যাক্টলি রং। তবে ফ্যাক্‌ট্‌স খুবই নন-কমিট্যাল। ইনভেস্টিগেশনে যা বেরোবে বেরোবে। আমাদের আর কি করার আছে ? খুব স্যাড কেস। কোম্পানির রেপুটেশনও সাফার করবে।'

ম্যানেজার দম্পতি দ্বিতীয় দফা কফি খেয়ে চলে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে। বাঁ-দিকের রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাক্টরির দিকের রাস্তা দিয়ে মার্কেটিং ম্যানেজার চৌধুরীকে আসতে দেখল অরণ্য। দূর থেকে হাত নাড়ল, অর্থাৎ ওদের বাড়িই আসছে। ভুরু কুঁচকে গেল অরণ্যর। আর কতজনের কত জিজ্ঞাসার জবাব তাদের দিতে হবে !

চৌধুরী ঢুকেই বলল—'ব্রততী কোস্ট ক্লিয়ার তো ? কর্তা-গিন্নি চলে গেছেন ? মোটা বাঘ ! রোগা বাঘ !' হাত পায়ের মজাদার ভঙ্গি করল চৌধুরী।

ব্রততী শুকনো মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বলল—'কি মনে হচ্ছে ?'

চৌধুরী বলল—'এখনও বুনো-বুনো আঁশটে-আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি বাবা। বেঘো-বেঘো গন্ধ ! তোমার ভাইয়েরা কি চলে গেল নাকি ?' ব্রততী বলল—'হ্যাঁ'।

—'সে কি, ওদের কদিন থেকে যাবার কথা ছিল না ? কখন গেল ? আই মীন কবে ?'

ব্রততী জবাব দিল না।

চৌধুরী বলল—'ইস আলাপ হল না। ব্রিলিয়ান্ট থিঙ্কার্স শুনেছি। আজকের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ভালো করে জমিয়ে আলাপ-সালাপ হবে। যদিও ব্রততী একবারও বলেনি। কি আর করা। এ ম্যাদামারা জায়গায় তো কথা বলবার মানুষ নেই ! সরি ব্রততী, অরণ্য মুখার্জিকে মীন করিনি।'

এই জন্যেই চৌধুরীকে একদম পছন্দ হয় না অরণ্যর। সব সময়ে ছ্যাবলামো। যখন-তখন যাকে তাকে এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বোধন ! প্রথমেই অবশ্য সাফ সাফ বলে দিয়েছিল—'আপনার গিন্নি আমার তিন বছরের জুনিয়র অরণ্যদা, আপনি-টাপনি বলছি না।' এখন দ্যাখো, বাড়ির ওপর একটা মানুষ আত্মঘাতী হয়েছে আর উনি এসে বলছেন—'তোমার ভাইয়েদের সঙ্গে আলাপ হল না।' ক্যাড একটা।

ভোরবেলার আজান

ট্রেনের আওয়াজের সঙ্গে অনেক সময় মনের আওয়াজ মিলে যায়। ট্রেনের গতির সঙ্গে মনের গতি। আবার উল্টোটাও হয়। ট্রেন যত দ্রুতগ, মন তত মন্থর। ট্রেন যত অস্থির, মন ব্যস্তানুপাতে ঠিক তত শান্ত। সৌম্যর মনের ভেতর দারুণ গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা জল খাওয়ার মতো একটা অবর্ণনীয় শান্ত শীতলতা ছড়িয়ে পড়ছিল। অনেক অনেক কাল পর বুঝি দেশে ফিরেছে সে। রাজারহাট বিষ্ণুপুর। মুখে-মুখে লোকে বলে বিষ্টুপুর। হাফ-প্যান্ট পরা ছোট্ট ছেলেটি হয়ে। মিত্তিরদের বারো কাঠা জুড়ে ভদ্রাসন, পাঁচিলে বট অশথ রীতিমত বৃক্ষ হয়ে উঠেছে। ফাটা রকে ছোট ছোট ব্যাঙ লাফিয়ে যাচ্ছে। রোগামতো একটি ছেলে আপনমনে কাঁইবিচি নিয়ে খেলে যাচ্ছে একা একা। ছোট্ট সৌম্য জিজ্ঞেস করল —'তোমার নাম কি ?' ভাব জমাবার ইচ্ছে। ছেলেটা মুখ ভেঙচে জবাব দিল, "'বাঁশবিহারী কঞ্চিচরণ বাঁকারি' বলেই দে ছুট দে ছুট, কিছুটা যাচ্ছে আর একবার করে থেমে মুখ ভেঙচে নিচ্ছে। বুকভরা রাগ আর অভিমান নিয়ে সৌম্য চলেছে খেজুরবাগান, ভোমরাবাগান, মিত্তিরপুকুর, ঢেঁকির বাগান··· । দুপুর গড়াতে গড়াতে খেজুরবাগানে জম্বুগাছের ছায়ায় ধু ধু বিকেল। কারা যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। ঢোল শহরৎ করে কারা যেন খুঁজে বেড়ায়। চারদিকে বাঁশঝাড়। সবুজ পানা দুহাতে সরিয়ে পুকুরের জলে ও ডুব দিয়েছে। স্নান শুধু

স্নান। অতল জলে হাত পা ছেড়ে শুধু ভেসে থাকা। কসরত নয়। শুধু ভেসে থাকা। ওপরে বাঁশের কঞ্চি ভেদ করে দেখা যাচ্ছে অথই আকাশ। চাঁদ ওঠেনি। তাই কালো। এ কৃষ্ণতা ভয়ের নয়, অমঙ্গলের নয়। শান্তির কৃষ্ণতা। গহন, গভীর শান্তি। ঠিক মাথার ওপর দুই পা ফাঁক করে, ধনুতে জ্যা রোপণ করে দাঁড়িয়ে আছে কালপুরুষ। সৌম্য ভেসে আছে। ভাসতে ভাসতে দেখছে। কালপুরুষ। কোমরে বক্র তলোয়ার, হাতে নিপুণ ধনুক। পায়ের কাছের লুব্ধক নক্ষত্রটা চোখের কাছে হওয়া উচিত ছিল। আকাশপুরুষের ওইখানে একটা ভুল হয়ে গেছে। তবে দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা নেই বলে কালপুরুষকে যেন কেউ অন্ধ না ভাবে। অতিমাত্রায় চক্ষুষ্মান, অতিমাত্রায় সতর্ক এবং বিবেকী।

সকালের রোদ চারদিকে ছড়াতে ছড়াতে চলেছে ট্রেন, ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে বৃক্ষলতার মায়াময় সংসার। ভেতরে যেন সবুজ অন্ধকার, ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। সামনের সীটে সেই সবুজ আঁধারের শয্যায় শুয়ে শীর্ষ ঘুমোচ্ছে। ট্রেনে উঠেই দুটো ট্রাংকুইলাইজার খাইয়ে দিতে হয়েছে ওকে। সারা রাত কাল ছটফট করেছে। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল। সেটাও ছিঁড়েখুঁড়ে গেল অতর্কিত উৎপাতে। ঘুমো, শীর্ষ ঘুমো। বহুদিন জেগে ছিলি, চরাচরে সবাই যখন তামসিক নিদ্রায় অভিভূত তখন একলা জেগেছিলি পাহারা দিবি বলে। সেই রাতজাগার কি দামটাই না দিয়েছিস ! ঘুমো শীর্ষ ঘুমো। স্বপ্ন দেখিসনি। বাস্তবের দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে থাক। ভাবতে কষ্ট হয়— শীর্ণ, অষ্টাবক্র, এই তুই একদিন দুই আড়াই জ্বর নিয়ে বিনা দ্বিধায় মাঠে নেমে গিয়েছিস শ্রাবণের উপর্যুরস্ত বাদল দিনে, শুধু ক্লাবের মানরক্ষার জন্য। ভাবতে অবাক লাগে তুই আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিস না, অথচ বাসে কোন মেয়ের অপমান দেখে অনায়াসে দুই ছুরিকাধারী মস্তানের মহড়া নিয়েছিলি। একা। পরে তারা খুঁজে খুঁজে পাড়ায় বদলা নিতে এলে সিনেমার স্টান্টম্যানদের মতো একেক জনকে একেক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলি। মহা শক্তিধর হয়েও নিজেকে অনায়াসে সমর্পণ করতে পারতিস ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কাছে। দাম দিয়েছিস। এখন ঘুমো। সময়টা অফিস-টাইম। দুএকটা স্টেশনে ভিড় বাড়তে কোনও কোনও যাত্রী হঠাৎ খেঁকিয়ে তেড়ে এসেছে— 'ভিড়ের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন মশাই ? দিনের বেলায় ?' সৌম্য তার পুরো দৈর্ঘ্য মেলে উঠে দাঁড়িয়েছে—'বসুন দাদা, বসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি।' হঠাৎ হাত-জোড় করে তেড়ে-আসা লোকটি বলে উঠেছে, —'ছি ছি, কিছু মনে করবেন না দাদা। ইস্‌স্‌স্ !'

নেহাত ঘুমোচ্ছে তাই। নইলে এসব কৃপার কথা বিষের ছোবল দিত শীর্ষর গায়ে। তাই-ই ও পারতপক্ষে কোথাও যেতে চায় না। পাবলিকের কৃপাও এক রকমের কাপর্ণ্যই! অন্তত ফলাফলের দিক থেকে।

সৌম্য বলে— 'বসে বসে তুই কূপমণ্ডুক হয়ে যাচ্ছিস রে শীর্ষ!'

বই থেকে মুখ তুলে শীর্ষ জবাব দেয়— 'তাহলে তোর এখনও ধারণা পৃথিবীটা কুয়োর চেয়ে বড়? এবং যেসব বিগ বসরা, পলিটিশিয়ানরা আজ হেলসিংকি, কাল প্রাগ পরশু মেলবোর্ন করে বেড়াচ্ছে, তারা সব বড় বড় থপথপে ব্যাঙ্ নয়?'

—'তাদের কথা বাদ দে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের বাইরের জগতটা দেখে না। কিন্তু ধর্, যারা অভিযাত্রী। অভিযাত্রী হতে হলে অ্যান্টার্কটিকা যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই!'

—'তারা সব ঘাসের ওপর একটি শিশিরবিন্দু দেখে বেড়ায় বলছিস? দুয়ার হতে অদূরে? পরিযায়ী পাখির মতো বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে? তবে শোন ছোড়দা আমাদের কাব্যালংকার টংকার গুলো সব বিলকুল ভুল তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিযায়ী পাখিও যে হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে করে তা কয়েকটা প্রাকৃতিক স্বভাবজ নিয়মকে মেনেই। তারাও দেখে, শোনে শুধু সেটুকুই, যেটুকু তাদের দরকার। খাল বিল ছাড়া কোথাও নামে না। ওদের নিজস্ব বিচরণক্ষেত্র ওইটুকুই। সে ভারতবর্ষেই হোক আর ভারখোয়ানস্কেই হোক। পৃথিবীটা কুয়োই। এবং আমরা সবাই, যে যত বড় বুলিই কপচাই না কেন, নিজেদের উদ্দেশ্যের বাইরের জগতটা একেবারেই দেখতে পাই না, সুতরাং মণ্ডুক ছাড়া কি?'

সৌম্য তবুও বলে— 'বাড়ি থেকে বেরোলে মনটাও ভালো লাগে, সেটা তো স্বীকার করবি?'

—'তাহলে তোর এই বেতসী-বাণিজ্যটা একটু বড় কর। একটা কনটেসা ফনটেসা কেন। তুই ড্রাইভ করবি, পাশে একজন মেকানিক কাম ড্রাইভার নিবি, সেকেন্ড ইন কমান্ড। পেছনের সীটে তোর ক্রীশ্চানের পুঁটলি থাকবে।'

—পুঁটলি সীটে থাকতে যাবে কেন? তার জন্য গাড়ির বুটে যথেষ্ট জায়গা থাকবে, পেছনের সীটে তুই আরাম করে শুয়ে বসে থাকবি।

—'আরে, আমার কথাই তো বলছি! আমিই তো তোর ক্রীশ্চানের পাপের বোঝা রে!'

শীর্ষ ঘুমোচ্ছে। ট্রেনের চলার ঝাঁপতালে ভীষণভাবে দুলছে ওর শরীর।

কোমরের ওপরে সৌম্যর বাঁ হাত। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, যাত্রীদের চোখে কৌতূহল আর কৃপার অযাচিত বরাভয় না দেখে ততক্ষণই ভালো। সৌম্য অপেক্ষায় থাকে কবে ও একেবারে ঘুমোবে। কবে ওর মুক্তি। দরদ, ভালোবাসা, সেবা, আত্মত্যাগ— সব দিলেও তো জীবন দেওয়া যায় না। ওর মতো সতর্ক, কর্মবীর সংযমী যুবককে যখন এমনি তামসিক নিদ্রায় কাল কাটাতে হচ্ছে তখন চিরঘুমই ভালো। আজকের দিনটা সুন্দর ছিল। সবুজ অন্ধকারের দিন। কালপুরুষের বিবেকী চোখের নিচে একটা সত্যিকার শান্তির দিন। যদি মার্সিকিলিং-এর ব্যবস্থা থাকত আইনে তাহলে সৌম্য আজ ওকে বলত—'কিরে, দোব না কি ডোজটা বাড়িয়ে?' শীর্ষ সম্মতি দিলে তাই হত। কিন্তু আইন বহু চেষ্টা করেও মানবমুখী হতে পারেনি। ব্যক্তিমানুষের বিচিত্র পরিস্থিতির সামনে সে আজও দ্বিধাগ্রস্ত। এবং শীর্ষর ছোড়দা, যে নাকি একদিন বলবান, বুদ্ধিমান, হৃদয়বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেখে মানব কল্যাণের নিজস্ব মন্ত্রে তাকে দীক্ষিত করেছিল, সে এখন প্রায় একেবারে চুপ। মাঝে মাঝে পরিযায়ী পাখি সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা শোনে। কিম্বা মাণ্ডুক্যোপনিষদ!

বর্ধমান থেকে একটু ভালো করে ব্রেকফাস্ট করে নিল সৌম্য। শীর্ষকে ডাকল। ঘুমচোখে সেদ্ধ ডিমে কামড় দিতে দিতে শীর্ষ জড়ানো গলায় বলল—'কি রে এইসব ফিশ-ফ্রাই-টাই ভালো তো? সত্যি সত্যি খাবো?'

সৌম্য হেসে বলল, 'উর্দিপরা রেলওয়ে ক্যানটিন থেকে আসছে, ধরে নেওয়া যাক ভালো।'

একজন যাত্রী বললেন, অন্তত পক্ষে গরম তো মশাই! খেয়ে নিন। ঠোঙার মধ্যে পোরাও রয়েছে যখন ধরে নিন মাছি-টাছি বসেনি।

শীর্ষ বলল, 'দিদিটা বোধহয় ফ্রিজ ভরে আয়োজন করে রেখেছিল। কপালে জুটল না! তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যায় সঙ্গে।'

খাওয়াতে-টাওয়াতে ভালোবাসে দিদিটা। অনেকদিন থেকে যেতেও বলছে। ফেরবার সময়ে কোম্পানির গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে বলেছিল অরণ্যদা। কোনও একটা গাড়িকে কলকাতার হেডআপিসে পাঠালেই হবে। ভেস্তে গেল। জীবন এমনিই। সৌম্যর ইচ্ছে ছিল ব্যাঙ্গালোর ঘুরে নাসায় যাবে, আর শীর্ষ? পাইলট না প্লেয়ার না প্রোফেসর বলা শক্ত। লেখাপড়ায় ভালো হলেও ওর ঝোঁকটা বহির্বিশ্বের দিকেই ছিল বরাবর। ওই পরিযায়ী পাখিদের মতোই।

শীর্ষকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে হাঁটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। ওকে বেঞ্চিতে

বসিয়ে একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করল আগে সৌম্য। ট্যাক্সিটাও সহজে পাওয়া গেল। খুব সম্ভব শীর্ষর জন্যই। কলকাতা শহরের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের যতটা নির্মম মনে করা হয়, ততটা নির্মম তারা নয়। স্ট্যান্ড রোডে পড়ে ট্যাক্সি বাঁ দিকে বাঁক নিচ্ছে দেখে শীর্ষ বলল, —'কি ব্যাপার ?'

সৌম্য বলল, 'দরকার আছে শ্রীর সঙ্গে।'

শ্রীকে দরকারি কথাটা বলে নিতে হবে। শীর্ষকে গাড়িতে বসিয়ে ভেতরে ঢুকবে। রোববার। আশা করা যায় সন্তোষ শ্রী দুজনেই থাকবে। সন্তোষ না থাকলে ওদের বাড়ি যাওয়াটা যথা সম্ভব এড়াতে চায় সৌম্য। সন্তোষ যারপরনাই ভালো ছেলে। ওদের কারুর মধ্যে কোনও লুকোছাপাও নেই। কেউ অবাস্তব রোম্যান্সের জগতে বাস করে না। তবু সাবধানের মার নেই। কার জীবনে কখন কিভাবে কীট প্রবেশ করে কে বলতে পারে! শ্রীময়ী খুব-ই অসাধারণ মেয়ে। এক দিদি ছাড়া আর কারুর মধ্যে ওইরকম কলঙ্কহীন শিখার ঔজ্জ্বল্য দেখেনি সৌম্য। সন্তোষ হচ্ছে পোষা বাঘ। শ্রীময়ীর এবং সৌম্যরও। কোথাও ভুলচুক না ঘটে যায়।

সুখের কথা, গলির মুখেই সন্তোষকে পাওয়া গেল। দু' হাত ভর্তি বাজার করে ফিরছে। মুখ বাড়িয়ে সৌম্য একটা ডাক দিল। ছুটতে ছুটতে দরজার মুখে থলিদুটো নামিয়ে সন্তোষ চিৎকার করে বলল— 'কি দাদা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম ? ওকি ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।'

সৌম্যর সমস্ত আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়ে সন্তোষ সাত তাড়াতাড়ি এসে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে শীর্ষকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে নিল। সৌম্যকে বলল 'হাত জোড়া, থলিদুটো তোলো দাদা।' তারপরেই চিৎকার জুড়ে দিল— 'কই বিশ্রী, কোথায় গেলে ? দেখে যাও কারা এসেছে।'

সৌম্য বলল— 'এমন করছো যেন মনে হচ্ছে জীবনে এই প্রথম এলুম!'

শ্রী বোধহয় রোববারের বাজারে কিছু পরিষ্কার-টরিষ্কার করছিল। নীল রঙের ধনেখালি শাড়ি কোমরে জড়িয়ে হাতে একটা ঝাড়ন নিয়ে বেরিয়ে এলো। ওর চুলে ধুলো, ময়লা, মুখে-হাতে শাড়িতে কালো কালো ছোপ।

শীর্ষকে দেখেই ওর মুখ হাসিতে ভরে গেল। শীর্ষরও। শীর্ষ বলল— 'কড়া করে এক কাপ লিকার খাওয়াও তো বাবলিদি! ঘুমটা কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। অথচ আমি ছাড়াতে চাইছি। এই ছোড়দাটা...'

সৌম্য চমকে ওর দিকে তাকাল। বলল, 'সকালে বললেই পারতিস, ওষুধটা

দিতুম না।'

শীর্ষ কেমন একরকম করে হাসল, বলল, 'কখন যে ঘুমোতে চাই, কখন যে জাগতে চাই...'

শ্রী সৌম্যর দিকে ফিরে বলল—'তুমিও চা তো ?'

সন্তোষ বলল—'দাদাও, আম্মো। এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হয় ?'

ঘুম-জড়ানো গলায় শীর্ষ বলল— 'হয় সন্তোষদা হয়, জানতি পারো না।'

সৌম্য আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ট্যাক্সিটা হুট করে ছেড়ে দিলে সন্তোষ এখন কোথায় পাই বলো তো ?'

সন্তোষ যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'রোববারের বাজারে তোমরা অন্য কোথাও ফিস্টি করবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পকেটে পুরে সন্তোষ মিত্তিরের ঠেকে এসেছো! ছি ছি! কাঁকড়া এনেছি দাদা। বড় বড় কাঁকড়া। ইয়া ইয়া দাঁড়া। দাঁড়ার মধ্যে মিষ্টি গোলাপি শাঁস। দুরমুশ পিটিয়ে রাঁধবে। উঁহু উঁহু শ্রী নয় শ্রী নয়। তা'লেই মাটি। রাঁধবেন যমুনা দেবী। মানে আমাদের রান্নার মা-জননীটি। দেখবে খেয়ে কি জিনিস!'

চা নিয়ে শ্রী এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ হাত সাবান দিয়ে ধুয়েছে। শাড়িটা বদলেছে। কপালে জল চিকচিক করছে, টেবিলের ওপর স্টীলের থালাটা নামিয়ে রেখে বলল, 'কি ব্যাপার সৌম্যদা ? তোমাদের এখন দিদির কাছে থাকার কথা না ?'

—'ছিলুম তো। ওখান থেকেই তো ফিরছি! আজকে তোদের বাড়িতে নামবার আমার আদৌ দরকার ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। সন্তোষটা গায়ের জোর দেখাল। তোকে শুধু জানাবার ছিল বৃহস্পতিবার আসাম যাচ্ছি। প্রতিবারের মতো এবারেও শীর্ষকে রেখে যাবো।'

সন্তোষ বলল, 'বউটিকে আগেই গছিয়েছো। এবার ভাইটিকেও গছাবার তালে আছো নাকি দাদা ?'

সৌম্য গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমার অসুবিধে আছে ?'

শ্রী চোরা কটাক্ষ হানল। সন্তোষ একেবারে শুয়ে পড়ে সৌম্যর পা জড়িয়ে ধরল— 'ওরে বাবা, বাণবিদ্ধ হয়ে গেলুম দাদা, মাপ করে দাও এবারের মতো। হিউমারটা আমার একটু জোয়ারের বেগে আসে, জানোই তো!

শ্রী বলল— 'ওটা হিউমার নয়, ভাঁড়ামি।'

সন্তোষ বলল, 'অসুবিধে কি ? আমার তো সুবিধেই। সন্ধে হলেই আমার শ্রীমানটি হোম-টাস্ক দেখিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করতে আসবে না।

বাদুড়ঝোলা হয়ে আপিস থেকে ফিরি, ওসব কি আর তখন ভালো লাগে ? শ্রীমানটি বোধহয় স্কুলের যাবতীয় কাজ মায় আঁকা-টাঁকা সবই শীর্ষকাকুকে দিয়ে…"

শ্রী বলল— 'এবার তোমার শীর্ষকে দিদির ওখানে রেখে যাওয়ার কথা ছিল না ? তাই-ই আমি অবাক হচ্ছি।'

সৌম্য চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'ওখানে একটা খুব আনফরচুনেট ঘটনা ঘটে গেল আজ সকালে। সকালে মানে রাত্তিরেই। সকালে জানা গেল ব্যাপারটা।'

শ্রী বলল— 'কি আবার হল ?'

সৌম্য বলল, 'অরণ্যদাদের ওপরের ফ্ল্যাটে থাকেন চীফ এঞ্জিনিয়ার। বছরখানেক মতো এসেছেন। তিনি হঠাৎ আত্মহত্যা করেছেন। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ইলেকট্রিক ওয়্যার জড়িয়ে জড়িয়ে।'

শীর্ষ হাই চাপা দিতে দিতে বলল— 'নাম সুমন্ত সেনগুপ্ত। স্যাড ব্যাপার।'

সন্তোষ বিষম খেয়ে বললে, 'কি ? কি বললে ?'

শ্রী এক মিনিট একদম চুপ করে রইল। তারপর সাদা শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের জলের না ঘামের ফোঁটাগুলো মুছতে মুছতে শুধু বলল 'ও।'

কাপগুলো স্টীলের থালার ওপর রেখে, থালাটা দু'হাতে তুলে নিল শ্রী, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'খুব ভালো করেছ চলে এসেছ। ওই পরিস্থিতিতে থাকতে ইচ্ছে না হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এসে গেছো যখন শীর্ষকে আর নিয়ে যেও না। ও আজ থেকেই থাক। তোমাদের আজ খুব ভালো খাওয়াবো। ভাগ্যক্রমে বাজারটা আজ ভালো করেছে। কি রে শীর্ষ, আপত্তি নেই তো ?'

শীর্ষ দুহাতের আঙুল জড়ো করে মন্দিরের চুড়ো করতে করতে বলল— 'শালগ্রামের ওঠাই বা কি আর বসাই বা কি ? অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন !'

পড়ন্ত রোদে

এক এক জনের বন্ধু-প্রাপ্তির ব্যাপারে ভাগ্য খুব উল্টোপাল্টা হয়। যাদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করেছে, মেলামেশা করার তাগিদ অনুভব করেছে, সেসব মানুষদের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অরণ্যের ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠেনি। ছোটবেলায়, মনে পড়লেও এখন হাসি পায়। যদিও তখন খুবই বেদনাদায়ক ছিল ব্যাপারটা, ওর হিরো ছিল রবীন্দ্রনাথ না, বিবেকানন্দ না, নেতাজি না,

কোনও ফিল্ম স্টার তো নয়ই—মামার বাড়ির পাড়ার নিতাইদা। দারুণ ব্যক্তিত্ব ছিল ছেলেটির। শুধু তার হেঁটে-যাওয়া, বাসে-ওঠা আর বাস থেকে নামা দেখবার জন্যেই অরণ্যের অর্ধেক দিন স্কুলে দেরি হয়ে যেত। নিতাইদা যখন বি-এসসি পাস করল, ক্লাস এইটের ছাত্র অরণ্যের মনে হল যেহেতু নিতাইদা বি-এসসিটা পাস করে ফেলেছে ওটা একটা অসম্ভব বীরত্বপূর্ণ ব্যাপার ওর দ্বারা সুতরাং সেটা আর হবে না। অথচ অরণ্যর সঙ্গে নিতাইদার 'কিরে কেমন আছিস ?'-এর বেশি আলাপ কোনদিন এগোয়নি। অরণ্যর পেছন-পেছন ঘুরত ওর সব চেয়ে অপছন্দের ছেলে হাবুল। এলেই বড়মামা রাগ করতেন। বখা ছেলে। পয়সা চুরি করে সিনেমা যায়। কিন্তু হাবুল বেচারি ক্রীতদাসের মতো ঠোঙায় করে তেলেভাজা আনত ওর জন্যে। একতলায় যে ঘরে অরণ্য পড়াশোনা করত, তার জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে তেলেভাজাগুলো গলিয়ে দিত। এমনি টান ! নেহাত কৃপাবশতই হাবুলের সঙ্গে মিশত অরণ্য। সুমন্ত সেনগুপ্তকে কেন কে জানে ভালো লেগে গিয়েছিল তার। অথচ ভালোলাগার কথা নয়। চুপচাপ প্রকৃতির। অমিশুক। উন্নাসিক, দাম্ভিক ভাবাটাই স্বাভাবিক। ব্রততী এখন অন্যরকম বললে কি হবে একেবারে পছন্দ করত না ভদ্রলোককে। মুখে বলেনি কোনদিন। কিন্তু অরণ্য এটা ভালোই বুঝত।

একজন পুরুষ সাধারণত আরেক জন পুরুষকে, বিশেষত সফল পুরুষকে পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু অরণ্য মনে মনে চুপি চুপি সুমন্ত সেনগুপ্তকে দারুণ পছন্দ করত। ও নিজে জানে মানুষ হিসেবে সত্যিই ও খুব বিচিত্র। ষষ্ঠ রিপুটা ওর মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত। এসব কালোনিতে সাধারণত মাৎসর্য জিনিসটা খুব ছোটখাটো ব্যাপারেও নখ দাঁত খিচিয়ে বার হয়ে আসে। চৌধুরীর বাগানে দারুণ টোম্যাটো ফলেছে। আমার বাগানে কেন অমন টোম্যাটো ফলল না, ঘোষালের শ্বশুরবাড়িতে দারুণ খাতির, দুদিন অন্তর শালীরা এসে খোঁজ নিয়ে যায়, আমার কেন অমন হল না—এই জাতীয় ব্যাপার এসব জায়গায় থাকেই। যতই আবহাওয়া ভালো হোক। এই ঈর্ষা তো অরণ্যর আসেই না, এর চেয়ে অনেক বড় মাপের প্রতিযোগিতাতেও হেরে গেলে ও সফল প্রতিদ্বন্দ্বীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রশংসার সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে পারে। লম্বা, মেদহীন, বলিষ্ঠ অথচ আশ্চর্য সুকুমার, প্রায় ভঙ্গুর মুখশ্রীর সুমন্ত সেনগুপ্ত পাশ দিয়ে চলে গেল। আফটার-শেভ লোশনের মৃদু সুগন্ধ হাওয়ায় ভাসছে বিদেশি ফুলের সৌরভের মতো, গাড়ির চাবিটা ডানহাতের টসটসে তর্জনীতে ঘোরাচ্ছে।

—'হ্যাললো মুখার্জী', মৃদুস্বরে অভিবাদন।

—'হ্যাললো সেনগুপ্ত'।

কেমন একটা সহজ সাবলীল আনন্দ ছিল এই সামান্য প্রাত্যহিক নিয়মরক্ষার সাক্ষাৎকারগুলোয়। বিশেষ কোনও কথাবার্তার আদানপ্রদান না হলেও একটা আন্তরিক যোগাযোগ যেন আপনা থেকেই হয়ে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে।

—'কি খবর ? চললেন ?' সেনগুপ্ত যেন সামান্য স্বরক্ষেপের মধ্যে দিয়ে, দৃষ্টিবিভঙ্গের মধ্য দিয়ে বলতে চাইল—'মুখার্জী, আপনি এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন কেন ? আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি। থাকুন আরেকটু থাকুন।'

সুইমিং পুল থেকে উঠছে সুমন্ত ক্লাবে, পিঠের ওপর মোটা একটা তোয়ালে,—অরণ্য নামতে যাচ্ছে।

—'এত দেরি করে এলেন ?' আরেকটু আগে এলে দুজনে একসঙ্গে সাঁতার কাটা যেত, সুমন্ত যেন সেটাই বলতে চাইত।

—আমি আপনার ভালো চাই। সর্ব অর্থে। সুমন্তর চাহনিতে এই অর্থটা অরণ্য পড়তে পারত স্পষ্ট, যেমন করে স্পষ্ট পড়তে পেরেছিল ব্রততীর মনের ভাষাও।

—'খুব কষ্ট আপনার না ? কি যে একটা দুঃসহ বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছেন।' গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের ওপর চাঁদের আলো পড়ে দুধ-সাগর হয়ে গেছে।

—'আপনি জানলেন কি করে ? জন্তু-জানোয়ারের ভাষা বুঝতে পারেন বুঝি ?'

—'একথা কেন বলছেন ?'

—'মানুষের কাছে ওরা তো বোবা···আমিও তো তাই।'

—'মানুষ ছাড়া আর কারুর কাছে মন খোলেন ? খুলতে পারেন তো খুলুন না ! পারলে কেঁদে ফেলুন, এখানে কেউ দেখতে আসবে না। আমি সরে যাচ্ছি।'

—'কি নিদারুণ শীত বুঝতে পারছেন না ? কান্না সব জমে বরফ হয়ে যাবে। আপনার কোথাও সরে গিয়ে কাজ নেই।'

—'তবে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, হাতটা ধরুন, এই দেবভূমিতে কিছুক্ষণ দুজনে বিচরণ করি। কেউ দূর থেকে দেখলে কিন্নরমিথুন ভাবতে পারে।'

বেড়াতে বেড়াতে কিছুক্ষণ পর অরণ্য চেয়ে দেখছিল ব্রততীর দিকে। আকাশটা জ্যোৎস্নায় সাদা, তারাগুলো সব অদৃশ্য—ব্রততীকে দেখাচ্ছে কালচে রঙের পাথরে গড়া একটা মূর্তির মতো। সাদা শাড়ির আঁচল জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে। কালো ওভারকোটের মধ্যে থেকে আধ ঘোমটার মতো পড়ে আছে

আঁচলের অংশ পিঠে। হাতে সাদা দস্তানা। মুখের শুধু আদল দেখা যায়, অবয়ব না। এমনিতেই রহস্যময়ী, সেদিন আরও। ওই পটভূমিতে। মানুষের সহ্যের অতীত কিছু যেন এই ভাস্কর্য গড়েছে। সুঠাম, সুন্দর কিন্তু অনমনীয়, কঠিন। শিলীভূত কোনও বেদনা। আস্তে আস্তে অরণ্য বলেছিল—'আমরা কিন্তু সাত পায়ের চেয়েও অনেক বেশি হেঁটে ফেলেছি।'

পরিবেশের যাদুতে ছাড়া অরণ্যর পক্ষে এতটা একবারে বলা সম্ভব ছিল না। ও নিজে মুখচোরা। উদ্দিষ্টা রমণী প্রায় নির্বাক।

ব্রততী বলেছিল—'অনেক রাত। ঠাণ্ডাও বেশ। চলুন ফিরে যাই।'

—'যেখানেই ফিরি, একসঙ্গেই ফিরব কিন্তু'—অরণ্য নরম কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলেছিল।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রততী—'আমি খুব গুরুভার অরণ্যদা, আপনি পারবেন না।'

—'পারতেই হবে। তুমি পারতে দেবে কিনা সেটাই বলো।'

মৃতের সম্মানে সোমবার ফ্যাক্টরি ছুটি। শেষকৃত্যের হাঙ্গামাও রয়েছে। রায় বলে দিয়েছেন—'মৃত্যু যেভাবেই হোক না কেন, কম্প্যানির উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে দাহকার্য হবে। বড় বড় সাদা ফুলের রীদ এসেছে। সাজানো খাট-টাট প্রস্তুত। খালি বডিই এখনও মর্গ থেকে এসে পৌঁছয়নি। সকালেই পার্ক সার্কাস থেকে ফোন এসেছিল। পারমিতা খুব অসুস্থ। তাকে দিয়ে কোনও কাজ করানো যাবে না। ছেলেকেও তার বোর্ডিং স্কুল থেকে আনানো হয়নি। পারমিতার বাবা অবশ্য আসছেন। অরণ্য ব্রেকফাস্ট করে একবার ম্যানেজারের বাড়ি গিয়েছিল। রায় বললেন—'আমাকে রীতিমতো দারড়ানি খেতে হল হে !'

—'কি রকম ?'

—'পারমিতার বাবাকে বলে ফেলেছিলুম ছেলে থাকতেও মুখাগ্নি করবে না···ব্যাপারটা ঠিক···। তা ভদ্রলোক বললেন কি জানো ? মৃতের চেয়ে জীবিতের প্রতি কর্তব্যটা নাকি অনেক জরুরি, সাত আট বছরের ছেলের পক্ষে এক্সপিরিয়েন্সটা নাকি ট্রম্যাটিক। উনি সেটা হতে দেবেন না।'

জয়ন্তী ছিলেন, বললেন—'তোমার যেমন সব তাতে সর্দারি। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শির ঘুম নেই।'

অরণ্য বাড়ি ফিরে ব্রততীকে বলল—'আজকের ব্যাপারটা চুকে যাক। তারপর তুমি একদিন মিসেস সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করো। আমিই নিয়ে যাবো

এখন।

ব্রততী বলল, —'না।'

—'সে কি ? কেন ?'

—'ভালো লাগে না।'

ভালো লাগা না লাগার ব্যাপার এটা নয় একথা ওকে কে বোঝাবে ? ভাবল, পরে ওর মেজাজ অন্যরকম হতেও পারে। তখন আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে। এমনিতে ব্রততী বেশ আছে। কিন্তু একবার বেঁকে বসলেই মুশকিল।

শবদেহ এসে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর সুমন্তর দিদি এসে পৌঁছলেন। খুবই অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি। শব আছে, দাহ করবার আইনসম্মত শাস্ত্রসম্মত লোক থেকেও নেই। ভদ্রমহিলা এসে ব্রততীদের ড্রয়িংরুমে গুম হয়ে বসে রইলেন। কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ, কথাবার্তার ধার দিয়েও গেলেন না। মহিলা মনে হয় সুমন্তর চেয়ে অনেক বড়। বেশ কঠিন ধাতের। ফর্সা রঙ মফঃস্বলে থাকলে রোদে জলে যেরকম একটা তামাটে ভাব আসে, সেই রকম। দোহারা শক্তপোক্ত চেহারা। সুমন্ত রীতিমত সুপুরুষ। মুখশ্রীতে একটা মেয়েলি কমনীয়তা আছে। দুধে-আলতা রঙ। মসৃণ গাল। এ ভদ্রমহিলার চেহারায় একটা গ্রাম্যতা-দোষ আছে। মুনিষ-টুনিষ চরান বোধহয়। একটা পুরুষালি রুক্ষতা। ব্রততী চা জলখাবার করে দিল, স্পর্শ করলেন না। কিছু বললেনও না। পারমিতার বাবা এসে পৌঁছতে বিনা ভূমিকায় উঠে গেলেন। উনি চলে গেলে ব্রততী বলল—'তোমার কি না গেলেই নয় ?'

—'সে কি ? এড়ানো সম্ভব নাকি ? আর এড়াতে যাবই বা কেন শুধু শুধু ?'

—'যেরকম দেরি হচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে যাবে মনে হয়।'

—'তোমার কি ভয়-টয় করবে ?'

—'না।'

—'তবে ?'

—'কিছু না।' ব্রততী নিশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাপারটাতে ব্রততী একটা সাঙ্ঘাতিক ধাক্কা খেয়েছে। অরণ্য নিজেও কম ধাক্কা খায়নি। সুমন্ত সেনগুপ্তর মতো এমন একজন সফল পুরুষ নিজেকে এমন নির্মমভাবে শেষ করে দেয় কেন ? মরবার ইচ্ছে হয়েছিল তো কয়েকটা স্লীপিং পিল খেয়ে নিলেও তো চুকে যেত। লোকটা কি পাগল ছিল ? ছেলেবেলায় পাড়ায় পাড়ায় হাপুখেলা নামে এক ধরনের বিচিত্র ব্যাপার দেখা যেত খুব। আত্মনির্যাতন থেকে মনোরঞ্জন। একটা লোক নিজেই নিজের পিঠে বেত মারতে

মারতে ছুটছে। সমস্ত পিঠটা কশাঘাতের দাগে কালশিটে পড়া। কি আনন্দ পেত এতে যারা ব্যাপারটা করত ? যারা দেখত ? সুমন্ত সেনগুপ্তও কি এই জাতের ? মনোবিকারের রোগী ?

স্থানীয় শ্মশান তিন সাড়ে তিন মাইল দূরে। চিতাটা জ্বলে ওঠবার পর সকলেই একটু এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। অরণ্য একটা সিগারেট ধরিয়ে ভিড় থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে আলাদা করে নিল। এতো হই-চই, কথাবার্তা ঠিক ভালো লাগছে না। চৌধুরী যথারীতি ভাঁড়ামি করছে। পরমার্থদা নিজে না করলেও, আপত্তি করছেন না কোনও। মাঠের মধ্যে গাছপালা ঝোপঝাড়, অরণ্য হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। একটা খড়ো ঘর। সেখান থেকে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলার ঈষৎ উত্তেজিত গলার স্বর ভেসে আসছে। পারমিতার বাবা আর সুমন্তর দিদি।

ভদ্রলোক বলছেন—'জিনিসপত্রগুলো কোম্পানির ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি প্যাক-ট্যাক করে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। খরচ যা লাগে দোব।'

দিদি বললেন—'জিনিসপত্রের কথা চিন্তা করতে এখন আপনার লজ্জা হয় না ? লজ্জা হওয়া উচিত !'

—'কার ? আপনার ? না আমার ?' পারমিতার বাবা গলায় বিদ্রূপ মিশিয়ে বললেন, —'জিনিসপত্র সবই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। খালি খাটটা নিতে পারব না। ওটা নিয়ে আপনারা যা খুশি করতে পারেন।'

—'ইচ্ছে করলে আমরা মামলা করতে পারি, জানেন ?'

পারমিতার বাবার গলায় হাসি—'খুকুর জিনিস খুকু নিয়ে যাবে তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে ? তাছাড়া এগুলো তো কিছুই না। অস্থাবর আরও যা সেসব তো কোনমতেই আপনাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারব না।'

মহিলা বললেন—'আপনার কাছে আমাদের দরুন অস্থাবর যা আছে তা-ও কি আদায় হবে কোনদিন ?—সত্যিই আপনার লজ্জা হওয়া উচিত !'

এরপর ওঁরা বোধহয় সিগারেটের গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেলেন। অরণ্যও সামনে এগিয়ে গিয়ে মামুলি কথাবার্তা আরম্ভ করে দিল। হয়ত ভাববেন আড়াল থেকে ইচ্ছে করে ওঁদের কথা শুনছিল অরণ্য।

জয়ন্তী রায় বেল বাজালেন না। সামনের পর্চ দিয়ে না ঢুকে ঘুরে জানলার কাছে গেলেন—'ব্রততী, ব্রততী !'

ব্রততী পেছনের বারান্দায় একলা দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে শুনতে পায়নি।

উদ্‌ভ্রান্ত দুপুরে বাতাসের ফিসফিসুনির মতো একটা ডাক—'ব্রততী ! ব্রততী !' প্রথমটা শিউরে উঠেছিল ব্রততী। তারপর বুঝতে পেরে পেছনের দরজা খুলে বাগানে বেরিয়ে গেল, বলল—'জয়ন্তীদি, আমি এদিকে।'

জয়ন্তী ঢুকতে ঢুকতে বললেন—'নট'স হ্যাড, অল'স স্পেন্ট··· মনে আছে ব্রততী !'

ব্রততী বলল—'লেডি ম্যাকবেথ ! ওসব এবার ভুলে যাবার সময় এসেছে জয়ন্তীদি।'

—'তবু তো ভুলতে পারি না ! সময়ে-অসময়ে মনে পড়ে···থাক গে, ভীষণ একা-একা লাগছিল। তোরও নিশ্চয়ই লাগছিল। তবে তুই তো সাহসিকা, তোর কথা আলাদা ! খাওয়া-দাওয়া করেছিস ?'

—'এবেলা আর হবে না বোধহয়।'

—'আচ্ছা ব্রততী···কাল কথায় কথায় কি একটা ডুপ্লিকেট চাবির কথা বলছিলি না !'

—'বলেছিলাম।'

—'সেটা কোথায় ?'

—'যেখানে থাকে, চাবির হুকে।'

—'এরকম একটা যাচ্ছে-তাই কাণ্ড ঘটে গেল, তার পরও তুই ও চাবি ওরকম প্রকাশ্য জায়গায় ঝুলিয়ে রেখেছিস ?'

—'কাল-পরশুর মধ্যে ও অফিসে জমা দিয়ে দেবার কথা বলছিল।'

—'তার আগে চল, তোতে-আমাতে একবার ওপরে ঘুরে আসি।'

ব্রততী চমকে উঠল। তারপর শান্ত স্বরে বল,—'না জয়ন্তীদি, অত কৌতূহল ভালো নয়।'

—'কৌতূহলের কি আছে ? নিজে প্ল্যান করে ফ্ল্যাটটা বানালাম, সাজালাম, এইভাবে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমি তো কাল ওখানে যাই-ই নি। আর পুলিসে সীল-টীলও তো করে দেয়নি !'

—'শুধু-শুধু বিপদ ডেকে আনছো জয়ন্তীদি।'

—'ঠিক আছে। তোকে যেতে হবে না। আমি একাই যাচ্ছি।'

—'সেটা তো আরোই অ্যালাউ করব না।'

—'তাহলে চল একবার প্লীজ।'

রান্নাঘরের হুক থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে ব্রততী বলল—'কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।'

সন্তর্পণে দুজনে লিভিং রুমের কার্পেটে পা দিলেন। জয়ন্তী বললেন—'ভালো জিনিসপত্র দিয়েছে পারমিতার বাবা। দামী কার্পেট রে। ফার্নিচার সব এ-ক্লাস। একমাত্র মেয়ে নাকি ? জানিস কিছু ?'

ব্রততী সংক্ষেপে বলল—'না।'

জানলা দরজা সব বন্ধ। ব্রততী একটা জানলা খুলতে যাচ্ছিল। জয়ন্তী বললেন—'করছিস কি ? পাখাটা চালিয়ে দিচ্ছি, আলোটা জ্বালাচ্ছি, তাতেই হবে।'

শোবার ঘরের দরজাটা খুলে জয়ন্তী বললেন—'কোনখানটায় ছিল রে ?' বলেই চুপ করে গেলেন। সুইচ বোর্ডের পাশে স্টীলের চেয়ারটা তখনো তেমনি বসানো ছিল। চেয়ারটার পাশে দাঁড়িয়ে জয়ন্তী কেঁদে ফেললেন। ব্রততী মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর ড্রেসিং-টেবলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন জয়ন্তী। ড্রয়ারগুলো খুললেন এক এক করে। ব্রততী বলল—'জয়ন্তীদি, প্লীজ এবার চলে এসো। কেউ জানতে পারলে কি মনে করবে বলো তো ?'

সজল চোখে জয়ন্তী রায় বললেন—'সুইসাইড নোটটা তুই দেখেছিলি ? এগজ্যাক্টলি কি লেখা ছিল রে তাতে ?'

ব্রততী দ্রুত সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বলল—'আমি দেখিনি। জানি না। আর আমি এই বদ্ধ ঘরে দাঁড়াতে পারছি না। আসবে তো এসো। নয়ত আমি তোমার বাড়িতে ফোন করে রামশরণকে জানিয়ে দিচ্ছি—তার মেমসাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

জয়ন্তী চোখ মুছতে মুছতে ব্রততীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—'এইসব বইয়ের আলমারি, লেখার টেবিলের ড্রয়ার সবই তো দেখছি চাবি-টাবি দেওয়া।'

—'তোমার ওসবে দরকার কি ? কি খুঁজছো ? সুইসাইড নোটের ডুপ্লিকেট ?'

—'ঠাট্টা করছিস ? ব্রততী ?'

—'ঠাট্টা নয়, জয়ন্তীদি, তোমার আচরণ এক এক সময়ে আমার অসহ্য মনে হয়। তুমি মনে করো জীবন-নাট্যের তুমি ট্রাজি-কমিক নায়িকা, তাছাড়া আবার ডিরেক্টরও। এই বদ্ধমূল ভুল ধারণার ফলে অন্যকে এবং নিজেকেও যে কখনও কখনও কী বিপাকে ফেল, সেটা বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত তোমার নেই। হোয়াই ডোন্ট য়ু লেট পীপ্‌ল অ্যালোন ! তুমি লেডি ম্যাকবেথ তো নয়ই, পোর্শিয়াও নও। ঝোঁকের মাথায় যা খুশি করো না।'

বলতে বলতে উত্তেজনায় ব্রততীর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। চোখে বিদ্যুৎ। জয়ন্তী বোধহয় কারও কাছ থেকে কখনও এতো তিরস্কৃত হননি। চোখ দিয়ে রীতিমতো ধারা নামল। হাত বাড়িয়ে ব্রততীর হাত ধরলেন। আস্তে আস্তে বললেন—'তুই তো আমার সবই জানিস—কি পেয়েছি জীবনে ?' ব্রততী একই রকম উত্তপ্ত স্বরে বলল—কি পাওনি, সেটাই বলো ? কোনও কোনও মানুষের হাত জীবন কখনও খালি রাখে না জয়ন্তীদি। কোন না কোন প্রাপ্তিতে ভরে রাখে, তুমি সেই বিরল ব্যক্তিদের অন্যতম। 'কিছু পাইনি' এই রোমান্টিক বেদনাবিলাস তোমাকে মানায় না। তোমার এই ধারণাটা, অ্যাটিচুডটা তুমি বদলে ফেলো। না হলে তোমারও শান্তি নেই। তোমার বন্ধু-বান্ধবদেরও শান্তি নেই।'

ব্রততীর হাত ধরে ধরে নামলেন জয়ন্তী রায়। ল্যাণ্ডিং পার হয়ে ব্রততী বলল—'চোখ মুছে নাও ভালো করে, লোকজন কেউ এসে পড়তে পারে।'

ব্রততীর শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন জয়ন্তী রায়। ব্রততী নরম গলায় বলল—'তুমি ঘুমোও, কেউ এখন বিরক্ত করবে না। মিমি-মিন্টুর আসার সময় হলে আমি জাগিয়ে দোব।'

জয়ন্তী ঘুমিয়ে পড়লে, একটা ম্যাগাজিন হাতে করে বসবার ঘরের সোফায় গিয়ে বসল ব্রততী। সামনেই জানলা। ওখান দিয়ে দেখা যায় রক্তাভ গুলঞ্চের ঊর্ধ্বমুখ গুচ্ছ গুচ্ছ অঞ্জলি, বটল পামের সাদা দণ্ডের ওপর সবুজ পালক। হাতে পত্রিকা কিন্তু ওই দৃশ্যটার দিকে তাকিয়েই তন্ময় হয়ে রইল ব্রততী।

উদ্যত সঙ্গিন

আসাম থেকে ফিরে সাধারণত সৌম্য সোজা সন্তোষদের বাড়ি যায় না। নিজেদের পদ্মপুকুরের বাড়ি গিয়ে আগে বদ্ধ ঘর-টর খুলে ঝাড়পোঁছ করে এবং করায়। বাসযোগ্য হতে বাড়িটা দুতিন দিন সময় নেয়। বড় বাজার থেকে কারিগর ধরার ব্যাপার থাকে তাছাড়া। সৌম্যর ব্যবসা এখনও মাঝারি পর্যায়ে আছে। বাঁধা কারিগর রাখলে লোকসান হয়ে যায় খুব। কাজেই অর্ডার অনুযায়ী কারিগর ধরতে হয় ওকে। জিনিসটাতে ওর মানসিক সায় নেই। যত শিগগির সম্ভব একটা বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা করে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ও। কিন্তু আপাতত উপায় নেই। এই সমস্ত ঘোরাঘুরির কাজগুলো ও শীর্ষ আসবার আগেই সেরে ফেলতে চায়।

এবার কিন্তু ও সোজা সন্তোষদের ওখানে চলে গেল। হেমন্তের বিকেল। ঝট করে আলো চলে যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ধোঁয়াশা দল পাকাতে শুরু করেছে

এরই মধ্যে। সময়টা খুব বাজে। হাওয়া ভারি হয়ে গেছে অথচ শীতের দেখা নেই। শ্রী বাড়ি নেই। সন্তোষও না। শীর্ষই আগলাচ্ছিল ওদের ছেলেকে। কিংবা উল্টো করেও বলা যায়। নির্বাণই সামলাচ্ছিল শীর্ষকাকুকে। নির্বাণই দরজা খুলে দিল। ভালো বলতে হবে ছেলেটাকে। সারা বিকেল, সারা সন্ধে, বাইরে খেলাধুলোর লোভ সামলে একটা পঙ্গু মানুষকে সঙ্গ দিচ্ছে, বাবা-মা বলে গেছে বলে। দরজাটা খুলে দিয়েই নির্বাণ দৌড়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। সৌম্যকে দেখে শীর্ষও কোনও কথা বলল না। চোখ তুলে তাকাল শুধু একবার। দাবা খেলছে দুজনে। খেলায় মগ্ন একেবারে। সুটকেসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজল সৌম্য। যমুনাদিদিও নেই মনে হচ্ছে। নইলে এই সময়ে এক কাপ চা পেলে ভালো হত।

মাঝে মাঝে চোখ খুলে ওদের খেলা দেখছিল সৌম্য। অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে নির্বাণের ঠোঁটদুটো গোল পয়সার মতো হয়ে গেছে। চোখদুটো বোর্ডের ওপর থেকে সরছে না। শীর্ষর মুখ শান্ত, আত্মমগ্ন। দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই সৌম্য বুঝতে পারল নির্বাণের ব্যাপারটা। আসলে কিন্তু নির্বাণ কোনও আত্মত্যাগ করছে না। এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে আত্মত্যাগটা আসা স্বাভাবিকও নয়। উপরন্তু এই বয়সের বালকদের কিছু কিছু হিরো থাকে বড়দের মধ্যে। নির্বাণ শীর্ষর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কোনও কর্তব্যবোধে না, শীর্ষ ওর কাছে ফুটবল খেলার মাঠের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় বলে। নতুন করে হঠাৎ সৌম্য অনুভব করল শীর্ষর সেই চৌম্বক শক্তি। ছোট থেকেই ওর প্রচুর ভক্তমণ্ডলী ছিল, তারা ওর কথায় সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকত। শীর্ষ নিজে যা করত, নির্ভুলভাবে সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত আবেগ দিয়ে করত। কত দিকে, কত ভাবে যে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারত ও। পারত কেন, এখনও পারে, পারছে। কালিদাস শেষ করে ফেলেছে। এখন ভাস ধরেছে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে। অরিজিন্যাল ইলিয়াড ওডিসি পড়বে বলে গ্রীক শিখছে। এখানে আবার শ্রীর ছেলের সঙ্গে ওর একটা আলাদা জগত। শীর্ষ এখানে খুব সহজে ওর প্রাপ্তবয়স্কতা থেকে কয়েক ধাপ নেমে আসে, নির্বাণও তার বালকত্ব থেকে উঠে যায় কয়েক ধাপ তার হিরোর সঙ্গে মিলতে। এই জিনিসটা যদি আর কিছুদিন চলতে থাকে তাহলে নির্বাণ খুব শ্লাঘ্য একটা কৈশোরে পৌঁছে যাবে তাড়াতাড়ি। সমবয়সীদের সঙ্গ ওর কাছে খুব অতৃপ্তিকর লাগবে। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ও বড় কিছু খুঁজতে থাকবে। নিজেকে সমর্পণ করা যায় এমন কিছু।

শীর্ষ বলল, 'তুই এবারও মাত্ হয়ে গেলি নির্বাণ। এরকম করলে আর

গ্র্যান্ডমাস্টার হবি কি করে ?'

নির্বাণ বলল— 'হেরে গেছি, গেছি। তুমি কিন্তু খবর্দার ইচ্ছে করে আমায় জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না কালকের মতো।'

'ঠিক আছে' শীর্ষ বলল, 'তবে,তোর দু চারটে চালের ভুল ধরিয়ে না দিলে শিখতে পারবি না।'

—'তাহলে প্রথমে একটা ট্রায়াল গেম হবে। সেটাতে তুমি সব ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে। তারপর আসল খেলা। তখন কিন্তু স্পিকটি নট।'

'মায়ের কাছ থেকে পাস করিয়ে নিস এটা। স্কুলের টাস্কগুলো সব পড়ে থাকবে তো !' —শীর্ষ হাসিমুখে বলল, তারপর সৌম্যর দিকে তাকাল 'তুই যেন শিডিউল্ড টাইমের আগেই ফিরেছিস মনে হচ্ছে ?'

'প্লেনে এলুম'— সৌম্য ছোট্ট করে বলল। শ্রী আর সন্তোষের ফেরার শব্দ শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে ও। সেটা প্রকাশও করতে পারছে না।

যমুনাদি এসে গিয়েছিল। এসে বলল, 'চায়ের সঙ্গে আর কি খাবেন সৌম্যদা !'

—'কিছু না স্রেফ চা।'

দরজার আওয়াজ পাওয়া গেল এতক্ষণে। সৌম্য উঠে গেল। সন্তোষরা ফিরেছে। সৌম্য দরজা খুলে দিতে অবাক হয়ে গেল। সৌম্য বলল, 'দরকারি কথা আছে।'

'সে তো বুঝতেই পারছি' শ্রী বলল, 'সিনেমা দেখে মাথা ধরে গেছে। চা খাওয়া পর্যন্ত কথাটা অপেক্ষা করতে পারবে ?'

'না। কারণ কথাটা দরজার ওদিকে অপেক্ষা করে রয়েছে। ওদিকে তাকাসনি শ্রী। সন্তোষ, আধখানা ভেতরে আধখানা বাইরে হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতরে এসো। খিল তুলে দিই।'

'ব্যাপারখানা কি বলো তো ?' সন্তোষ ফিসফিসে গলায় অবাক হয়ে বলল।

'আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি তখন থেকে। নিজেকে। এবার তোমাদের জিজ্ঞেস করব।'

শ্রী বলল, 'রান্নাঘরে যমুনাদি, বসবার ঘরে শীর্ষরা রয়েছে। চলো শোবার ঘরে যাই।'

সন্তোষ বলল, 'আগে শীর্ষকাকুকে দেখা দিয়ে আসি।' গলা চড়িয়ে বলল, 'কই হে শীর্ষকাকু ! খেলার রেজাল্ট কি ?'

তিনজনে ঘরে ঢুকে দেখল শীর্ষ তক্তাপোশের ওপর পিঠে তাকিয়া নিয়ে চোখ

বুজে কাত হয়ে আছে। পাশে দাবা-বোর্ড মুড়ে রাখা। নির্বাণ শীর্ষর আঙুল টেনে দিচ্ছে।

সন্তোষ বলল, 'অ্যাই, অত জোরে না।'

নির্বাণ বলল, 'কি করবো ? শীর্ষকাকুর আঙুলে যে শব্দই হয় না।'

'তাই বলে ওরকম গায়ের জোরে টিপবি ?' শ্রী ধমকে উঠল।

চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই শীর্ষ বলল, 'আঃ। আমাদের বিরক্ত করছো কেন ? খেলায় হারলে নির্বাণ আমার আঙুল মটকে দেবে কথা ছিল। তোমরা যে কনফারেন্সে যাচ্ছিলে যাও না, ছোড়দা অনেকক্ষণ ধরে টেনস্‌ড্‌ হয়ে আছে।'

ওরা তিনজন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কি অদ্ভুত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এই ছেলেটির ! একেও ফাঁদে পড়তে হয় !

শোবার ঘরে ঢুকে খাটের ওপর বসল সন্তোষ। সৌম্যকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে শ্রী বলল, 'তাড়াতাড়ি বলো সৌম্যদা ব্যাপারটা কি। এখুনি যমুনাদি এসে পড়বে। ওর আবার সব তাতেই ভীষণ কৌতূহল।'

'এখান থেকে আসাম এবং আসাম থেকে কলকাতা জিরো জিরো সেভ্‌ন্ আমার পেছন পেছন ঘুরেছে। অ্যাভয়েড করবার জন্য প্লেন ধরলুম, তা-ও দেখি ঠিক তোদের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।'

শ্রী বলল, 'তুমি আবার অ্যাভয়েড করবার জন্য প্লেন ধরতে গেলে কেন ?'

—'জাস্ট টু সি যে ব্যাটা খসে কিনা।'

শ্রী বিরক্ত হয়ে বলল, 'সৌম্যদা, অনেক বুদ্ধিও ধরো, সাহসও আছে স্বীকার করছি। কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে বড্ড বোকামি করে ফ্যালো। এটা ঠিক করোনি। তোমার কি ট্রেনের রিটার্ন টিকিট করা ছিল ?'

'ছিল। তবে কনফার্মেশন পেতে বড্ড দেরি হচ্ছিল। জানিসই তো, কোথাও প্রয়োজনের বেশি সময় কাটাবার আমার জো নেই। ধর, ধৈর্য হারিয়েই যদি প্লেনে এসে থাকি !'

সন্তোষের মুখটা বদলে যাচ্ছিল। সে বাঘই, তবে মানুষ-খেকো নয়। নেহাত প্রয়োজন না হলে সংহার-মূর্তি ধরে না। চাপা গরগরে গলায় হাতের আস্তিন গুটোতে গুটোতে বলল, 'দ্বিতীয়বার যদি ও তোমাদের ট্রাবল দেয়, সন্তোষ মিত্তির কিন্তু আর ছেড়ে দেবে না। লাশ পড়ে যাবে। ফাইন্যাল বলে দিলুম।'

উদ্বিগ্ন চোখে শ্রী ওর দিকে চাইল, 'তুমি আবার সঙ্গে সঙ্গে আস্তিন গুটোতে লাগলে কেন ? দোহাই তোমার, র‍্যাশ কথাবার্তা বলো না। আমার হয়েছে জ্বালা।'

সন্তোষ বলল, 'ছেড়ে দেবে তাই বলে ? কোথায় "মার মার শত্রু মার" বলে রুখে দাঁড়াবে', এ যে দেখছি জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে গেছো ?'

সৌম্য একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিল, সেটা টিপে ছাইদানে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া না দেওয়ার নয় সন্তোষ ! আমি ভাবছি কেন ! কেনটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। আমাদের তো কোন কিছুর সঙ্গে সংশ্রব নেই ! তবে কেন ?'

সন্তোষ শক্ত মুখে বলল, 'এই 'কেন'র কোনও উত্তর থাকে না সৌম্যদা। একবার ওরা যাকে ধরে তার শেষ না দেখে ছাড়া বোধয় ওদের কোষ্ঠীতে লেখে না।'

'শেষের আর বাকি কি আছে ?' অন্যমনস্ক হয়ে সৌম্য বলল।

নির্বাণ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, 'মা, বাবা, সৌম্যদা, শীর্ষকাকু তোমাদের ডাকছে।' মা-বাবার দেখাদেখি নির্বাণও সৌম্যকে সৌম্যদা বলে।

সন্তোষ বলল, 'ঠিকই। ওকে আর সাসপেন্সে রাখা ঠিক হবে না।'

শ্রী তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমরা যেন আবার ওকে কিছু বলতে যেও না।' সন্তোষ সৌম্য দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'পাগল হয়েছো ?'

বিকেল মরে গেছে অনেকক্ষণ। বাড়ি বাড়ি সন্ধের শাঁখ বাজা শেষ। ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে শ্রী বলল, 'তোমরা যাও, আলোগুলো জ্বালতে জ্বালতে যাও। আমি একটু ধুনো দেখাই ঘরে ঘরে। বড্ড মশা হয়েছে।' শ্রী আলনা থেকে আটপৌরে ছাপা শাড়ি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সন্তোষ উঠতে উঠতে বলল, 'আজ আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই সৌম্যদা।'

'কেন ?' সৌম্য বলল, 'জিরো জিরো সেভেনের ভয়ে ?'

'তা নয়। এখন ক্লান্ত হয়ে এসে ঝাড়া পোঁছা, ঘরটর খুলে সে তো বিস্তর কাজ !'

'ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি গিয়েই পেছনের গলি থেকে লাটুকে ডেকে আনি। তালা-টালা খুলে, জানলা টালনা খুলতে থাকি ; ইতিমধ্যে ও ঝাড়পোঁছ করে নেয়। আজ গিয়ে সব ঘর খুলবো না তো ! আজ না গেলে কাল সকালে অসুবিধে হবে। মাল এসে পড়বে শিগগিরই। অনেক কাজ ভাই।'

দালানের আলো জ্বেলে ওরা বৈঠকখানায় গেল। ঘর অন্ধকার। তক্তাপোশের ওপর শীর্ষর আধ-শোয়া চেহারার আদল দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বালতে বারণ করল।

সন্তোষ বলল, 'খোকন গেল কোথায় ?'

—'বন্ধুর বাড়ি থেকে কি বই আনতে গেল। এখুনি আসছে,' শীর্ষ গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'ছোড়দা একজন পুরনো বন্ধু আমাদের জানলার উল্টোদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইমাত্র গাঢাকা দিল। অবশ্যই স্ববেশে আসেনি। দাড়ি গোঁফে মুখ প্রায় ঢাকা, আধময়লা জামাকাপড়। একটা চারমিনার ধরিয়ে ছিল। গন্ধটা আমাকে গাইড করল। চারমিনারের সঙ্গে এমন একটা অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। আমি মুখ তুলে তাকাতে যেন সিগারেট ধরাবার জন্যে থেমেছিল, এমনি একটা ভাব করে ওদিকে চলে গেল। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেওয়া ওর পক্ষে শক্ত।'

সৌম্য নিচু গলায় বলল, 'তোকে নয়, ও শ্যাডো করছে আমাকে। সেই গৌহাটি থেকে। ঘাবড়াস না। এটা হয়ত রুটিন কাজের মধ্যেই পড়ে ওদের।'

শীর্ষ বলল, 'না। ঘাবড়াবার আর কি আছে, খাঁড়ার ঘা'টা শুধু দেওয়া বাকি। তবে তুই যদি বলিস গৌহাটি থেকে ও তোকে শ্যাডো করতে করতে আসছে, সেটাকে রুটিন কাজ বলে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তবে আমি ঘাবড়াচ্ছি না।'

সন্তোষ বলল, 'আমি খোঁজখবর নিচ্ছি শীর্ষকাকু, তুই ভাবিস না।'

সন্তোষের গলায় কি ছিল, শীর্ষ ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি বোধহয় ওর 'কেন'টা অনুমান করতে পারছি।'

'পারছিস ?' সৌম্য আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার বল তো ?'

শীর্ষ নরম সুরে বলল, 'জানি। কিন্তু বলব না ছোড়দা। মানে এখনই না। তবে তোদের মাথা ঘামাতে হবে না। আমি ম্যানেজ করব ঠিক।'

'তুই ম্যানেজ করবি,' সন্তোষ অবাক হয়ে বলল।

শীর্ষ দৃঢ় গলায় জবাব দিল, 'এখনও বেঁচে আছি সন্তোষদা। মরব মরব করেও মরে তো যাইনি। ম্যানেজ আমি করবই। ঘরের আলোটা জ্বেলেই দাও সন্তোষদা। তখন বাবলিদিকে বারণ করেছিলুম, রাস্তায় ওর গতিবিধি দেখব বলে। এখন যদি ধারেকাছে থাকেও, দেখুক। ওকে দেখতে দাও শীর্ষ চক্রবর্তী ভাবছে, এখনও ভাবতে পারে। তোমরা আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

সৌম্য বলল, 'আমি বেশিক্ষণ আর দাঁড়াব না। বাড়ি গিয়ে গোছগাছ করে নিই। তোকে কাল বিকেলের দিকে নিয়ে যাব। কি, ঠিক আছে তো ?'

শীর্ষ বলল, 'নিশ্চয়ই।'

বাড়ির তালা খুলতে খুলতে সৌম্য তখনও কেনটা ভাবছিল। পাশে দাঁড়িয়ে লাটু। সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছে সেই মোড় থেকে।

'আজ আমায় একটা আইসক্রিম খাওয়াবেন কাকু ? খাওয়ান না ! খাওয়াতেই হবে !' সৌম্য নিজের ভাবনায় এতই মগ্ন ছিল যে প্রথমটা শুনতে পায়নি। কিছু একটা বলছে ছেলেটা এইটুকু শুধু বুঝতে পারছিল। কিন্তু কি যে, তা ওর মাথায় ঢুকছিল না। ও ভাবছিল মুনশিজীর কাঠগোলা থেকে ও প্রথম দেখতে পায় জিরো জিরো সেভেনকে। এমনিতেই লোকটার একটু পাহাড়ি পাহাড়ি চেহারা। অসমিয়াদের মধ্যে দিব্যি মিশে গিয়েছিল। দেখে ও এতো অবাক হয়ে গিয়েছিল যে চোখ সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল। অন্যমনস্ক গলায় সৌম্য বলল, 'খাওয়াবো রে খাওয়াবো ! এই রাতে কেন ? কাল সকালে কি বিকেলে খাস। এখন পাবিই বা কোথায় !'

দ্বিতীয়বার লোকটাকে ও দেখে স্ট্র্যান্ড রোডে। স্ট্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাচ্ছিল ও। পান খাচ্ছিল লোকটা দোকানে। আয়নায় ছায়া পড়েছিল।

লাট্টু বলল, 'আইসক্রিমঅলা যাচ্ছে বলেই তো বলছি ! এই আইসক্রিম ! অ্যাই !'

সৌম্যর সম্মতির জন্য অপেক্ষা করল না লাট্টু। পকেট হাতড়ে পয়সা নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। একটু পরেই সবুজ একটা লাঠি নিয়ে ফিরল। টুপটুপ করে জল ঝরে পড়ছে। এই জিনিসের জন্যই এতক্ষণ ধরে বায়না নিয়েছে ছেলেটা ? উচ্চাশা এতো কম ? সৌম্য বলল, 'কেন রে লাট্টু, খাবি যদি ভালো কিছু নিলি না কেন ? কাপ-টাপ ? তোর বরফের জল তো সব জামা আর রাস্তাতেই খেল দেখছি !'

ঘ্যানঘেনে গলায় লাট্টু বলল, 'কি করব ? ওই অলাটার কাছে যে আর কিছু ছিল না ! খালি সবুজ লাঠি আর কমলালেবু লাঠি।'

হঠাৎ চমকে উঠল সৌম্য। —'চাই আইসক্রিম— গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে চলে যাচ্ছে ফেরিঅলা। কানে ডাকটা খট করে লাগল। সন্ধের পর, রাত এখন প্রায় আটটা হল··· এরকম ভাবে ডাকতে ডাকতে ওরা যায় না। অন্তত এ পাড়ায়। ঘোর গ্রীষ্ম হলেও বা কথা ছিল। তাছাড়া এ পাড়ার আইসক্রিম অলাদের ডাকগুলোও চেনা হয়ে গেছে। কেমন বেসুর লাগছে সব। তেমন করে নূপুর বলছে না। আইসক্রিমঅলাটা একেবারে চোখের বাইরে চলে যাবার পর আশ্চর্য হয়ে ভাবল সৌম্য— 'বাপ রে এত আয়োজন ! একজন আসাম থেকে বেনেটোলা। আরেকজন এসে গেছে পদ্মপুকুর ! বাড়ির কলঘরে আবার কেউ ফিট করা নেই তো !'

রোয়াক পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ সৌম্য ওর 'কেন'র উত্তরটা পেয়ে গেল। একেবারে নিশ্চিত ! এইজন্য ! শীর্ষ অঙ্কটার সমাধান আগেই করতে পেরে গেছে। এই ব্যাপার ? শূন্য ঘরে আপন মনে খুব খানিকটা হেসে নিল সৌম্য। লাট্টু ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বলল, 'ও কাকু, তুমি খালি খালি হাসছো কেন ? বলো না ! ও কাকু !'

সৌম্য বলল, 'হাসির কথা মনে পড়লে হাসব না ?'

—'কি হাসির কথা ? আমায় বলো না !'

—'সে তুই বুঝবি না।'

লাট্টু আর কথা বাড়াল না। অভিমান হয়েছে। গোমড়া মুখে জল ভরল, বাসন ধুল, সদর দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। সৌম্য স্টোভে ভাত বসিয়ে, একটা আলু আর দুটো ডিম ফেলে দিল তাতে। তারপর চিঠি লিখতে বসল দিদিকে। দিদিটা নিশ্চয়ই ভীষণ ভাবছে, রাগও করেছে। অরণ্যদাও নিশ্চয়ই খুব আপসেট !

অন্ধকার সিঁড়ি

ম্যানেজারের ছেলের জন্মদিনের পার্টি ছিল। বিরাট ধুমধাম। প্রত্যেকবার এসব পার্টিতে শুধু বাচ্চাদেরই ডাকেন রায়-দম্পতি। সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ দু চারটি পরিবার। এবারের জাঁকজমক একটু চোখে পড়ার মতো। দুই মালিক পরিবার পর্যন্ত উপস্থিত। নরম পানীয়ের পাত্র হাতে করে প্রত্যেক অতিথিকে আলাদা করে আপ্যায়ন করছেন পরমার্থ রায়। মাঝে মাঝে ছোটখাটো বক্তৃতাই দিয়ে ফেলছেন— 'এমনি করে আমরা যখন মাঝে মাঝে মিলিত হবো বুঝলেন, তখন ভুলে যাবার চেষ্টা করব আমাদের সম্পর্কটা কর্মক্ষেত্রের। আসল কথা কর্মক্ষেত্রকে উপলক্ষ্য করে আমরা তো এখানে একটা পরিবারই গড়ে তুলেছি। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ব্যাপারেও কি আমরা পরস্পরের পরামর্শ নিতে পারি না ? তাতেও কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। রায় কি বলতে চাইছেন এবং হঠাৎ ছেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এত বয়স্কদের জড়ো করেছেন কেন বুঝতে অসুবিধে হয় না। সেনগুপ্তর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় ফ্যাক্টরির শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় একটা মস্ত ঢিল পড়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এখন সমান হয়ে গেছে সব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি, প্রশ্ন, বিস্ময়, ভয় এখনও কাজ করে যাচ্ছে। পরমার্থ বুঝি সবাইকে বলতে চাইছেন ব্যক্তিগত দুঃখ যত বড়ই হোক না কেন,

তাকে গোপন রেখে এ রকম একটা অশুভ কাণ্ড ঘটানোর আগে এ কলোনির বাসিন্দারা যেন বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ নেয়। আর কেউ না হোক পরমার্থ নিজে আছেন। তিনিই তো এ-কলোনির সবাইকার ভালোমন্দ শুভাশুভের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তবে ওসব ঝামেলায় দরকার কি? হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হয় নিয়মভঙ্গ নামে আচার দিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শোকপালনের পর উৎসব। নতুন জামা-কাপড়, লোভনীয় খাদ্যবস্তু, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একত্রে পানভোজন। এইভাবেই ভুলতে হয় মৃত্যুশোক। পরমার্থ যেন সে কথা মনে রেখেই আজকের এই জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করেছেন। মুছে ফেলতে চাইছেন ভয়ানক এক অমঙ্গলের স্মৃতি।

জয়ন্তী রায় মভ রঙের একটা দারুণ জমকালো তানচোই পরে একবার ভেতরে একবার বাইরে যাওয়া-আসা করছেন। ভেতরের ঘরে বাচ্চাদের হুল্লোড়ের ব্যবস্থা হয়েছে। বেলুন, পুতুল, বল, খেলা এইসব নিয়ে জমেছে সেখানে মিমি আর মিন্টুদের আসর। চিৎকারে কান পাতা যায় না। বাইরে বাগানে গাছের মধ্যে আলো জ্বেলে বড়দের পার্টি। পরমার্থ বললেন, 'জয়ন্তী তুমি একটু এদিকে এসো।' ঘোষাল গিন্নি আর মিসেস মহাপাত্র, রায়চৌধুরী আর মিসেস সিং, অরোরা এবং মিসেস চ্যাটার্জি, জয়ন্তী হাসিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আধো-অন্ধকার ঝাউতলা থেকে উচ্চারিত হল— 'মিসেস রায়, আমরা অধমরাও আছি কিন্তু এদিকে!' সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা দোহারা ভদ্রলোককে চিনতে পারলেন না জয়ন্তী রায়। তাঁর পাশের নেভি-ব্লু স্যুট পরা বেঁটেমতো ভদ্রলোকটিকেও না। পরমার্থ তাড়াতাড়ি এসে আলাপ করিয়ে দিলেন— 'এখানকার থানার ও· সি· দ্বারিকা মৈত্র, ইনি ইন্সপেক্টর ঘোষদস্তিদার।'

জয়ন্তী এগিয়ে যেতে গিয়ে বাগানের মাটিতে একটা আধলা ইটে হোঁচট খেলেন। পরমার্থ বললেন— 'আহা, দেখে চলবে তো!' যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে জয়ন্তী বললেন— 'ঠিক আছে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে, ব্যস্ত হবার দরকার নেই।'

ইন্সপেক্টর ঘোষদস্তিদার দৌড়ে গেলেন বরফ আনতে।

দ্বারিকা মৈত্র বললেন— 'পুলিশের এই মুশকিল, বুঝলেন মিঃ রায়, কেউ-ই তাদের দেখে খুশি হতে পারে না। পুলিশি খোলস ছেড়ে ফেললেও না। কেমন সুন্দর জমেছিল আপনাদের পার্টি। খামোখা মিসেস রায় হোঁচট খেলেন। যাই হোক, আমার কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ ছিল খুব।'

ঘোষদস্তিদারের আনা বরফের টুকরোটা পরমার্থ রুমালে করে জয়ন্তীর পায়ে চেপে ধরেছেন ততক্ষণে, জয়ন্তী ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বললেন, 'আমার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ? কেন বলুন তো?'

—'বাঃ, আপনার কত রকম সমাজসেবামূলক অ্যাক্টিভিটি, লোকমুখে শুনি কান্তিভাই ভুলাভাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নাকি আপনিই!'

কি মশাই রাগ করলেন না তো?' পরমার্থর দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন দ্বারিকা মৈত্র।

পরমার্থ হাসলেন। মনে মনে বললেন— 'যতই পুলিশি খোলস ছেড়ে আসো। যে চোয়াড়ে ছিলে সেই চোয়াড়েই আছো।'

জয়ন্তী বললেন— 'মাপ করবেন, আমি একটু ওদিকে যাই।'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি অন্য অতিথিদের দেখুন!'

পরমার্থ বললেন—'তুমি চলতে পারবে তো?'

—'একটু ধরো আমাকে। ভেতরে গিয়ে আরেকটু বরফ দিই। ঠিক হয়ে যাবে।'

রায় ধরে ধরে জয়ন্তীকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন পেছনের দরজা দিয়ে। দুজনে একা হওয়া মাত্র জয়ন্তী ফিরে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন— 'ও লোকদুটোকে নেমন্তন্ন করতে তোমায় কে বলেছিল?'

—'ওরা নিজেরাই বলেছিল। কাউকে জানাতেও বারণ করেছিল, পরমার্থ ভাবিত গলায় বললেন।

—'তাই বলে আমাকেও জানাবে না!'

—'তোমাকে জানাতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিল যে, তুমি জানলে নাকি আরও অনেকে জেনে যাবেই····'

—'কি চায় ওরা?'

—'বুঝতে পারছি না ঠিক। সেনগুপ্তর মৃত্যুর ব্যাপারটাতে ওদের মনে একটা খটকা লেগে আছে। আজ দেড় মাস ধরে আমাকে ক্রমাগত ফোন করে পার্টি থ্রো করতে বলছে। খুব সন্দেহজনক ওদের হাবভাব। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্তী নিচু গলায় বললেন— 'টাকা-কড়ি কিছু যদি চায়, দিয়ে বিদায় করো!'

—'খেপেছো? কি কারণে, কার ওপর সন্দেহের বশে এভাবে ঘোরাঘুরি করছে কিছুই জানি না, মাঝখান থেকে আমি টাকা-কড়ি অফার করে বিপদে পড়ি আর কি।'

রাত প্রায় দশটা হল অরণ্যদের বাড়ি ফিরতে। মৃদু আলো-জ্বলা স্নিগ্ধ রাতের রাস্তা বেয়ে, শিশির মাড়িয়ে বাড়ি ফেরা। দূর থেকে দেখা যায় ভূতের মতো অন্ধকার মেখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বাড়িটা। চুড়োর ওপর একটুখানি আলো। বেশ চাঁদের রাত। সেই আলোই পড়েছে বাড়ির মাথায়। বাকিটুকু গাছপালার ঝুপসি অন্ধকারে কালো হয়ে আছে। ওপরের ফ্ল্যাটটা এখনও ফাঁকাই আছে। নতুন এঞ্জিনিয়ার নিয়োগ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি ওখানে থাকতে রাজি হননি। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। ব্রততী জানালা খুলল। অরণ্য চমকে বলল— 'কেউ কি ওপরে জানলা খুলল ?'

ব্রততী বলল— 'না গো। আমাদের জানালা খোলার শব্দেরই কেমন একটা প্রতিধ্বনি হয়। অন্য সময়েও আমি দেখেছি, হয়ত জানলা বন্ধ করলুম একটু পরে মনে হল ওপরেও কে খোলা জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে।'

ঠাণ্ডা জলের একটা বোতল বার করল ব্রততী। অরণ্য বলল

—'আবার বেশ করে পান খেয়েছো তো ? নাও, এবার সারা রাত ধরে জল খেতে থাকো।'

—'কি করব, রিচ ফুড খেলেই আপনা থেকেই পানের দিকে হাত চলে যায়'— গ্লাসে জল গড়িয়ে অরণ্যর দিকে এগিয়ে দিল ব্রততী। নিজের গ্লাসটা নিয়ে উল্টোদিকের সোফাটায় গিয়ে বসলো।

হঠাৎ বলল— 'জানো, ব্যাপারটা খুব সম্ভব জয়ন্তীদি যা অনুমান করেছেন তাই।'

—'কিসের ব্যাপার ?'

—'ওই ওদের', ব্রততী ওপর দিকে ইঙ্গিত করল।

—'অনুমানটা কি ?'

—'ওদের সম্পর্ক ভালো ছিল না।'

—'এরই মধ্যে বুঝি তোমার জয়ন্তীদির সঙ্গে এক পক্কড় হয়ে গেছে।'

—'আজ নয়।'

—'কবে আবার গিয়েছিলে ?'

'আমি যাইনি, জয়ন্তীদিই এসেছিল।'

এই আরেকটি ভদ্রমহিলা, অরণ্যর খুব কম অপছন্দের মানুষদের মধ্যে যিনি অন্যতম। যদিও ওঁর সুবাদেই অরণ্যর এখানকার চাকরি, এবং সে হিসেবে ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞই থাকা উচিত ছিল অরণ্যর। ও তখন ম্যানিলায়। রোজগারপাতি করছে ভালোই। কিন্তু ব্রততী কাছে নেই। তখন ব্রততীর মা বেঁচে। দু ভাইয়ের

সংসার, তার মধ্যে একজন ওই রকম অচল। কে দেখবে অসুস্থ ভদ্রমহিলাকে ? ব্রততী-ই, সেই দেখাশোনার ভারটা মূলত বহন করত। ও ম্যানিলা যায়নি। অরণ্যের জোর করবার অধিকার ছিল না। সে অধিকার খাটানো চলবে না এই শর্তেই বিয়ে। ব্রততী তো বিয়ে করতেই চায়নি। সৌম্যর জন্যই ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

ম্যানিলাতেই রায়ের সঙ্গে আলাপ। ব্রততী একবার বেড়াতে গেল তখনই জানা গেল জয়ন্তী রায় অর্থাৎ পরমার্থ রায়ের স্ত্রী ব্রততীর পরিচিত। সেই সূত্রেই এখানকার চাকরি।

ব্রততী বেশি যায় না। কিন্তু মিসেস রায় প্রায়ই ওদের বাড়ি আসেন। ব্রততীর চাকরিটা ওর মেলামেশা না করার একটা কৈফিয়ত হিসেবে খাড়া করা যায়। কিন্তু অরণ্য মনে মনে একেবারেই চায় না ব্রততী ম্যানেজারের বাড়ি বেশি যাক। প্রথমত বেশি গেলে অফিসার মহলে কানাকানি হবে। মার্কেটিং ম্যানেজার তো প্রকাশ্যেই হাসি-ঠাট্টা করে এ নিয়ে। দ্বিতীয়ত অরণ্য জানে, ব্রততী জানে না জয়ন্তী রায় ওপর ওপর খুব আদিখ্যেতা করলেও মনে মনে ব্রততীকে দারুণ হিংসে করেন। খুব সূক্ষ্ম কিন্তু নির্ভুল ভদ্রমহিলার এই হিংসার ব্যাপারটা। অনেকের মাঝখানে হঠাৎ ব্রততীকে অপদস্থ করে উনি ওঁর এই প্রবৃত্তিটা চরিতার্থ করেন। ব্রততী খুব সাদাসিধে সাজগোজ করতে ভালোবাসে। তাতে ওকে দেখায়ও ভালো। জয়ন্তী আবার অত্যন্ত উগ্র। হাল্কা চাঁপা রঙের চান্দেরি শাড়ি, এলোখোঁপা আর সামান্য একটা টিপেই ব্রততীকে অসাধারণ দেখায়, যাদের দেখবার চোখ আছে, তাদের কাছে অবশ্য। পাশে ঝকমকে ব্রোকেড বা সিল্ক শাড়ি, চোখে আই শ্যাডো, ঠোঁটে গালে গাঢ় মেক-আপ জয়ন্তী যেন বিপরীত মেরু। হঠাৎ জয়ন্তী উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন— 'আরে ব্রততী, তুই কি স্কুল থেকে সোজা এলি ? নাঃ, মুখার্জি তোকে আর হাত খরচটা কিছুতেই দিল না।'

ব্রততী নিজের ভাবে এমনই মগ্ন যে এইসব কথার ইঙ্গিত, অপমান ও বোঝেও না, খেয়ালও করে না। স্নিগ্ধ হেসে বলে— 'কই না তো জয়ন্তীদি, রীতিমতো ঘণ্টাখানেক বিউটি-স্লিপ দিয়েছি। তাতেও হয়নি ?' এটা তো কিছুই না। এর চেয়েও মারাত্মকভাবে ব্রততীকে অনেক সময় আক্রমণ করেন ম্যানেজার-গিন্নি।

—'তুই আর কি বুঝবি ব্রততী, বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকার যা জ্বালা।'

কিংবা—'তুই টিপটপ থাকবি না কেন ? আমাদের মতো কি ? মিণ্টু এসেই গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হাউস-কোট কি আর সাধে পরি ! নইলে ও সব

নকল মেমসাহেবিতে আমার বিন্দুমাত্রও মোহ নেই।'

এসব সময়ে ব্রততী সাদা হয়ে যায় একেবারে। অরণ্য ওকে রক্ষা করতে চায়, যতটা পারে করেও। কিন্তু এইসব আঘাত অথবা সুরক্ষা কোনটাই ব্রততীকে শেষ পর্যন্ত স্পর্শ করে কিনা সন্দেহ আছে। দু দিন পরই হয়ত দেখা যাবে জয়ন্তী রায় বিভোর হয়ে গল্প করছেন ব্রততীর সঙ্গে। ব্রততীর মুখে মেঘভাঙা রোদ্দুরের মতো হাসি। বিবাহপূর্ব দিনগুলোতে যেমন দেখা-না-দেখায় মেশা ছিল, আজও তেমনি আছে ও। রহস্যময়ী।

—'কি বাণী দিলেন ম্যানেজার সাহেবা!' জিজ্ঞেস করল ও।

ব্রততী সামান্য হাসল, বলল— 'জয়ন্তীদি এমনিতে খারাপ মানুষ না। শুধু নারীসুলভ কৌতূহলটা বরাবরই একটু বেশি। একটু বেশি মেয়েলি মেয়ে। যাই হোক ওই একই কারণে জয়ন্তীদির ইন্সটিংটটা অনেক সময়ে ঠিক কথা বলে।'

—'যেমন?'

—'মনে আছে পারমিতা আসতে সেদিন আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে ধরলুম!'

—'হ্যাঁ। তোমার গায়ের ওপর টলে পড়ে গেল।

—'সম্পূর্ণ ভান।'

—'কোনটা?'

—'ওই পড়ে যাওয়াটা। ইচ্ছে করেই সমস্ত ওয়েটটা আমার গায়ের ওপর ছেড়ে দিল। আসল আর নকলের তফাত ঠিকই বোঝা যায়। ও খুব সম্ভব ফেস করতে পারছিল না কাউকে।'

অরণ্য চিন্তিত গলায় বলল— 'সেটা কিন্তু স্বাভাবিকই। এরকম পরিস্থিতিতে লোকে সবচেয়ে আগে স্ত্রীকেই দোষ দেয়। ফেস করতে পারা কঠিন।

—'কি যে বলো!' অসহিষ্ণু গলায় ব্রততী বলল, — 'স্বামী হঠাৎ মারা গেছে, এ অবস্থায় কোনও স্ত্রীর ওসব ভাববার সময় থাকে নাকি? দিশেহারা হয়ে যাবার অবস্থা তখন। আমি কিন্তু সেরকম কিছু দেখলুম না। অজ্ঞান হবার ভান করে ওর চোখে যে এতটুকু জল নেই, এটাই ও লুকোলো।'

—'হঠাৎ মারা যাওয়া আর সুইসাইড কিন্তু এক নয় ব্রততী। চোখের জল এ অবস্থায় শুকিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আফটার অল যে মানুষটা আত্মঘাতী হচ্ছে সে তার সমস্ত প্রিয়জনকে রিজেক্ট করছে। তোমরা পারোনি, আমায় সুখী করতে পারোনি, তাই আমি বিনাশের পথ বেছে নিচ্ছি— এই ধরনের একটা মেসেজ আত্মঘাতের পেছনে থাকে।'

ব্রততী চুপ করে রইল। একটু পরে অরণ্য বলল— 'শ্মশানে পারমিতার বাবা

আর সুমন্তর দিদির কথাবার্তাও অবশ্য আমার ঠিক স্বাভাবিক লাগেনি।'

—'কিছু বলোনি তো?'

—'বলব আর কি! তুমি যেরকম আপসেট সেদিন!'

—'আপসেট আবার কি? ওরকম ভয়াবহ দৃশ্য হঠাৎ দেখলে যে কেউ হার্টফেল করতে পারে।'

অরণ্য শ্মশানের ঘটনাটা বিশদ করে ব্রততীকে বলল।

—'দেনা-পাওনা নিয়ে একটা মন কষাকষির ব্যাপার আছে, মনে হয়। কিন্তু সুমন্তর দিদিও কি সব দেওয়া-টেওয়ার কথা বলছিলেন বলে ব্যাপারটা কিরকম ধোঁয়াটে হয়ে গেল।'

ব্রততী বলল— 'সেদিন ট্রেনে দুজন ভদ্রলোকের আলোচনা হঠাৎ কানে এলো।'

—'কি আলোচনা?'

—ভুলাভাই কান্তিভাইয়ের চীফ এঞ্জিনিয়ারের ব্যাপারটা শুনেছেন? একজন বললেন, আর একজন বললেন— না তো! কি ব্যাপার? সুমন্ত সেনগুপ্ত ছিল না? —হ্যাঁ, সুইসাইড করেছে, একেবারে মাথা টিপ করে গুলি।

—হাউ স্যাড। দারুণ ব্রাইট চ্যাপ। বিয়েও তো করেছিল! বি.ই-তে আমার দু বছরের জুনিয়র ছিল, প্রচণ্ড র‍্যাগ করেছিলুম। সব অত্যাচার সইল। খালি গেঞ্জি খুলে ফেলতে বলতেই টপ টপ করে জল পড়তে লাগল চোখ দিয়ে। বিদেশ গেল একেবারে হঠাৎ। ফিল্মস্টারের মতো বউ নাকি? —তা তো বলতে পারবো না। তবে ওই কোর্টেই গোলমাল।

—কি রকম? —স্ত্রীর সম্ভবত বিবাহ-পূর্ব কোনও ব্যাপার ছিল, দেশে ফিরে সেটাই কনটিনিউ করছিল···এরপর দুজনেরই গলার স্বর খুব খাদে নেমে গেল···'

অরণ্য বলল—'পারমিতার ব্যবহারে এসব কোনদিন মনে হয়নি তো!

ব্রততী বলল—'এসব কি ব্যবহারে মনে হওয়ার জিনিস! একটু আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব কিন্তু আমি সেন্স করেছি।'

—'অমনি তুমি সেন্স করে ফেললে? একটা বাজে গুজবের ওপর ভিত্তি করে। মাথার খুলি টিপ করে গুলি? হুঁঃ। মানুষ দেখো কেচ্ছার গন্ধ পেলে আর কিছু পায় না।'

—'অত বাপের বাড়ি থাকত কেন?'

—'অত আর কই? শনি-রবি তো? তার একটা কারণও তো ছিল। তোমরা মেয়েরা কোথায় মেয়েদের ডিফেন্ড করবে, তা···না···।'

ব্রততী বলল—'বেশ তো, পারমিতাকে তুমি কখনও গান গাইতে শুনেছো ?

—'কি করে শুনবো ? আমাদের এখানে তো এসে দশ মিনিটও বসত না। হয় চাবি রাখতে, নয় দিতে, আর নয় তো কিছুর জন্য থ্যাঙ্কস দিতে।'

—'তা নয়। যারা গান-টান শেখে, তাদের অভ্যাসই হল যখন-তখন গুন গুন করা। এরকম গুন গুন বা রেওয়াজ মাঝে মাঝেই আমাদের কানে আসা উচিত ছিল কিনা বল। আমি কিন্তু কোনদিন শুনিনি।'

অরণ্য হেসে বলল— 'এটা একটা কথা বটে। গুড গুড। তোমার তো দেখছি ক্রমেই একটা টিকটিকি-সদৃশ সিক্সথ-সেন্স গ্রো করছে। হেডলি চেজ-টেজ পড়ছ নাকি আজকাল ? তুমি কি বলতে চাইছ গান শেখার ব্যাপারটা হোক্স ? কিন্তু এরকম ধাপ্পা প্রতিবেশীকে দেওয়া গেলেও স্বামীকে কি দিনের পর দিন দেওয়া যায় ?'

—'যায় না-ই তো ? তাই জন্যেই···'

—'দুম করে একটা জ্বলজ্যান্ত যুবক আত্মঘাতী হয়ে গেল। ননসেন্স।'

ব্রততী বলল—'সবার মেজাজ তো আর এক রকম হয় না !'

অরণ্য উঠে পড়ে বলল—'তুমি যা-ই বলো, মেয়েটাকে আমার কোনদিনই এমন ক্যাড মনে হয়নি। বরং মনে হত খুব প্র্যাক্টিকাল, জীবন সম্পর্কে একটা ডেফিনিট কনসেপ্শন নিয়ে কাজ করে। তুমি কি জানো, ও অ্যাকাডেমিতে একটা কিসের এগজিবিশন করেছিল !'

—'কই শুনিনি তো ! বলোনি তো আমাকে ?'

—'আমার মনে ছিল না। সেনগুপ্ত কার্ড দিয়ে গেল অফিসে, যাবার জন্য রিকোয়েস্ট করে। কিন্তু সেইদিনই তোমার পিসতুত বোনের বিয়ে ছিল। যাওয়াও হয়নি। তোমায় বলাও হয়নি। তারপর তো বেমালুম ভুলেও গেছি। অনেক গুণ মেয়েটির। ব্যস্ত থাকত খুব।'

দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। শেষে অরণ্য বলল— 'ভালো কথা। দ্বারিকা মৈত্রকে দেখেছিলে ?'

—'কে দ্বারিকা মৈত্র ?'

—'এখানকার ও·সি· গো ? যে ভদ্রলোক সেদিন এসেছিল। আজ তুলসী বনের বাঘের মতো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ঘাপটি মেরে বসেছিল।'

ব্রততীর চোখ দুটো সতর্ক হয়ে উঠল। বলল—'কেন' ?

অরণ্য বলল—'পরমার্থদার খেয়াল ! আলাপ-সালাপ হয়েছে, হাতে রাখতে চাইছেন হয়ত !'

ব্রততী বলল—'আমি শুতে চললুম। তুমি কি আরও বসবে ?'

—'বসি আরেকটু।'

ব্রততী চলে গেলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে অরণ্য দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। মৃদু একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। দূরে কোথাও জীপের গর্জন শোনা গেল। মোপেডের বিকট আওয়াজ। তারপর সব চুপচাপ। চাঁদটা বাড়ির পেছনে চলে গেছে এখন, অস্ত যাচ্ছে। এদিকটা একেবারেই অন্ধকার, রাস্তার আলোগুলো ছাড়া। ওদের বাড়ির কাছাকাছি একটা আলো আবার জ্বলছে না। হঠাৎ অরণ্যর মনে হল পাশ দিয়ে হাল্কা পায়ে কে চলে গেল, মৃদু একটা গন্ধ আফটার-শেভ লোশনের— ভাসছে হাওয়ায়। সাদা রুমাল একটা আটকে আছে কি বাঁ দিকের ঝোপে ! ফিসফিস করে কে যেন বলল

—'হ্যাল্লো মুখার্জি ? এখনও জেগে ? 'ঘুমোতে যান। গুড নাইট। গুড নাইট। গুড না···ই···ট।'

কুয়াশা-কঠিন বাসর

দিনটা বুধবার। দুপুর গড়িয়েছে। ক্যান্টিন থেকে লাঞ্চ সেরে সবে নিজের অফিসে ফিরেছে অরণ্য। বেয়ারা এক কাপ কফি আর একটা টেলিফোন মেসেজ রেখে গেল। বসে বসে কাজ। কফি না হলে এই সময়টায় কেমন একটা ঢুল আসে। কফিতে চুমুক দিতে দিতে বাঁ হাতে আলতো করে টেলিফোন মেসেজটা তুলে নিল অরণ্য। কে এক মিস বিশ্বাস হেড অফিসে এসেছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। ফোন করে জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার অর্থাৎ পরের দিন সাড়ে এগারটা নাগাদ আবার আসবেন।

দু চারবার উল্টেপাল্টে দেখল অরণ্য কাগজটা। কোনও কাস্টমারের লোক কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মেসেজে সেরকম কিছু লেখা নেই। সুদ্ধু মিস বিশ্বাস। মহিলা ব্যবসায়ী নাকি ? কিছুদিন আগে এই রকম একজন উদ্যোক্তা মহিলা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ট্রেডিং করেন, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ নামতে চান, নানান পরামর্শ চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম তো যদ্দুর মনে পড়ছে বিশ্বাস নয়। বিরক্ত বোধ করল অরণ্য। দ্বিতীয় কোনও মত প্রকাশের সুযোগ রাখেনি। একেবারে স্থান-কাল ঠিক করে ফোন করছে। যেন গরজটা অরণ্যরই। অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করল অরণ্য।

—'ভদ্রমহিলা কোনও নম্বর-টম্বর দিয়েছেন ?'

—'না তো সার। তবে খুব আর্জেন্ট মনে হল। বললেন বিষ্যুৎবার তো উনি

হেড অফিসে আসেনই, নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।'

মাসে একটা বৃহস্পতিবার অরণ্যকে হেড অফিসে যেতে হয়। সেটা জেনেই তা হলে ফোন করেছেন ভদ্রমহিলা। শুধু এটা জানেন না যে, এ মাসে তার হেড অফিসে হাজিরা দেওয়ার কাজটা সারা হয়ে গেছে।

গিয়েই দেখা যাক। হাতে যে সময়টা থাকবে তাতে সোমদের খবর নেওয়া চলবে। ব্রততীকে তুলে নিয়ে পদ্মপুকুর হয়ে ফেরা যেতে পারে। ইদানীং ব্রততীর চেহারা আর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। কম্পানির গাড়ি বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছতে রোজ বর্ধমানে আসা-যাওয়া করে। সেই গাড়িতেই ও বর্ধমান পর্যন্ত যায়, তারপর ট্রেন ধরে। ফেরবার সময়েও মোটামুটি তাই। খুবই পরিশ্রম হয়। সম্প্রতি যেন মনে হচ্ছে পরিশ্রমটা ওর সইছে না। একটা দিনও যদি সোজা কলকাতা থেকে লিফট্ পায়···।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আগেই কথাটা ওকে বলল অরণ্য।

ব্রততী বলল—'বেশি দেরি করবে না কিন্তু। ওই রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পোষাবে না।'

ড্রাইভার নিল না অরণ্য। সত্যি সত্যি যদি সোমদের দেখে আসতে হয়, তো দেরি হবে। কম্পানির ড্রাইভারকে অতক্ষণ ধরে রাখা ঠিক হবে না। সোমদের কাছে যাবার কথাটা অবশ্য ব্রততীকে বলা হয়নি।

মাসে দ্বিতীয়বার হেড-অফিসে যাচ্ছে শুনে ম্যানেজার রায় খুব খুশি। বেশ কয়েকটা কাজ গছিয়ে দিলেন। এটা ভদ্রলোকের একটা দুর্বলতা। কেউ হিসেবের অতিরিক্ত কাজ করছে জানলে আপাদমস্তক খুশি হয়ে যান। মার্কেটিং ম্যানেজার চৌধুরি এই দুর্বলতার সুযোগ প্রায়ই নেয়। ব্রততীর কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে— 'সাইকো এসেছে। বিভীষিকার ছবি আবার আমি একদম মিস করতে চাই না জানোই তো। বললাম সাহেবকে— কলকাতা যাচ্ছি পার্টির সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস, সাহেব অমনি গাড়ি-ফাড়ি দিয়ে একেক্কার।'

ফ্যাক্টরি গেট দিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে একটা মেঠো রাস্তা আছে। শর্ট-কাট হয়। কিন্তু সেদিকে গেল না অরণ্য। কাঁচা রাস্তা, কোন কারণে যদি গাড়ি বিগড়োয়, কি গাড্ডায় পড়ে আর দেখতে হবে না। সোজাসুজি জি· টি· রোডে গিয়ে পড়ল। এদিকে ভিড় এখনও কম। শ্রীরামপুরের কাছাকাছি এসে বড্ড সরু হয়ে গেছে রাস্তাটা। বাস এবং ট্রাক চলাচলও খুব। বর্ধমান থেকে কলকাতা পৌঁছতে লাগে দু ঘণ্টার মতো। অরণ্য ডালহৌসী পৌঁছে গেল দু ঘণ্টায়। গাড়ি পার্ক করে

ঢুকতে যাবে, আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো।

অরণ্য দেখল সবুজ ঝিলিক। কেমন একটা চেনা-চেনা সুগন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। আরে, পারমিতা সেনগুপ্ত না!

—'কি ব্যাপার? আপনি এখানে?'

—'আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে। জরুরি।'

—'চলুন। ভেতরে চলুন।'

—'ওখানে না।'

—'ঠিক আছে। একটু বসবেন। একজনের আসবার কথা আছে, কাজটা সেরে নিই।'

—'আমিই কাল আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি', মুখ নামিয়ে বলল পারমিতা, গোলাপি নখগুলো চোখের সামনে এনে দেখতে মনোযোগী হয়ে পড়ল হঠাৎ।

অরণ্য আশ্চর্য হয়ে বলল—'মিস বিশ্বাস?'

—'হ্যাঁ। আমার বাবার পদবী। এমনিতে আমি বিশ্বাস সেনগুপ্ত লেখা পছন্দ করি। খুব সামান্য একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছি। অপরাধ নেবেন না। জরুরি দরকার এবং প্রাইভেসির প্রয়োজন না হলে নিতাম না। কোনও একটা নিরালা রেস্তোরাঁয় চলুন, প্লীজ।'

—'কোথায় যাবেন, বলুন!'

—'পিপিং-এ চলুন না হয়, লাঞ্চের আগে খুব নিরিবিলি থাকে।'

গাড়ির দরজা খুলে ধরল অরণ্য।

—'আমি পেছনে বসছি।' পারমিতা বলল।

উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছিল অরণ্য। মাসখানেক আগে বাবার সঙ্গে ও অফিসে গিয়েছিল। সুমন্তর পাওনাগণ্ডা যা ছিল চুকিয়ে নিয়ে গেল। ম্যানেজার বলছিলেন ভদ্রলোকের ধরনধারন একেবারে মিলিটারি। পারমিতার সানগ্লাস পরা চোখ। কোনদিকে তাকিয়ে আছে বোঝবার জো ছিল না। তারও দিন কুড়ি আগে অরণ্য অনেক সাধ্য সাধনা করে ব্রততীকে এবং জয়ন্তী রায়কে নিয়ে ওদের পার্ক সার্কাসের বাড়ি যায়। পারমিতা বাড়ি ছিল না। ওর বাবাও না। বয়স্ক চাকরশ্রেণীর লোক ছিল একটি। প্রায় এক ঘণ্টা পনের মিনিট মতো বসে থেকে ওরা চলে এসেছিল। ফিরতি পথে রাগে ফেটে পড়েছিলেন জয়ন্তী রায় —'কি দরকার ছিল আসবার? মুখার্জি, আপনার ভদ্রতার এই সব ভালোমানুষি ধরনধারন সবার জন্য নয়। বুঝলেন?' ব্রততী শান্ত করবার চেষ্টা করেছিল

ওঁকে— 'আঃ জয়ন্তীদি, ওরা কি করে জানবে আমরা আজ আসবো ? ইচ্ছে করে তো আর...' জয়ন্তী রায় ফুঁসছিলেন— 'ওর স্বামীর মৃত্যুর জন্য কি আমরা দায়ী নাকি ? একটা কাপুরুষ। নিশ্চয় চরিত্রহীন। কাপুরুষ না হলে কেউ আত্মহত্যা করে না। চোরা লম্পট। ডুবে ডুবে জল খায়। আমি ঠিক লোক চিনতে পারি, ব্রততী। সবাই তোর মতো ভালোমানুষ নয়। আই ওন্ট টেক ইট লাইং ডাউন।'

অরণ্য বলেছিল—'কি হচ্ছে বউদি ? আফটার অল মানুষটা মারা গেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আর এঁদের দোষ কি বলুন ! আমরা কি জানান দিয়ে এসেছি ?'

কিন্তু পিতাপুত্রী যেদিন অফিসে এলেন ওদের যাওয়ার প্রসঙ্গ একবারও তুললেন না। কাজের লোকটি যদি বলতে ভুলে গিয়ে থাকে তা হলে ভালো, নইলে জয়ন্তী রায়ের কথা মেনে নিয়ে বলতেই হয়, ওঁরা অস্বাভাবিক রকমের আত্মম্ভরি।

সেই পারমিতা সেনগুপ্ত এতো রকম ছলছুতো করে আজ ডেকে এনেছে অরণ্যকে। মিস বিশ্বাস ? এটা একটা নাটক বটে !

পিপিং-এ ঢুকে অরণ্য বাঁ দিকের কোণের টেবিলগুলোর দিকে পা বাড়াচ্ছিল। পারমিতা কাউন্টারে বসা চীনে ভদ্রলোকটির দিকে সতর্ক চোখে চেয়ে বলল—'মিঃ মুখার্জি, যদি মাইন্ড না করেন তো কেবিনে যাওয়া যাক। আমার কথাগুলো খুব গোপনীয়।'

চেয়ার টেনে বসতে বসতে অরণ্য বলল—'সোজাসুজি আপনাদের বাড়ি যেতে বললেই তো হত। এতো কষ্ট করবার কোনও দরকার ছিল না।'

পারমিতার চোখে সেই মস্ত গোল কালো সানগ্লাস। সেটাকে ও টেবিলে নামিয়ে রাখল। পারমিতার চোখের চারপাশ ঘিরে গাঢ় কালি। চোখ দুটো ঈষৎ বসে গেছে। লাল। ও চোখ নামিয়ে বলল— 'বাবা প্রচণ্ড শক্ খেয়েছেন। আপনাদের "কান্তিভাই ভুলাভাইয়ের" ওপর একেবারে ক্ষিপ্ত। ওঁর সামনে কোনও কথা বলা যাবে না।'

অরণ্য বলল—'ওঁর কি ধারণা, কর্মস্থলের সঙ্গে ব্যাপারটার কোনও যোগাযোগ আছে ? ক্ষিপ্ত কেন ?

'তা বলতে পারব না'— পারমিতা বলল—'তবে আমাদের বাড়িতে ওখানকার কারুর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলবার সুযোগ নেই। বয়স হয়েছে বাবার। আনরীজনেবল হতেই পারেন ! আমি বাবার একমাত্র সন্তান। মাতৃহীন। বাবা তো এ বিয়ে কিছুতেই দিতে চাননি ! আমার জেদে শেষ পর্যন্ত হার মানতে

হয়েছিল।'

বেয়ারা ফ্রায়েড প্রন-এর দুটো প্লেট নিয়ে ঢুকল। পারমিতা বলল—'প্লীজ নিন। না হলে বসব কি করে ? বসতে হবে অনেকক্ষণ। জানেন বাইশে রাত থেকে আর ঘুমোতে পারছি না। হাই ডোজে ওষুধ খেলে কাজ হয়। কিন্তু তাতে সারাদিন বিশ্রী একটা হ্যাঙ্-ওভার চলতে থাকে। তাই যথাসম্ভব না খেয়েই থাকতে চেষ্টা করি। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। সুমন্তর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে নানা মহলে গবেষণা চলছে— ভিন্ন ভিন্ন সোর্স থেকে কথাগুলো আমার কানে আসছে।'

অরণ্য বলল—'মিসেস সেনগুপ্ত। এসব ক্ষেত্রে এ রকম একটু-আধটু আলগা কথা হবেই। আপনি বুদ্ধিমতী মেয়ে, আপনি কেন সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবেন ?'

পারমিতা অন্য দিকে তাকিয়ে বলল—'বাড়িতে শুধু আমি আর বাবা। মা মারা গেছেন পাঁচ-ছ বছর। আই ওয়জ দেন জাস্ট আ স্লিপ অফ আ গার্ল। পরের বারে ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেবো। একটা গাড়িতে শুয়ে শুয়ে ও এলো। ড্রাইভার শম্ভুদা আর বাড়ির কম্বাইন্ড হ্যান্ড শ্রীপতিকাকু মিলে ওকে ধরে ধরে দোতলায় তুলল। তখন অনেক রাত। আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উঠে এসেছিলাম তাই। বাবা বলেছিলেন—'মিতু এ আমাদের দেশের ছেলে, খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে হস্টেলে, কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে ওকে, তুমি একটু দেখাশোনা করো। কদিন পরই ও বিদেশ চলে যাবে। সবাই ছিল, তবু আমি সে সময়ে ওর সেবা করেছি। তিন বছর পর ইংলন্ড থেকে যখন এলো, মিঃ মুখার্জি, আমিই ওকে পাগলের মতো প্রোপোজ করি। এই তিন বছর আমি অন্য কিছু ভাবিনি।...'

পারমিতার কথা আটকে গেল ; একটু পরে সামলে নিয়ে ধরা ধরা গলায় বলল—'বাবা কিছুতেই বিয়েটা দিতে চাননি। বয়সের ডিফারেন্স অনেক। এখন শুনতে পাই ওর দিদি প্রচুর দাবি-দাওয়া করেছিলেন, বাবাকে সে সব মেটাতে হয়...'

অরণ্যর অস্বস্তি হচ্ছিল, বলল—'আমার কাছে মন খুলে আপনি যদি হালকা হতে চান, আলাদা কথা। কিন্তু এসব কথা আমাকে বলে কি লাভ ? আমি তো আপনাদের সম্পর্কে কোনও গুজবকে প্রশ্রয় দিইনি, বিশ্বাস করা তো দূরের কথা।'

পারমিতা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল, ওর লম্বা হারের লকেটে সুমন্তর ছবি, লুটোপুটি

খাচ্ছে রুইতনের মতো লকেটটা টেবিলের ওপর। দম বন্ধ, কান্না আটকানো গলায় ও বলল— 'আমি বারো বছর ওর সঙ্গে এক দেশ থেকে আরেক দেশ ঘুরে ঘুরে সংসার করেছি মিঃ মুখার্জি, এখন মনে হচ্ছে সমস্তটা খেলা, তামাশা। বিশ্বাস করুন, আমার কাছেই ব্যাপারটা সবচেয়ে রহস্যময়। আর কিছু না, আপনি যদি একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারেন এ ব্যবহারের তা হলেও সান্ত্বনা পাবো। কি পায়নি বলুন তো ও জীবনে ? রূপকথার রাজপুত্রের মতো জীবন— বুদ্ধি, মেধা, রূপ···সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে চাকরি। যেখানে যায় সাকসেস্ আর হিরো ওয়রশিপ। আচ্ছা বলুন, আমিই কি স্ত্রী হিসেবে ওর খুব অযোগ্য ছিলাম !'

—'এভাবে চিন্তা করছেন কেন ?'

—'স্ত্রীকে বিন্দুমাত্র ভালোবাসলে কেউ এ রকম করে ? যখন ছুটি-টুটিতে এখানে এসেছি, থেকেছি ওদের গ্রামে আমাদের সঙ্গে কালচারাল অ্যাফিনিটি কোথাও নেই তবু ওই দিদির সঙ্গে সমান তালে কোমর বেঁধে গ্রামের পার্বণের খাটুনি খেটেছি। ও নিজে তো দেশে কখনও আসত না। আসতুম আমি আর ববি, আমার ছেলে। এতো কথা আপনাকে বলছি শুধু আপনাকে বোঝাতে যে আমার জন্য ওকে কখনও কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি, উত্তেজনায় থমথমে গলা পারমিতা বলল—'আমি তো বলব সম্পূর্ণ বিবেকহীন ক্রিমিন্যাল ও। সমাজ-ব্যবস্থার চূড়ান্ত সুখ-সুবিধেগুলো সমস্ত ভোগ করেছে।

এমনিতে রেডিমেড কেরিয়ার। বিদেশে পাঠানো, সংসার পেতে দেওয়ার দায়িত্ব শ্বশুরের। সামাজিক মর্যাদারক্ষার দায় স্ত্রীর। ওই বিধবা দিদি, যিনি ওকে মানুষ করেছেন, তাঁর প্রতিও বিশেষ কোনও কর্তব্য পালন করতে ওকে হয়নি। লাখে কটা মেলে বলুন তো এইরকম লাইফ ! তবু এরা চুপি চুপি অন্যের সুখ-শান্তির পুরো স্ট্রাকচারটার তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেয়। আমি জেদ করে সুখী হবার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু এই স্মৃতি কি আমায় কোনদিন সুস্থ হতে দেবে ? আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি। আমার জীবনে কি এই দুঃস্বপ্নের একান্তই প্রয়োজন ছিল ?' টপটপ করে চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, পারমিতা একবারও মোছবার চেষ্টা করল না।

অরণ্য খুব কোমল গলায় বলল—'আপনি এভাবে ভাববেন না। জানেন তো ডাক্তাররা বলে সুইসাইড এর পেছনে টেমপোর‍্যারি ইনস্যানিটি থাকে।'

হঠাৎ পারিমতা মুখ ফেরাল, ওর গালে একটা নীল শিরা দপ্‌দপ্ করছে। চোখের কোণ দিয়ে কেমন করে যেন অরণ্যর দিকে তাকাল, বলল—'আপনি কি সত্যিই কিছু জানেন না, মিঃ মুখার্জি ?'

—'আমি ?'

—'হ্যাঁ, আপনি ! আপনার স্ত্রীকে যে ও দারুণ অ্যাডমায়ার করত। কতটা করত, আগে এভাবে বুঝিনি।'

—'ব্রততীকে ? সেনগুপ্ত ? কি বলছেন ?'

অরণ্যর চোখে চোখ রেখে পারমিতা বলল—'ও বলত মিসেস মুখার্জি রিমাইন্ডস্ মি অফ ইটারনিটি। কথাটা ওকে একাধিকবার বলতে শুনেছি। খুব চাপা স্বভাবের বলে বোঝা যেত না, কিন্তু সুমন্ত বোধহয় খুব ইমোশন্যাল ছিল, দার্শনিক এবং প্রচ্ছন্ন কবি, আপনার কিন্তু ব্রততী মুখার্জির স্বামী হিসেবে ব্যাপারটা বোঝার কথা।'

অরণ্য স্তম্ভিত হয়ে পারমিতার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও তখনও বলছে—'মিসেস মুখার্জি কিছু রেঁধে পাঠালে মুখে দেবার অনেক আগেই ও বুঝতে পারত জিনিসটা কোথা থেকে এসেছে। খেতে খেতে চোখ মুখ জ্বলজ্বল করত যেন প্রসাদ-ট্রসাদ খাচ্ছে। এতো গভীর কমিউনিকেশন, আর আপনিই তার খোঁজ রাখেন না ? আমি অত্যন্ত আনরোম্যান্টিক। কিন্তু এখন সব কিছু বারবার চিন্তা করে আমার এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হচ্ছে সুমন্ত দ্যাট পুওর ফেলো, ফেল হোপলেসলি ইন লাভ উইথ ইয়োর ওয়াইফ। ইন ডেড আর্নেস্ট। অ্যান্ড শী ফেড ইট। পারপাসলি।'

অরণ্য অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে উঠে দাঁড়াল, বলল—'আপনার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।'

পারমিতা সেই একই রকম চোখে চেয়ে বলল—'উনি তাহলে ওকে বাইরে মীট করতেন না ?'

—'কি বলতে চান, আপনি ?'

—'দিনটা সুদ্ধু আমার মনে আছে। সতেরই আগস্ট। সুমন্তর ডবলিউ এম এফ থ্রি জিরো নাইন থ্রি আপনার স্ত্রীর স্কুলের কাছাকাছি পার্ক করা ছিল, জানেন ? আমি গানের স্কুল ফেরৎ লোয়ার সার্কুলার রোডে মার্কেটিং করতে গিয়ে দেখতে পাই। ছুটে গিয়ে কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে টকটকে লাল মুখে বলল—অফিসের কাজে এসেছে। অফিসের কাজে এসে কেউ গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে চুপচাপ বসে থাকে ?'

অরণ্য গম্ভীর গলায় বলল—'আপনার স্বামী কেন ওই সময়ে ওই জায়গায় গিয়েছিলেন, আমি জানি না। জানতে চাইও না। ব্রততী এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে না বলে আমার বিশ্বাস। আজেবাজে সন্দেহের বশে নিজেকে

শুধু শুধু কষ্ট দেবেন না। যান। বাড়ি যান।'

সুইং ডোর ঠেলে বাইরে এলো অরণ্য। চীনে খাবারের চাপ চাপ গন্ধ ঠেলে পার্ক স্ট্রীটের উন্মুক্ত হাওয়ায়। উঃ। মাথাটা গরম হয়ে গেছে। দেখতে শুনতে আধুনিকা। গান-বাজনা আর্ট এগজিবিশন করে, এখনও স্বজাতি-বিদ্বেষ আর ঈর্ষার সনাতন কালে পড়ে আছে?

ঘড়িতে মোটে দেড়টা। এখনও হাতে অনেক সময়। পরমার্থদার দেওয়া কাজ সারতে ডালহৌসি ফিরতে হবে। মাথার মধ্যে বিছে কামড়াচ্ছে। ডালহৌসি হয়ে, আবার ঘুরে বেন্টিংক স্ট্রীট, ধর্মতলা, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ক্যামাক, ল্যান্সডাউন হয়ে দেশপ্রিয় পার্ক। অনেকক্ষণ পাড়ি পার্ক করে বসে বসে জনতা দেখা। আবার ঘুরে রাসবিহারী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ধরে সোজা চলে এসে লোয়ার সার্কুলার রোড।

ব্রততী আসছে। আকাশনীল শাড়ি। সাদা সাদা ঘন বুটি। কালো ব্লাউজ। কপালে কুচো চুল। মাথা ঝাঁকিয়ে বিনুনিটা সামনে থেকে পেছনে পাঠিয়ে দিল। ঘড়ি দেখছে। মৃদু হাসি। স্বচ্ছ, নির্মল। রোগা হয়ে গেছে ইদানীং। কেমন ক্লান্ত দেখায়। পেছনে আরও তিনটি মহিলা। এগিয়ে এসে ব্রততী বলল—'মঞ্জু, শিবানীদি আর উত্তরা, ওদের এসপ্লানেডে নামিয়ে দিতে হবে।'

মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে নমস্কার সারল অরণ্য। গাড়ির দরজা খুলে ধরল। তিন মহিলা পেছনের সীটে বসে শালিখ পাখির মতো কিচিরমিচির করছেন। ব্রততী সামনের সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রেক কষল অরণ্য। আরেকটু হলেই মিনিবাসটার সঙ্গে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হত। মুখ নিচে নামিয়ে বোধহয় চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে ড্রাইভারটা। ভয়ার্ত গলায় পেছন থেকে মন্তব্য হল—'আপনি কি সবসময়েই এরকম ড্রাইভ করেন মিঃ মুখার্জি? না আজ আমাদের ভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে করলেন!'

অরণ্যর জিভ শুকিয়ে গেছে। বলল—'যা বলেন।'

পেছন থেকে আবার মন্তব্য হল—'এতো কথা বলিস কেন? কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে যায়।'

এসপ্লানেডে তিনজন নেমে গেলে ব্রততী বলল—'কিছু হয়েছে?'

—'কি হবে?'

—'না, কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে?'

হঠাৎ আলটপকা মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, সংযম নষ্ট হয়ে গেছে, ভুরু

কুঁচকে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে অরণ্য বলল—'তুমি যখন-তখন অন্যমনস্ক উদাস হয়ে যেতে পারো, অ্যাক্টিং মিস্টিরিয়াস। আমার বেলাই যত দোষ।'

ব্রততী অবাক হয়ে বলল—'ওমা, ছোট ছেলের মতো ঝগড়া করছ কেন? দোষ, আমি বলেছি? অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য গাড়ি ঘোড়ার রাস্তা বাছলে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে না?'

অরণ্য আড়চোখে চেয়ে দেখল খুব স্নিগ্ধ মুখ। রোগা হয়ে গেছে বলেই কি একটু করুণও। বলল—'শীর্ষদের দেখতে যাবে?'

ব্রততী খুব খুশি হয়ে বলল—'সময় হবে? তবে চলো না। সোমকে বলব— খিচুড়ি চাপাতে, আমাকে আর বাড়ি ফিরে রান্না-টান্না করতে হবে না।'

—'সুদ্ধু রান্নার ভয়ে ভাইয়েদের কাছে এসেছো, জানলে কি ওরা খুশি হবে?'

—'কারণ যাই হোক, ফলাফল যদি দিদি-অরণ্যদা,হয় খুশি হতে বাধ্য।'

—'তাহলে ভালো মিষ্টির দোকান টোকান দেখলে বলো, কিছুমিছু নিয়ে যাওয়া যাবে।

ব্রততী হেসে ফেলল—'কিছুমিছু কিনতে হলে তো সবজি-বাজারে যেতে হবে।'

অরণ্য স্টিয়ারিং-এ চোখ রেখে একই ছন্দে বলল—'সুমন্ত সেনগুপ্তর গাড়িতে তুমি কতো দিন চড়েছ?'

দারুণ চমকে ব্রততী বলল—'মানে? হঠাৎ?'

—'বলোই না।'

'কোনদিন না' ব্রততী শক্ত মুখে, জেদী গলায় বলল—'যদিও তোমার এ প্রশ্নের কোন অর্থই বুঝতে পারছি না।'

—'সত্যিই বুঝতে পারছো না? কেউ কেউ তোমাকে আর সুমন্ত সেনগুপ্ত গাড়িকে কাছাকাছি দেখেছে কিন্তু।'

—'কে?'

—'যে-ই হোক না কেন।'

—'বললুম তো না। আমি মিথ্যে বলতে পারি না।'

—'মিথ্যে বলতে হয়ত পারো না, কিন্তু সত্য গোপন করতে তো পারো?'

ব্রততী পাশে আস্তে আস্তে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অরণ্য বুঝতে পারল। ক্রোধে, বিস্ময়ে না ভয়ে কে জানে! তূণ থেকে একটার পর একটা বিষাক্ত তীর আপনা থেকে তার সম্মতি ছাড়াই কি করে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেল সে জানে না। কিন্তু শরসন্ধান মনে হচ্ছে অব্যর্থ। পাশে নারী নির্ভুলভাবে বাণবিদ্ধ। সামনে শীতের

মলিন বিকেল। যানজটের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ মনথারাপের পথ। সোম কি শীর্ষর মুখ আর দেখা যাচ্ছে না সঙ্কল্পের আয়নায়। গাড়ির মুখ আস্তে আস্তে ঘুরে গেল। ব্রততী কোনও প্রশ্ন করল না। বিরাট একটা বাদুড়ের পাখার মতো শেষ নভেম্বরের অন্ধকার কবলিত করে ফেলছে হাইওয়ে। অন্যমনস্ক অ্যামবাসাডর ছুটে চলেছে। কিছু দেখছে না। কিছু শুনছে না। ভেতরে নিঃশব্দ আর্তনাদ। সম্পর্কের মধ্যে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অ্যামবাসাডরের যুগল আসন থেকে আর্ত রক্তবিন্দু পারার দানার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছিটকে যাচ্ছে পথে। মাঠে, ডোবায়, জলায়, দোকানে। ধান ক্ষেত আর গাছ-গাছালির অভ্যন্তর থেকে ছুটে আসছে দলা দলা অন্ধকার।

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামল ফ্যাকটরি গেটের কাছে। প্রায় আটটা। দারোয়ান গেট খুলে অরণ্যর হাতে একটা মেসেজ দিল। মেসেজেরই দিন আজ। পরমার্থদা অফিসে দেখা করতে বলেছেন একবার। বাড়ির সামনে ব্রততী নেমে গেল নিঃশব্দে। গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ম্যানেজারের অফিস। পরমার্থ রায়ের সামনে অরণ্যর দিকে পেছন ফিরে কেউ একজন বসে। অরণ্যর দৃষ্টি সোজা রায়ের দিকে। উদ্বিগ্ন মুখে রায় বললেন—'মিঃ মৈত্র তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছেন, মুখার্জি। কি সব জিজ্ঞাস্য আছে ওঁর।' রায় উঠে দাঁড়ালেন, যদিও কেউ বলেনি, তবুও বাইরে চলে গেলেন। অরণ্য এতক্ষণে দেখল। ইউনিফর্ম পরে দ্বারিকা মৈত্র। রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে অরণ্যর মুখোমুখি হলেন মৈত্র—'বসুন মিঃ মুখার্জি।' হাতের একটা নোটবইয়ের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন—'বিবি কার নাম ?'

—'জানি না।'

—'জানেন, কিন্তু বলবেন না।'

বিরক্ত গলায় অরণ্য বলল—'আর কিছু বলবেন ?'

—'কাজটা ঠিক করছেন না মিঃ মুখার্জি। জানবার অন্য সোর্স আছে আমাদের।'

—'অন্য সোর্সের কাছে যাচ্ছেন না কেন ? যা আমি জানি না তার জন্য আমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করে কি লাভ ?'

—'আপনার স্ত্রীর নাম তাহলে বিবি নয় ?'

নিস্পন্দ হয়ে গেল অরণ্য। একটু পরে বলল—'আমার স্ত্রীকে আমি বরাবর ব্রততী বলেই জানি।'

হাসলেন দ্বারিকা মৈত্র—'আপনার উত্তরটা কি উকিলের শিখিয়ে দেওয়া ?'

তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—'অন্য কিছু না। "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়" চিরকুটটার পেছনে বারবার লিখে বারবার কাটা হয়েছে একটা নাম আমাদের এক্সপার্ট উদ্ধার করেছেন নামটা বিবি। বিশ্বস্তসূত্রে জানলাম আপনার স্ত্রীর ডাকনাম বিবি।'

—'আমিও সেটা আজ, এখনই জানলাম।'

—'কতদিন বিয়ে করেছেন ?'

—'বছর নয়েক।'

—'কোথায় পড়াশোনা আপনার ?'

—'স্কুলজীবন কলকাতায়। তারপর কাশী।

—'ওখানকারই বাসিন্দা নাকি ?'

—'হ্যাঁ। আর কিছু দরকার আছে ?'

—'নাঃ। কিছু না। বিশ্বস্তসূত্রে আরও জানলাম, ক্যালকাটা এবং বেঙ্গল পুলিশের খাতায় বিবি নামে একটি সাঙ্ঘাতিক নকশাল মেয়ের নাম, ছবি, ফিঙ্গার প্রিন্ট অর্থাৎ পুরো একটা ডসিয়ারই রক্ষিত আছে। বিখ্যাত এক কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী এই মেয়েটির কাছে তার সহযোদ্ধারা তাদের যাবতীয় আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন জমা রাখত। লালবাজারে মেয়েটির নিকনেম ছিল অগ্নিকন্যা।'

—কপালে অজস্র ভাঁজ পড়তে চাইছে। অরণ্য প্রাণপণে সেগুলোকে টেনে টেনে সমান করছে। হিমালয়ের তুষারগলা রাত। ভেসে আসছে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নির্বাক মহিলার কণ্ঠস্বর—'বিবি, বিবি, বিবিরে।!'

সমগ্র যাত্রাপথে ওই একবারই মুখ খুলেছিলেন ভদ্রমহিলা। কাকে ডাকছেন, কেন ডাকছেন তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেনি কেউ। হাতজোড় করে নমস্কার করল দীঘল চেহারার মেয়েটি। লম্বা, কালো বিনুনি। সোজা ভুরু। চোখ দুটো কোমল, গভীর, গম্ভীর।

—'আমার নাম ব্রততী চক্রবর্তী। কলকাতা থেকে আসছি।'

দ্বারিকা মৈত্র বললেন—'আপনাকে কষ্ট দিলাম মিঃ মুখার্জি। কিন্তু আপনার শ্যালক সৌম্য আর শীর্ষ চক্রবর্তী যে দুর্ঘটনার রাতে উপস্থিত ছিল, আপনার বাড়িতে যে সুমন্ত সেনগুপ্তর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকত, ইনভেস্টিগেশনের সময়ে যে আপনার শ্যালকদ্বয় চুপিচুপি পালিয়ে যায়, এসব কথা গোপন করে আপনি অযথা নিজেকে সন্দেহভাজন করে তুলেছেন।'

অরণ্য নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'আপনার আর কিছু বলবার আছে ? থাকলে

আমাকে স্বভাবতই উকিলের মাধ্যমে কথা বলতে হবে।'

—'অতটা বোধহয় দরকার হবে না। তবে আরও কিছু বলবার ছিল। আপনার শ্যালকদ্বয়ের আঙুলের ছাপ সুমন্ত সেনগুপ্তর ফ্ল্যাটের নানান জায়গায় পাওয়া গেছে। এবং এরা দুজন সত্তর-বাহাত্তরের নোটোরিয়াস নকশাল। শীর্ষ চক্রবর্তী ওরফে বাচ্চু সি পি এম মিনিস্ট্রি না হলে ছাড়া পেতো না আজও। ডেনজারাস চ্যাপ। আপাতদৃষ্টিতে এখন কোনও অ্যাকটিভিটি নেই যদিও। আপনার কিছু জানা থাকলে যদি বলেন উপকৃত হবো।'

—'আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার স্ত্রী এবং কাজের লোকটি ডেডবডি আবিষ্কার করে যখন ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, আমি এবং সৌম্য চক্রবর্তী দুজনেই ছুটে ওপরে উঠে যাই। আমাদের দুজনেরই ফিঙ্গার প্রিন্ট ওই ফ্ল্যাটের নানান জায়গায় পাওয়া যেতেই পারে।'

দ্বারিকা মৈত্র মৃদু হেসে বললেন—'অবশ্যই। কিন্তু শীর্ষ চক্রবর্তী। দ্যাট ডেঞ্জারাস ফেলো? সে-ও কি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ওপরে দৌড়েছিল?'

ঘৃণায় জবাব দিল না অরণ্য। দ্বারিকা মৈত্র বললেন—'তার আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে। মিসেস সেনগুপ্তর বাবা রিটায়ার্ড ডিএসপি আমাদের নিজেদের লোক। তিনি ইনভেস্টিগেশনের জন্য চাপ না দিলে আমরা হয়ত এতোটা করতাম না। রুটিন চেক করে সুইসাইড কেস বলে ছেড়ে দিতাম। যাক, ঘাবড়াবেন না মিঃ মুখার্জি, পুলিশ কাউকে শুধু শুধু ফ্রেম করবার জন্য তথ্য ম্যানুফ্যাকচার করে না। শুনলে আশ্চর্য হবেন সুমন্ত সেনগুপ্তও সত্তর-বাহাত্তরের নামকরা নকশাল-লীডার ছিল। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বিরাট গ্রুপ ওর কথায় উঠত বসত। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে রিলেশন খুব ক্লোজ ছিল। আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন।' সতর্ক চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন দ্বারিকা মৈত্র।

দুজনে দুপাশে। মাঝখানে রাত। নির্জন। নীল। ঘুম নেই। ঘুম আসে না। রাতের কোটরে ঢুকে পড়ছে আস্তে আস্তে। নিস্পন্দ, নির্বাক। শেষ রাতের অস্তগামী চাঁদ কপালে টর্চ ফেললে ব্রততী মৃদুস্বরে বলল—'আমি তো তোমায় বলেইছিলুম আই অ্যাম এ উওম্যান উইথ এ পাস্ট। বলিনি?'

অরণ্য বলল—'সে অতীতের প্রকৃতিটা যদি একটু বুঝতে দিতে।'

—'আমার কথা বলা যে বড় কঠিন! সোমদের কথা তো সবই জানো। তাতেও বোঝনি?'

—'না।'

ব্রততী বলল—'অতীত যা-ই হোক আমার বর্তমানটা পুরোপুরিই তোমার হাতে, এ নিয়ে কোনও সংশয় রেখো না। জানি না, ভবিষ্যতটা হয়ত আমার একলার। অরণ্য বলল—'তুমি কি খুব ভয় পেয়ে গেছো?' ব্রততী বলল—'আমার জীবন নিয়ে ভয় এমন ছিনিমিনি খেলা খেলেছে যে সজ্ঞানে আমি আর ভয় কাকে বলে জানি না।'

শায়িত বল্লম

আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। বঙ্গোপসাগরের কোথাও নিম্ন চাপ। হঠাৎ আবহাওয়ায় একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন। নভেম্বরের উজ্জ্বল দিনে বাদলা শীতের কাঁপুনি। ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ আকাশময় এলোমেলো ঘুরছে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরোর মতো। লম্বা লম্বা গাছগুলো প্রবল দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। রিকশা-অলা বলল—'হুডটা খুলে দিই বউদি। হাওয়ায় টানতে পারছি না নইলে।'

—'বৃষ্টি এলে?'

—'সে তখন দেখা যাবে। তার আগেই আপনাকে ঠিক পৌঁছে দেবো।'

ট্রেনে ওঠার পর বৃষ্টি এলো। কোনদিকে ছাট বোঝা যায় না। ঘুরন্ হাওয়ায় উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম সব দিক থেকে ধারালো বৃষ্টির কুচি ছুটতে ছুটতে এসে ট্রেনের জানলায় ঠোক্কর মারছে। সব বন্ধ। কাচের পেছনে খড়খড়িগুলোও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একে আজ বাচ্চাদের স্কুল বাস ছাড়ে নি। বর্ধমান পর্যন্ত লিফ্‌টটা পাওয়া গেল না। তার ওপর হঠাৎ এরকম দুর্যোগ। মনে হচ্ছে আজ আর পৌঁছনো যাবে না। অথচ আজই একটা ক্লাস টেস্ট নেওয়ার কথা।

স্কুলে পৌঁছতে পৌঁছতে কাক-ভিজে। বৃষ্টির ঝাপটায় ছাতা উল্টে গেছে। বাস থেকে নেমে স্কুলে আসতে ওইটুকু রাস্তাই ভিজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। দেরি হয়ে গেছে। ক্লাসের বাচ্চাগুলো খুব হই-চই শুরু করে দিয়েছে। মিসকে ভিজে কাক দেখে ওদের চিৎকার বেড়ে গেল। আনন্দ হয়েছে খুব। ব্রততী হেসে ফেলল। তারপরই হাঁচি। চোখ নাক লাল করে স্টাফরুমে ঢুকতে বেলাদি বললেন—'আমার কেজ-এ ভাগ্যিস শাড়ি-টাড়ি রাখা থাকে। তুমি চট করে পাল্টে নাও। নভেম্বরের বৃষ্টি। জ্বর হল বলে। বাড়ি গিয়েই একটা অ্যাকোনাইট থ্রি খেয়ে নেবে। দিনে তিনবার।'

ব্রততী বলল—'কেন বেলাদি, রাস-টক্স নয়? আমরা তো বরাবর রাস-টক্সই খেয়ে এসেছি।'

—'উঁহু। ওসব সাট্‌ল ডিফেরেন্স আছে ভাই। নর্থ উইন্ড আরম্ভ হয়ে গেলেই অ্যাকোনাইট।'

মাধুরীদি বললেন—'ঠিক বলছ না বেলা। বৃষ্টি, সে যে সময়েরই হোক না কেন, বাস-টক্স।'

হোমিওপ্যাথি নিয়ে এই বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেই ব্রততী জামা-কাপড় বদলে এলো। ক্লাসে গিয়ে সব প্রশ্নগুলো বোর্ডে লেখা শেষ করেছে, বেয়ারা এসে স্লিপ দিল—'প্রিন্সিপ্যাল ডাকছেন।'

বাচ্চাগুলোকে লিখতে বসিয়ে ক্লাস ক্যাপটেনকে ওদের চুপ করিয়ে রাখার দায়িত্ব দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গেল ব্রততী। সামনে বসে থাকা ভদ্রলোককে দেখিয়ে প্রিন্সিপ্যাল বললেন—'এই দ্যাখো তোমার কাজিন আবার কি খারাপ খবর নিয়ে এলেন!'

ব্রততী দেখল ফোলা ফোলা চোখ, চ্যাপটা নাক, খাদির পাঞ্জাবি ট্রাউজার্সের ওপর। উড়ো চুল। চেনা। কিন্তু কস্মিনকালেও কাজিন নয়। ওদের নিজেদের মধ্যে লোকটির নাম ছিল জিরো জিরো সেভ্‌ন। সবচেয়ে ধূর্ত। করিৎকর্মা, বলতে গেলে অদ্ভুতকর্মা পুরুষ সি আই ডিদের মধ্যে। সে সময়ে অনেক অল্প বয়স ছিল, নিজের বয়সের ছেলেমেয়েদের ধরতে যে তৎপরতা দেখিয়েছিল—বিস্ময়কর। নিয়মিত মিটিং-এ আসত। কেউ কোনোদিন বুঝতে পারেনি। নাম—অতনু সরকার।

বলল—'স্ট্রোকটা মা কোনমতে সামলেছেন, মনে হয় এই শেষ বিবি। আমি গাড়ি নিয়েই এসেছি, দিদিকেও তুলতে হবে।'

সন্ধানী চোখ রাখল বিবি ওর ফোলা ফোলা চোখে। ওর চোয়াল কঠিন হয়ে আবার আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল, বলল—'চলুন।' প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে বলল—'আমি আর তাহলে সই করছি না। আজকের দিনটা সি এল নিয়ে নিলাম।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন—'ওসব তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি যাও মাসিমাকে দেখে এসো।'

স্কুলের বাইরে বেরিয়ে অতনু সরকার বলল—'ওদিকে গাড়িটা রেখেছি। রাস্তা পার হতে হবে। চলুন।'

—'কোথায়, লালবাজার?'

—'না মিসেস মুখার্জি, গাড়িতে যেতে যেতেই কয়েকটা জরুরি জিজ্ঞাসাবাদ সেরে ফেলব। কোনও ভয় নেই।'

ব্রততী হাসল। কঠিন, নিষ্প্রাণ হাসি। অতনু সরকার অভয় দিচ্ছে। তাকে।

মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চট করে চোখ ফিরিয়ে নিল অতনু। গাড়ির দরজা খুলে বলল—'সামনেই বসুন, নইলে কথা বলতে অসুবিধে হবে। কথাবার্তা হবে শুধু আপনার আর আমার মধ্যে, ড্রাইভার আনি নি তাই।'

ব্রততী গুছিয়ে উঠতে উঠতে বলল—'টেপটা কি সামনের দিকেই ফিট করা?'

অতনু জবাব না দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে চৌরঙ্গিতে পড়ে গাড়ি রবীন্দ্রভবনের দিকে গেল। উল্টো দিকে হস্তশিল্পের মেলা হচ্ছে। রাস্তা ভিজে। বৃষ্টি থেমে গেছে। অতনু বলল—'মেলায় যাবেন?'

—'জিজ্ঞেস করছেন কেন? আদেশ করুন।'

—'যা বলেন। তবে আপনাকে আদেশ করবার আগে একবার ভাবতে হয়।'

ব্রততী নেমে দাঁড়াল। অতনু টিকিট কেটে আনতে ভেতরে ঢুকল। মেলায় তেমন ভিড় নেই। একেবারে ফাঁকাও নয়। অতনু বলল—'মেলার মধ্যে আমরা সত্যিকার নিরাপদ, মিসেস মুখার্জি। আপনার কথায় মনে হল গাড়িটা সত্যিই বাগড় হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখাটাও আমার পক্ষে বিপজ্জনক। আমার ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্যে যাকে মোতায়েন করা হয়েছে, মেলার মধ্যে সে আমাদের কথা শুনতে পাবে না।'

ব্রততী বলল—'কাদায় কাদা হয়ে আছে এ জায়গাটা। শুকনো জায়গায় চলুন।' "আমরা" করে বলবেন না। যা বলার বলুন। ভনিতার প্রয়োজন নেই। কোনও গোপনীয়তার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

—'স্কুলে তাহলে মাসতুত ভাই পরিচয়টা না দিলেও চলত বলছেন?'

—'বলছি।'

—'সি আই ডি তুলে নিয়ে গেছে জানলে চাকরিটা থাকত?'

—'চাকরির দরকার নেই।'

—'দরকার নেই জানি। এখন মা-ও আর নেই। বাপ্পাও দাঁড়িয়ে গেছে। মুখার্জি তো বেশ শাঁসালো লোক। কিন্তু বাচ্চাগুলোর মুখ দেখতে পাবেন না, কচিকচি গলার···'

কথা শেষ হল না। সপাটে একটা চড় এসে পড়ল অতনু সরকারের গালে। ব্রততীর থমথমে লাল মুখটার দিকে তাকিয়ে অতনু বলল—'করছেন কি মিসেস মুখার্জি? এখুনি লোক ছুটে আসবে যে! নেহাত মেঘলা দুপুর, বিশেষ কেউ লক্ষ করেনি···'

চার পাঁচটি মেয়ের একটা দল দুজনের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। ব্রততী বলল—'আপনি খুব ভালো করেই জানেন, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না আর। যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'

অতনু বলল—'এভাবে রি-অ্যাক্ট্ করলে বলব কি করে? আপনাদের ওপর একটা চূড়ান্ত অন্যায় হয়ে গেছে বলেই আজ আমি একা এইভাবে আপনাকে মীট করতে এসেছি। ভুল করবেন না মিসেস মুখার্জি।...না আপনি ভালোই করেছেন। আমার ওপর যে লক্ষ রাখছে সে সম্ভবত এসে গেছে। আপনার চোখ মুখ এবং আচমকা চড় বলে দিয়েছে যে আপনার সঙ্গে আমার আঁতাত অসম্ভব।'

ব্রততী কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেল, বলল—'আপনি আমাকে থানায় নিয়ে চলুন। সেখানেই যা জিজ্ঞেস করার করবেন।'

অতনু পেছন পেছন যেতে যেতে বলল—'পুলিস সুমন্ত সেনগুপ্তর হত্যার ব্যাপারে একটা নিজস্ব থিয়োরি খাড়া করেছে।'

—'হত্যা?' ব্রততী চোখে আতঙ্ক নিয়ে পুরো ঘুরে দাঁড়াল—'কি বলছেন আপনি?'

—'হত্যা নয়? বেশ তো যদি না-ই হয়, তাহলে দ্বিতীয় থিয়োরি তো একটা দরকার, নাকি? দুটো থিয়োরিই আমি আপনাকে কনফিডেনশ্যালি শুনিয়ে রাখছি। আপনার মঙ্গলের জন্য।'

'বাহাত্তর সালের অক্টোবর মাসে শিমলিপালের জঙ্গলে এক পোচারদের গোপন আড্ডা থেকে সুমন্ত সেনগুপ্তকে যখন ধরা হয় বেঙ্গল পুলিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেও ফেলেনি। কারণ তারা ভাবেনি— শহুরে গেরিলাদের অন্যতম সেনানায়ক সেনগুপ্তর মুখ থেকে আদৌ কোন কথা বের করা যাবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ব্যাপারটা সোজা। দুদিন রাজার হালে রাখার পর তৃতীয় দিনে থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করা হয়েছে কি হয়নি, সুমন্ত সেনগুপ্ত একেবারে কোল্যাপ্স্ করল। নকশাল গেরিলাদের যে যে ওর গ্রুপে ছিল সবার নাম ধাম এবং আর যা কিছু তথ্য গলগল করে বলে সুমন্ত সেনগুপ্ত অজ্ঞান হয়ে গেল। তার দেওয়া খবরের ওপর নির্ভর করেই প্রধানত বাদ বাকি নকশালদের রাউন্ড আপ করা হয়, যার মধ্যে ছিল শীর্ষ চক্রবর্তী, সৌম্য চক্রবর্তী এবং ছিলেন আপনি, বিবি।

'আলিপুর সেন্ট্রাল থেকে সুমন্ত সেনগুপ্তকে কিভাবে স্মাগ্‌ল্ করে বাইরে একেবারে ইংলন্ডে নিয়ে গিয়ে ফেলা হল, আজও আমরা পুরোপুরি বুঝতে

পারিনি,তবে ডি এস পি রণবীর বিশ্বাসের মেয়ের সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে হয়েছে দেখে অনুমান করছি রণবীর সুমন্তর ধনী আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অনেক টাকা খেয়েছিলেন। সেনগুপ্ত বিদেশেই থেকে যায়। বছর দেড়েক আগে তার কি যে দুর্মতি হল, ভাবল ছোটখাটো কোনও কনসার্নে কাজ করলে পূর্ব-পরিচিতদের কারো সঙ্গে দেখা হবে না। 'কান্তিভাই ভুলাভাইয়ে'র বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করল সে। ঠিক যেটা এড়াতে চেয়েছিল সেটাই ঘটল সুমন্তর কপালে। বিশ্বাসহন্তাদের এমনিই হয়ে থাকে। হবি তো হ? "কান্তিভাই ভুলাভাই"-এর ম্যানেজারের স্ত্রী জয়ন্তী রায় একদম প্রথম যুগের নকশাল। সম্ভবত মুন্নি বলে পরিচিত ছিলেন বিপ্লবী মহলে, অজ্ঞাত কারণে সেভেনটির মাঝামাঝি থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। ওঁকে আইডেনটিফাই করেছেন আমাদের ইনস্‌পেকটর ঘোষ দস্তিদার। উনিই বোধহয় একমাত্র মুন্নিকে চিনতেন গোড়ার দিকের বেশ কয়েকটা এনকাউন্টারে থাকায়। জয়ন্তী রায় এবং আপনারা সকলে সুমন্ত সেনগুপ্তর ওপর প্রতিশোধ নেবেন ঠিক করলেন। পরিকল্পনার মধ্যে ছিলেন জয়ন্তী রায় স্বয়ং, আপনি, মার্কেটিং ম্যানেজার ইন্দ্র চৌধুরী এবং সৌম্য ও শীর্ষ চক্রবর্তী। কি ঠিক বলছি?'

ব্রততী এতক্ষণ বজ্রাহত বৃক্ষের মতো সটান দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, থানায় নিয়ে চলুন। এ প্রহসন আমার আর ভালো লাগছে না।'

অতনু বলল—'মাইন্ড ইয়ু আমি কিন্তু প্রথম থিয়োরিটার কথাই বলছি এখনও' আরেকটা থিয়োরিও আছে। আসুন, এই রেস্তোরাঁটাতে বসা যাক।'

একটা চেয়ার টেনে অতনু ব্রততীকে বসতে দিল। নিজে মুখোমুখি চেয়ারে বসে খাবারের অর্ডার দিল। বলল—'সত্যি বলছি মিসেস মুখার্জি, আজকের দিনটা অতনু সরকারকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন না। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? আপনি যাতে হাতের নাগালে পান তাই জয়ন্তী প্ল্যান করে আপনাদের দোতলায় কোয়ার্টার্স দেওয়ালেন সেনগুপ্তকে। সেনগুপ্ত-দম্পতি ভুলো স্বভাবের। আপনি আপনার স্বামীকে দিয়ে প্রস্তাব করালেন একটা ডুপ্লিকেট চাবি আপনাদের কাছে রাখার জন্য। কেমন? এরপর কয়েক মাস নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে রান্না করা খাবার-দাবার পাঠাতেন ওপরে, কাজেই সেনগুপ্ত নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে, আপনি আপোস করতে ইচ্ছুক। পারমিতা সেনগুপ্তর কাছ থেকে জানতে পারলাম আপনি মাঝেমাঝে সেনগুপ্তকে বাইরে মীট করতেন। আপোসের প্রস্তাব, ক্ষমা প্রার্থনা এগুলো নিশ্চয়ই ওই সময়েই হয়। মিসেস সেনগুপ্তর স্থির বিশ্বাস,

আপনার সঙ্গে সুমন্তর এক্সট্রা-ম্যারাইট্যাল লাভ অ্যাফেয়ার চলছিল। উনি জানেন না সেনগুপ্ত আপনার অতীত। বর্তমান নয়।'

ব্রততী এবার উঠে দাঁড়াল, রুদ্ধ স্বরে বলল—'মিঃ সরকার, আমি আর বসতে পারছি না। আপনাদের তৎপরতা, কল্পনাশক্তি, নির্বুদ্ধিতা, অহঙ্কারের সীমা নেই।'

অতনু বলল—'বিবি, আপনি সাঙ্ঘাতিক ভুল করছেন। পুলিসের থিয়োরিটা আমি পুরোপুরি আপনার কাছে ফাঁস করে দিচ্ছি, এতেও কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি শুধু পুলিসই নই। মানুষও। এইবারে পুলিসি কল্পনার সবচেয়ে সঙ্কটময় বিন্দুতে আপনাকে নিয়ে আসছি। চুপ করে শুনুন। বসুন আগে।'

ব্রততী হতাশের মতো বসে পড়ল। অতনু বলল— 'এইবার মঞ্চে আবির্ভাব ঘটল আপনার দুই ভাইয়ের। শনিবার মাঝরাত্তিরে আপনার কাছ থেকে সেনগুপ্তর ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে ওরা দুজন ওপরে গেল। ইন্দ্র চৌধুরী বাইনোকুলার নিয়ে সেনগুপ্তর ফ্ল্যাটে চোখ রেখেছিল। সে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হল। খুব শক্তিশালী বাইনোকুলার পাওয়া গেছে ওর ফ্ল্যাটে। সুমন্ত তখন কিছু একটা লিখছিল। সম্ভবত আপনাকে চিঠি। পেছন থেকে সৌম্য গিয়ে ওকে গ্যাগ করল, শীর্ষর ভোজালির আগায় সুইসাইড নোট লিখল সুমন্ত। তারপর তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে বাকি কাজগুলো সেরে ফেলল সৌম্য। মেন সুইচ অফ এবং অন করে ওদের নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল হয় ইন্দ্র চৌধুরী নয় বিবি আপনি।'

ব্রততী বলল—'সুমন্ত সেনগুপ্ত তাহলে একটা মাটির পুতুলের বেশি না! সৌম্য চক্রবর্তী যা করাল, করে গেল? ধ্বস্তাধ্বস্তি না, কিচ্ছু না।'

—'আপনি ভুলে যাচ্ছেন বিবি, সৌম্য চক্রবর্তী অসাধারণ বলশালী, খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি নিশ্চয়ই হয়েছে। সামলাবার জন্যে আপনি ছিলেন, না ইন্দ্র ছিলেন বলা শক্ত।'

—'এই অসাধারণ থিয়োরি কোর্টে গিয়ে প্রোডিউস করুন'—ব্রততী উঠে দাঁড়াল। অতনু বলল—'সৌম্য আর শীর্ষ চক্রবর্তীর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে সেনগুপ্তর বাড়ির হলঘরে। যদিও চেয়ারটায় বা সুইচ বোর্ডে পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই হাতে দস্তানা-টস্তানা ব্যবহার করেছিল।'

—'ও, হলঘরে দস্তানা পরল না। বেডরুমে ঢুকেই পরে নিল? চমৎকার। সামান্য একটু শকেই তো নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হত। এতো রিস্ক্ নিয়ে এভাবে এগোবার দরকার কি ছিল?'

—'আপনার বুদ্ধি চিরকালই পরিষ্কার,' অতনু অ্যাশট্রের ওপর সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—'ওইটেই পুলিসকে ভাবাচ্ছে। আরও একটা জিনিস। মনে হচ্ছে, সুমন্ত সেনগুপ্ত সেদিন সাঙ্ঘাতিক ডিসটার্বড্ ছিল। এতো সিগারেট খেয়েছে যে অ্যাশট্রে উপছে, মেঝেতে পড়ে কার্পেট ফুটো হয়ে গেছে। বেড সাইড-টেবিলেও স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে সিগারেটের টুকরো। সাইড-টেবিলের ওপর একটা লম্বাটে চৌকো দাগ। নোটবই কিম্বা ছোট লেটার প্যাড সাইজের। ঠিক কি বস্তু সেটা বোঝা যাচ্ছে না। জিনিসটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সুইসাইড নোটটার পেছনে বারবার বিবি বিবি লিখে কেটে দেওয়া দেখে অনুমান হয় ওটা আপনাকে লেখা কোনও চিঠি। পরের দিন মৃতদেহ আবিষ্কার তো আপনিই করেছেন, সরিয়ে নিয়েছেন জিনিসটা।'

ব্রততী উঠে দাঁড়াল। পেছন ফিরে চলতে চলতে বলল—'কোর্টে এসট্যাবলিশ করবেন ব্যাপারটা। এবার আর আমরা ভিখারি নই। ভালো ব্যারিস্টার দিতে পারব।'

হতভম্ব ওয়েটারের হাতে কুড়ি টাকার একটা নোট ফেলে দিয়ে হন্তদন্ত অতনু সরকার ব্রততীর পেছন পেছন প্রায় দৌড়লো।

—'দাঁড়ান, মিসেস মুখার্জি। বাপ্পা বাচ্চুর হাতের ছাপ তাহলে এলো কি করে সেনগুপ্তর ঘরে? ইনভেস্টিগেশনের সময়ে ওরা পালালো কেন?'

ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো ফিরে দাঁড়িয়ে ব্রততী এবার চাপা গলায় বলল '—ওই ঘটনার পর, শীর্ষ চক্রবর্তীর নার্ভের অবস্থা আপনারা যা করেছেন, তাতে করে তার আর ওখানে থাকা চলত না। সুমন্ত সেনগুপ্তকে বাচ্চু নিজের দাদার চেয়েও ভালোবাসত। যান। আমার পেছনে ঘুরঘুর না করে আপনাদের পুলিসি শাস্ত্রে যা যা বলে, করুন গিয়ে। কিন্তু খবদার। শীর্ষ চক্রবর্তীর গায়ে হাত ছোঁয়ালে আপনি আর রক্ষা পাবেন না।'

ব্রততী প্রায় দৌড়ে গেটের বাইরে চলে এলো। দাঁড়ানো ট্যাক্সিগুলোর একটা ধরে মুহূর্তে চোখের বাইরে চলে গেল।

'হে সারথি,
রথ এইখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো।' —সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অদ্ভুত টেলিফোনটা জয়ন্তী বাড়িতেই পেলেন। অপ্রত্যাশিত, তাই অদ্ভুত।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে অবাক হয়ে মুখ ফেরালেন। ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় ওটা কার মুখ? জয়ন্তী রায়ের? যে জয়ন্তী রায় পরমার্থ রায়ের সাম্রাজ্য পরিচালনা করে? মুন্নির নয়? যে মুন্নি তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে স্বপ্ন দেখত? স্বপ্ন দেখার মতো প্রবল, রোমাঞ্চময় বিষাদাপন্ন মোহে ভালোবাসত! ভালোবাসার মতো বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে চাইত! এই তুমুল তীব্র, আলোড়নময় আকাঙ্ক্ষা, যার নাম জীবন— কেন একলা একলা যাপন করা যায় না? তাহলে তাকে উল্টে-পাল্টে, ভেঙে-চুরে আবার গড়ে-পিটে নিজের মনের মতো করে নেওয়া যেত। কেন সরু সরু চুলের মতো আদ্যন্ত এর গায়ে জড়িয়ে যায় অন্য মানুষ, অনেক মানুষ, তাদের জীবন, ভালোবাসা, ভাগ্য, দুর্ভাগ্য!

ছেলে-মেয়ে স্কুলে। রামশরণ কাজ-কর্ম পরিপাটি করে সেরে বাড়ি গেছে। আড়াই হাজার স্কোয়্যার ফুটের বিশাল বাংলোবাড়িটায় জয়ন্তী একদম একা। ওরা জানে, একমাত্র জয়ন্তীকেই এ সময়ে বাড়িতে পাওয়া যাবে। অরণ্যদের হয়ত সরাসরি বলতেও চায়নি। ব্রততীর সঙ্গে যোগাযোগ করতেও তো তাঁকেই বলল। পরমার্থ কয়েকদিনের জন্য দিল্লি গেছেন। খুব ভালো হয়েছে। অরণ্যকে অফিসে ফোন করে জানাতে এক মিনিট একদম চুপ করে রইল, তারপর ধীর গলায় বলল, 'আমি আসছি।' ইন্দ্রকে এর পর। ব্রততীর স্কুলে ফোন করে জানলেন, ও বেরিয়ে গেছে। ফোনগুলো সারতে সময় নিল। বিশেষ করে ব্রততীরটা। এমনিতেই পাওয়া যায় না। তার ওপর এরকম দুর্যোগ। অফিসে ফোন করে অনাদিকে বললেন রামশরণকে খবর দিতে। বাড়ি আগলাতে হবে, ছেলে-মেয়ে এলে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। এই করতে করতেই বাইরে স্কুটারের আওয়াজ। মুখার্জি এসে গেছে। ইন্দ্র ওকেই ধরেছে দেখা যাচ্ছে। পেছন থেকে নামল।

দরজা খুলে দিতে মুখার্জি বলল, 'এতোটা রাস্তা, ওয়েদারও ভালো না। জিপটাই আনি, কি বলেন?'

জয়ন্তী বললেন, 'মুখার্জি, আপনি বসুন একটু। ইন্দ্র, তুমি গাড়িটা আনো। ড্রাইভার নিও।'

মুখার্জি বসতে পারছে না, পায়চারি করতে করতে বলল, 'ব্রততীকে কানেক্ট করতে পারলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। মানে, না। ও আগেই বেরিয়ে গেছে...'

জিপ নিয়ে ইন্দ্র এসে পৌঁছলে অরণ্য একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চৌধুরীও সঙ্গে যাচ্ছে, নাকি?'

'নিশ্চয়ই!' ইন্দ্র চৌধুরী জয়ন্তীকে উঠতে সাহায্য করল। ড্রাইভারকে বলল, 'শর্ট-কাটটাই ধরো মদনলাল।'

মেঘভাঙা রোদ উঠেছে সামান্য কিছুক্ষণ হল। শেষ বেলাকার রোদ। লাল মাটি জল টেনে নিয়ে আরও পান করবার আগ্রহে মুখ ব্যাদান করে আছে। ক্ষয়া ক্ষয়া পথ। লাল। দুপাশে উঁচু পাড়ি। ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মস্ত খোবলানো মাঠ। দূরে দূরে তাল, বট, নারকেল ত্রিভঙ্গ খেজুর। অকালবৃষ্টিতে আচমকা ধুয়ে গিয়ে সব উজ্জ্বল সবুজ। নিজের নিজের রাজ্যে ওরা স্বরাট। রোদের রঙ ক্রমে কমলালেবুর ঘন রসের মতো হয়ে আসছে। একটু পরেই সেই রঙে রসে জারিয়ে উঠবে দিগ্‌বিসারী খোলা মাঠ, গাছপালা, আকাশ। এই দিগন্তকে চুমো খেয়ে সূর্য চলে যাবে, অন্য দিগন্তের কাছে। রুক্ষ, একলা, মেঠো প্রকৃতির ওপর স্বর্ণগোধূলির এই কুহক কাউকে কাউকে আত্মবিস্মৃত করে। কেউ কেউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায় সূর্যের চলে যাওয়ার এই বিপুল আয়োজন দেখতে। জীবন আস্তে আস্তে মিশছে গিয়ে মহাজীবনে।

পাহাড়ি পথে যেভাবে যায় সেভাবেই চলতে হল জিপকে। মেঠো রাস্তা পার হয়ে গেল। জল-চকচক জি· টি· রোড, দিল্লি রোড, দুধারে এখনও গাছপালায় বৃষ্টির জটিল কান্না। মাঠগুলো সজল চোখে চেয়ে আছে। জলা খাল বিল সব ভর্তি। একটু টুসকি দিলেই ডাগর পুকুরের কিনার বেয়ে জল ঝরে পড়বে। ড্রাইভারের পাশে চৌধুরী। অরণ্য বসেছে জয়ন্তী রায়ের পাশে। একবার চোখ পড়তে হঠাৎ জয়ন্তী বউদিকে চিনতে পারল না অরণ্য। একমাথা কোঁকড়া ছাঁটা চুল। বর্ণহীন শরীর। যেন নারী নয় এক সদ্য যুবক। কাঁধে গামছা, কপালে শোকের ভস্মতিলক, শ্মশানে চলেছে।

দরজা বন্ধ ছিল। শ্রী খুলে দিল। বাইরের রোয়াকে সৌম্য। পায়চারি করছে। সন্তোষ বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে। চোখ লাল।

অরণ্য সৌম্যর দিকে এগিয়ে গেল— 'কখন? কিভাবে?'

সৌম্য বলল, 'রাত্তিরে শোবার সময়ে শিশি উপুড় করে খেয়েছে মনে হয়। পুরো মাসেরটা একসঙ্গে আনানো থাকত। সকালে অনেক বেলাতেও উঠল না দেখে...।'

লাঠিসুদ্ধু পদটা দরজার পাশে নামিয়ে রাখল ইন্দ্র। ঘরের মধ্যে ব্রততী, ওর মাথা কোলে। বিনুনি থেকে চুলগুলো সব ছাড়া পেয়ে এলোমেলো হাওয়ায় ইচ্ছেমতন উড়ছে। পাশে চুপটি করে বসে আছে নির্বাণ। যেন অনেক বড় হয়ে

গেছে হঠাৎ। জয়ন্তী গিয়ে পাশে দাঁড়াতে মৃদু, অভিযোগহীন স্বরে ব্রততী বলল, 'দেখো জয়ন্তীদি, কি করলে !'

সৌম্য ঘরে ঢুকল,হাতে একটা কালো ডায়েরি। ভেতর থেকে একটাখোলা পাতা বার করে নিয়ে দুটোই ব্রততীর দিকে এগিয়ে দিল, বলল, 'দিদি, অন্তুদার ডায়েরি, এটা শীর্ষর চিঠি, পুলিশের হাতে চলে যাবার আগে পড়ে নে।'

ব্রততী নড়ল না। হাত বাড়ানোর শক্তিটুকুও যেন ওর ফুরিয়ে গেছে। সৌম্য জিনিসগুলো জয়ন্তীর দিকে বাড়িয়ে ধরল। কাঁপা হাতে ডায়েরিটা খুললেন জয়ন্তী।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

ভেবেছিলাম, কোনরকমে একটা সময়কে পেছনে ফেলে আসতে পারলেই তার ওপর যবনিকাপাত হয়। ভেবেছিলাম সময় যে ভাবেই তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখুক না কেন, যবনিকাকে সে সমীহ করে। একমাত্র বিশুদ্ধ দুঃখই বোধহয় তার দলিল পেশ করে বোঝাতে পারে এ ধারণা সর্বৈব ভুল। সময় তার অনন্ত প্রবহমানতার মধ্যে আমাদের সব সময়ে ভাসিয়ে রেখেছে। সব যবনিকাই তার চোখে স্বচ্ছ। কিন্তু সময় যখন ব্যক্তির রূপ ধরে আসে, তখন তার ধাক্কা বড় ভয়ানক ! তখনই ঠিক বোঝা যায় ? গতকাল আজ আর আগামী কালের মধ্যে কোনও মৌলিক তফাত নেই। রাঢ় বঙ্গের এক সূর্যাস্তকে পশ্চাৎপটে নিয়ে যখন চোদ্দবছর পর আবার আমাকে দেখা দিলে বিবি তখনই একমাত্র আমার সময়কে বোঝা সম্পূর্ণ হল। বিস্তীর্ণ, ফসলহীন, রুক্ষ মাঠে আমি কাতারে কাতারে মানুষকে ছিন্নভিন্ন হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলাম যেন কুরুক্ষেত্রের অন্তিম পর্বে, সেইসব পদাতিক, কে কার আস্তিনের তলায় কার জন্য হিংসা লুকিয়ে রেখেছে না বুঝে যারা অন্যর স্বপ্নের দাম চুকিয়ে দিয়ে গেছে। বিবি আমি মহাপাপী। নিজের লড়াই ভাইকে লড়তে দিয়ে আমি সীমান্ত অতিক্রম করে গেছি। কিন্তু অতি বড় পাপীরও আত্মপক্ষ থাকে। কতদিন শুধু সেই নিজের কথাটুকু বলবার সুযোগ চাইতে তোমার পেছন পেছন ঘুরেছি, বলতে না পেরে মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছে কথাগুলো। যক্ষ্মারোগীর রক্তবমনের মতো মাঝে মাঝে উদ্দাম বেগে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। মাপ চাইতাম না। কিন্তু একটাও কথা বলবার সুযোগ পেলাম না কেন ? জানি, প্রশ্ন শুনে আকাশ-বাতাসের সুদ্ধু ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে। এতো কিছুর পরেও, এই সমস্ত ধুলোমাটির ঠুলি-পরানো, বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসে

আবিল ইতিবৃত্তের পরেও কেন প্রশ্ন থাকে ?

...'টেবিল-ঘড়িতে রাত আড়াইটে। এইমাত্র ওরা চলে গেল। বাপ্পা আর বাচ্চু। লিভিংরুমের সবুজ দেয়াল পেছনে নিয়ে বাচ্চু দাঁড়িয়েছিল। নিচু হয়ে, ক্রাচের ওপর শুকনো পাতার মতো শরীরটার ভর দিয়ে, জানলার গ্রিল ধরেছিল একহাতে। নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। থরথর করে-কাঁপছিল শুধু দাঁড়িয়ে থাকার তীব্র যন্ত্রণায়। এই কি বাচ্চু ? সেই বাচ্চু ! আমার আদেশ পালন করতে যার একবারও হাত কাঁপেনি ! বিপদ থেকে আরও বিপদের মুখে যে বিনা প্রশ্নে ছুটে গেছে, খালি আমি বলেছি বলে ! বললাম— 'বাচ্চু তুই বোস। বাপ্পা বসো।' শান্ত চোখে চেয়ে বাপ্পা বলল, 'বসতে তো আসিনি অন্তুদা। শুধু তোমাকে একবার দেখতে এলাম।' আর একটা কথাও বলল না। পেছন ফিরে বাচ্চুকে কোলে তুলে নিল। নিচে নেমে গেল আস্তে আস্তে। বাচ্চুর হাতের ক্রাচদুটো জ্যামিতিক ছায়া ফেলতে ফেলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তার সেই অতিকায় ফ্রেমের মধ্যে আমি আমার সব ভুল, সব পাপ এবং সব প্রায়শ্চিত্ত পরিষ্কার দেখতে পেলাম।'

'বাচ্চু, তুইও আমায় মাপ করিস না। আমরা ক্ষমা পাবো বলে কি ক্ষমা চাই ? ওটা আসলে অপরাধ স্বীকারের, বেদনা প্রকাশের একটা ভঙ্গিমাত্র। কিন্তু তোর কাছে কিছু কথা জমা রেখে যাবো। কৈফিয়ত নয়। যে পৈশাচিক অত্যাচার তোরা সবাই সহ্য করেছিস, করে আজ এমনি জীবন্মৃত হয়ে তবু মানুষের অহঙ্কার নিয়ে বীরাদপি বীরপুরুষের মতো বেঁচে আছিস, আমি সে অত্যাচার কেন সইতে পারিনি ? কেন ? নিজেকে জিজ্ঞেস করে উত্তর পাই না। প্রথম দুদিন চূড়ান্ত বিলাস, সম্মান, আদর, তারপর আচমকা প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে দিতে পিতৃপ্রতিম মুখগুলো সব পিশাচের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে গেল। নাভির নিচে আমূল ফুটে গেল একটা পিন। পরবর্তী বীভৎস সম্ভাবনায় তখন আমি চিৎকার করে উঠেছি, নিজের ওপর আমার আর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ছিটকে গিয়ে পড়লাম বিদেশে, ধনী আত্মীয়ের টাকায়। জানতাম না, বিবির কি করেছি, তোর কি করেছি। অথচ জানা উচিত ছিল। বাচ্চু, আমি কাপুরুষ, কিন্তু অমানুষ নই। তোর শরীরের প্রত্যেকটি আঘাত আমার ঋণ। যদি শোধ করে দিতে পারি, তাহলে বাচ্চু আবার আমায় তেমনি করে দাদা বলে ডাকিস।'

শীর্ষর চিঠিটা ওর ছোড়দাকে লেখা : 'ছোড়দা, অতনু সরকার আমাদের পেছনে লেগেছে অন্তুদার জন্য, এ আমি ওর চ্যাপ্টা মুখখানা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে

বুঝতে পারি। প্রথমে বুঝিনি এতো তৎপর ও হল কি করে। এখন সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের গতিবিধির ওপর পাহারা আর কোনদিনই শিথিল হবে না। আইনের চোখে আমরা চিরটাকালই ডেঞ্জারাস কিলার্স থেকে যাবো। আমাদের অনুসরণ করেই ওরা অন্তুদার কাছে পৌঁছেছে। তুই ওর ডায়েরিটা তুলে এনেছিস, ভালোই করেছিস। আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিলি কেন ? পৌত্তলিক বাচ্চু যদি তার আইডলকে মাপ করে দেয়, তাই··· ?

'ছোড়দা, আমাদের সংগঠন দুর্বল ছিল, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলে কিছু ছিল না, বিপ্লবের জমি তৈরি হয়ে গেছে ভেবে এবং শাসকদলের গণ সমর্থন নেই ভেবে আমরা ভুল করেছিলুম, যে দেশে দারিদ্র্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ধর্মীয় অন্ধতা, ভাষা-সংস্কৃতি এবং জাত নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সে দেশের পটভূমিকায় অবিমিশ্র মার্কস-লেনিনবাদের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু, এই সব পণ্ডিতি কূটতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু আমাদের আসল দুর্বলতা যার জন্য পুরো আন্দোলন একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হল সেটা কি জানিস ? বিপ্লব ধরেই নিয়েছে পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বীরপুরুষ। বিপ্লবে সামিল সব মানুষের মধ্যেই সে অসীম সহিষ্ণুতাসম্পন্ন একজন অগ্নিমানুষকে প্রত্যাশা করে, দাবী করে এমন শক্তির যা অনায়াসে সব ভেঙে দিতে পারবে। অথচ সৃষ্টির মৌলিক এবং চূড়ান্ত শর্ত ভাঙা নয়, গড়া। গড়ার পিপাসা যাদের মধ্যে প্রবল তারা সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। স্থূলতার ছোঁয়ায় কখন যে কিভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, নিজেরাই জানে না। নিজেকে রোখবার-আগেই যদি সংগ্রাম তাদের ডেকে নেয়, তাহলে বিপ্লবের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাদের পাশ করার আশা নেই। তোরা জানিস কিনা জানি না, মধ্য প্রাচ্যের ইনডাস্ট্রির গত দশ বছরের ইতিহাসে, সুমন্ত সেনগুপ্ত একটা বরণীয় নাম। এখানেও তাই-ই হতে পারত। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা আরও জরুরি হয়ে দাঁড়াল। কারণ, আমরা কেউই তো ওকে একটা কথা বলবারও সুযোগ দিইনি!

'আর আমার কথা যদি বলিস ? আমার কথা তো অনেক দিন আগেই ফুরিয়ে গেছে।

"দা সিকনেস, দা মিশিয়াস, দা পিটিলেস পেন
হ্যাভ সীজড উইথ দা ফিভার দ্যাট ম্যাডনড় মাই ব্রেন
উইথ দা ফিভার কল্ড 'লিভিং' দ্যাট বার্নড় ইন মাই ব্রেন।···"

বাকি জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচিস। আর দিদিকে বলিস ও ক্ষমা চায়নি, তবু যেন দিদি ওকে ক্ষমা করে। ওর জন্যে নয়, নিজেরই জন্যে।'